তারাবীহ নামাযের রাক‘আত সংখ্যা

দলীল-প্রমাণ আপত্তি পর্যালোচনা

তারাবীহ নামাযের রাক'আত সংখ্যা

দলীল-প্রমাণ আপত্তি পর্যালোচনা

মুফতী হাফিজুর রহমান

মা'হাদ প্রকাশনী
বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ : রমাযান, ১৪৩৯, জুন, ২০১৮

প্রকাশক : মুফতী হাফিজুর রহমান

মা'হাদ প্রকাশনী, এন/১৪, নুরজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

অক্ষরবিন্যাস : মা'হাদ কম্পিউটার, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ : মাওলানা মাহমূদুল হাসান

স্বত্ব : মা'হাদ প্রকাশনী

দাম : ২৪০ টাকা

ISBN : 978-984-34-4617-6

Email : mbuhus@gmail.com

Phone : 01940376740, 01811228992

Tarabih Namajer Rak`at Shonkha; Dalil Proman Apatti Parjalochona. Published by Mufti Hafizur Rahman of Ma'had Prokashoni, Basila. Muhammadpur, Dhaka-1207

নি|বে|দ|ন

দয়াময় সমীপে নিবেদন,
এখানে প্রাপ্তির কিছু থাকলে
আমার মরহুম বাবা
যেন পেয়ে যান।

সূচিপত্র

পূর্বকথা ১১
তারাবীহ নামায বিষয়ক কয়েকটি হাদীস ১৫
তারাবীহ নামায ২০ রাক'আত : দলীল-প্রমাণ ১৯
আট রাক'আত বিষয়ক দলীল-প্রমাণ : মুহতারাম মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবের বক্তব্য ও পর্যালোচনা ২৭
লেখকের বক্তব্য ও প্রথম দলীল: ১ ২৭
পর্যালোচনা ২৭
তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কি একই নামায? ২৯
কুরআন বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণে তাহাজ্জুদ নামায ৩১
তাহাজ্জুদ নামাযের সময় সীমা ৩৬
তারাবীহ নামাযের সময় সীমা ৩৭
তাহাজ্জুদ বা রাত্রিকালীন নফল নামাযের সংখ্যা কি নির্দিষ্ট? ৪১
আল্লামা কাশ্মিরী রহ. এর বক্তব্য ৪৪
তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা বিষয়ে আল্লামা কাশ্মিরী রহ. এর অভিমত ৫১
ইমাম বুখারী রহ. এর কর্মপন্থা ৫২
আহলে হাদীস উলামায়ে কেরামের নিকট তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ৫৩
তারাবীহ নামায ৮ রাক'আত কেন? ৫৬
লেখকের বক্তব্য: ২ ৫৬
পর্যালোচনা ৫৭
সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারী ৫৮
লেখকের বক্তব্য: ৩ ৬৪
পর্যালোচনা ৬৫
লেখকের বক্তব্য ও দ্বিতীয় দলীল: ৪ ৬৮
পর্যালোচনা ৬৮
লেখকের বক্তব্য ও তৃতীয় দলীল: ৫ ৭৪
পর্যালোচনা ৭৫
লেখকের বক্তব্য ও চতুর্থ-সপ্তম দলীল: ৬ ৮০
পর্যালোচনা ৮০
২০ রাক'আত বিষয়ক দলীল-প্রমাণ : মুহতারাম মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবের আপত্তি ও পর্যালোচনা ৮৩
লেখকের আপত্তি ১ ৮৩
পর্যালোচনা ৮৩
লেখকের আপত্তি ২ ৮৩
পর্যালোচনা ৮৫
লেখক মহোদয়ের অসঙ্গতি ৮৫
লেখক মহোদয়ের খুঁত আবিষ্কার: ১ ৮৬
বাস্তবতা ৮৬
মাযহুল বিষয়ক বিশ্লেষণ ৮৬
রাবী বিষয়ে আলোচনা ৮৮
লেখক মহোদয়ের খুঁত আবিষ্কার: ২ ৯২
বাস্তবতা ৯৩
লেখক মহোদয়ের খুঁত আবিষ্কার: ৩ ১০০
বাস্তবতা ১০১
মুযতারিব হাদীস বিষয়ক আলোচনা ১০১
লেখকের আপত্তি ৩ ১০৪
পর্যালোচনা ১০৪
লেখকের আপত্তি ৪ ১০৬
পর্যালোচনা ১০৭
লেখকের আপত্তি ৫ ১০৭
পর্যালোচনা ১০৮
সংশ্লিষ্ট বর্ণনার রাবী আবূ উসমান ১০৮
সংশ্লিষ্ট বর্ণনার রাবী আবূ তাহের ১১০
লেখকের আপত্তি ৬ ১১৫
পর্যালোচনা ১১৬
লেখকের আপত্তি ৭ ১১৯
পর্যালোচনা ১১৯
লেখকের আপত্তি ৮ ১১৯

পর্যালোচনা ১১৯
লেখকের আপত্তি ৯ ১২১
পর্যালোচনা ১২১
লেখকের আপত্তি ১০ ১২৬
পর্যালোচনা ১২৭
মুরসাল হাদীস বিষয়ক আলোচনা ১২৮
শায়খ আলবানী রহ. এর সাথে মুরসাল বিষয়ক একটি সংলাপ ১৪২
ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ রহ. এর ব্যাপারে ইমামদের বক্তব্য ১৪৬
লেখকের আপত্তি ১১ ১৪৭
পর্যালোচনা ১৪৮
লেখকের আপত্তি ১২ ১৫০
পর্যালোচনা ১৫০
লেখকের আপত্তি ১৩ ১৫০
পর্যালোচনা ১৫১
অভিযুক্ত রাবী বিষয়ক আলোচনা ১৫৩
লেখকের আপত্তি ১৪ ১৬১
পর্যালোচনা ১৬২
অনুবাদগত অসঙ্গতি ১৬২
আপত্তিকর অসঙ্গতি ১৬৩
অভিযুক্ত রাবী বিষয়ক আলোচনা ১৬৬
লেখকের আপত্তি ১৫ ১৭১
পর্যালোচনা ১৭১
লেখকের আপত্তি ১৬ ১৭২
পর্যালোচনা ১৭৩
অভিযুক্ত রাবী বিষয়ক আলোচনা ১৭৪
লেখকের আপত্তি ১৭ ১৭৭
পর্যালোচনা ১৭৮
লেখকের আপত্তি ১৮ ১৭৯
পর্যালোচনা ১৮০
লেখকের আপত্তি ১৯ ১৮২
পর্যালোচনা ১৮২
লেখকের আপত্তি ২০ ১৮৪
পর্যালোচনা ১৮৪
লেখকের আপত্তি ২১ ১৮৫
পর্যালোচনা ১৮৬
লেখকের আপত্তি ২২ ১৮৭
পর্যালোচনা ১৮৭
লেখকের আপত্তি ২৩ ১৯০
পর্যালোচনা ১৯০
লেখকের আপত্তি ২৪ ১৯২
পর্যালোচনা ১৯২
গ্রন্থসহায়িকা ১৯৭
ব্যক্তিগত নোট ২০৭

পূর্বকথা

মতবৈচিত্র মানুষের একটি স্বভাবজাত চরিত্র। পৃথিবীতে সর্বদিক বিবেচনায় মতৈক্যপূর্ণ বিষয়ের উপস্থিতি নিতান্তই বিরল। সহজাতিক এ বিষয়টি জাগতিক অঙ্গন ছাপিয়ে ধর্মীয় অঙ্গনেও সমানভাবে বিদ্যমান। মহান আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানবৈচিত্র, মতবৈচিত্র এবং বিবেক ও রুচিবৈচিত্র দিয়েই মানব জাতিকে সৃজন করেছেন। সৃষ্টিগত এ প্রাকৃতিক প্রবাহকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তবে ধর্মীয় অঙ্গনে মতবিচিত্রা ও মতস্বাতন্ত্র্য গ্রহণ-বর্জনের স্বীকৃত কিছু নীতি রয়েছে। মূলগত বিষয়ে মতবৈচিত্র ও মতভিন্নতার ক্ষেত্রে শিথিলতা ও উদারনীতি গ্রহণের অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কুরআন-হাদীস আশ্রিত মতটিই প্রবলভাবে প্রাধান্য লাভ করবে। বিপরীত মতটিকে সাহসিকতার সাথেই ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। এক্ষেত্রে নমনীয়তার কোনোই ফাঁক–ফোকড় নেই। পক্ষান্তরে শাখাগত বিষয়ে উদারনৈতিক মনোভাব ব্যক্ত করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বরং এক্ষেত্রে কাঠিন্য-নীতি পরিহারপূর্বক শৈথিল্য-নীতি গ্রহণই ইসলামী শরীয়তের রুচিসঙ্গত নির্দেশনা। আজ শাখাগত মতবৈচিত্রগুলো মুসলিম অমুসলিম প্রভেদের পর্যায়ে গিয়ে উন্নীত (!) হয়েছে। আমাদের সমাজের কিছু অতি উৎসাহী ভ্রাতা মহোদয় এ ক্ষেত্রটিতে এসে চরম প্রান্তিকতার পরিচয় দিচ্ছেন। অথচ বিষয়গুলো নিতান্তই শাখাগত এবং উত্তম অনুত্তম পর্যায়ের প্রভেদ; ঢাল-তলোয়ার জাতীয় কোন প্রভেদ নয়। কিন্তু তাঁদের বাক অসিতে রক্তাক্ত হচ্ছে চারিধার। সত্যের পথে আহ্বান, সত্যের প্রচারণা এবং মিথ্যার অপনোদন প্রক্রিয়াতেও রয়েছে চমৎকার নববী আদর্শ। সত্যের প্রচারণায় আগ্রহদীপ্ত ভ্রাতামণ্ডলীর ক্ষেত্রে সে আদর্শ চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। শরীয়াগত দায়িত্ব পালন ও পুণ্যার্জনের পথে তাঁরা শরীয়তের স্বতঃসিদ্ধ নীতিমালাকে চরমভাবে লঙ্ঘন করে চলছেন।

তারাবীহ নামাযের রাক'আত সংখ্যার প্রভেদ শাখাগত শ্রেণীরই একটি প্রভেদ। এতে প্রান্তিকতার আশ্রয় গ্রহণ করার মত কোনো উপাদান নেই। মুহাতারাম মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব সালাফী অঙ্গনে তুমুল আলোচিত এক ব্যক্তিত্ব। তিনি 'তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' শিরোনামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। আমাদের দৃষ্টিতে পুস্তিকাটির পত্র-পল্লব জুড়ে লেখক মহোদয় আপত্তিকর বক্তব্যের বহু পসরা সাজিয়েছেন। আর আমাদের পর্যালোচনা মতে তাতে যে তিনি কি পরিমাণ তথ্যবিভ্রাটের মহড়া প্রদর্শন করেছেন তার তালিকা বেশ দীর্ঘ। আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে প্রথমতঃ বিশ রাক'আত তারাবীহ বিষয়ক দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হবো। এরপর পর্যায়ক্রমে শিরোনামভিত্তিক মুহতারাম লেখকের কিছু আপত্তিকর বক্তব্যের উপর পর্যালোচনামূলক আলোচনা তুলে ধরতে চেষ্টা করবো; ইনশাআল্লাহ! বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পর্যালোচিত বিষয়গুলো বেশ জটিল ও স্পর্শকাতর। এতে হাদীস শাস্ত্রের নানা বিষয় স্থান পেয়েছে। তাই বিষয়গুলো বিদগ্ধ শাস্ত্রজ্ঞদের নিরীক্ষণ ও সম্পাদনার প্রভূত দাবি রাখে। নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে এ কাজটি আমরা যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারিনি। তবে জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার হাদীস অনুষদের সম্মানিত ডিন উস্তাদে মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা. শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও বইটির বিশেষ বিশেষ কিছু জায়গা যথাসাধ্য দেখে দিয়েছেন। মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়ার সম্মানিত মুদীর মুফতী মাহমূদুল আমীন সাহেবও বইটির নিরীক্ষণে সময় দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও আমরা স্বীকার করছি, নানা কারণে আমাদের তথ্য পরিবেশনে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। তাই যদি কোন বিদগ্ধজনের দৃষ্টিতে কোন বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তাহলে আমাদের অবহিত করলে আমরা যারপরনাই কৃতজ্ঞ হবো। বইটির শুদ্ধায়নে অনেকেই সময় দিয়েছেন। তাদের প্রতি থাকলো অনন্ত কৃতজ্ঞতা। বইটির অঙ্গসজ্জায় বন্ধুবর মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেবের শৈল্পিক কৃতিত্ব ছিলো সত্যিই অতুলনীয়। তাই তার অসীম কৃতিত্বকে শব্দের আখরে সসীম করতে চাই না। আল্লাহ আমাদের সকলকে নববী পন্থা অনুসরণে দীনী কাজে ব্যাপৃত থাকার তাওফীক দান করুন।

হাফিজুর রহমান
মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
batayonhafiz@gmail.com
২৩-০৫-২০১৮ ঈসায়ী

তারাবীহ নামাযের রাক'আত সংখ্যা

দলীল-প্রমাণ আপত্তি পর্যালোচনা

তারাবীহ নামায বিষয়ক কয়েকটি হাদীস

১. ইরবায বিন সারিয়া রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> আমার তিরোধানের পর তোমরা যারা বেঁচে থাকবে তারা নানা ধরনের মতভিন্নতা দেখতে পাবে। সেক্ষেত্রে তোমরা আমার এবং আমার সত্যনিষ্ঠ সুপথপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের সুন্নাহ ও আদর্শকে গ্রহণ করবে। একে তোমরা আকড়ে ধরবে এবং দন্তমাড়ির সাহায্যে কামড়ে ধরার ন্যায় প্রাণপণে আকড়ে ধরবে।... এবং তোমরা (ধর্মীয় বিষয়ে) নবাবিস্কৃত বিষয়াদি থেকে খুব সতর্কতার সাথে নিবৃত্ত থাকবে। কারণ প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিষয়ই হলো বিদআত। আর প্রতিটি বিদআত হলো পথভ্রষ্টতা। –সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৪৬০৭, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৬৭৬, মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ১৬৬৯২, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৪২, সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ৫

২. উরওয়া রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা রাযি. বর্ণনা করেন,

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা গভীর রাতে রুম থেকে বের হলেন। এরপর মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করলেন। অন্যান্য লোকজনও তার সাথে সে নামায আদায় করলো। ভোর বেলা লোকজন এ বিষয়টি নিয়ে কথা-বার্তা বলতে শুরু করলো। পরদিন রাতে গত রাতের তুলনায় আরো বেশি লোকজন একত্রিত হল এবং তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামায পড়লো। দ্বিতীয় দিন ভোর বেলা সবাই এ বিষয় নিয়ে আবার পরস্পরের সাথে আলোচনা শুরু করে দিলো। ফলে তৃতীয় দিন রাতে লোকের সংখ্যা আরো বেড়ে গেলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গিয়ে নামায পড়লেন। তাঁর সাথে আগত সাহাবায়ে কেরাম সে নামায আদায় করলেন। চতুর্থ দিন রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যেতে অপারগতা প্রকাশ করলেন।

> ফজরের নামাযে মসজিদে গিয়ে যখন নামায আদায় শেষ করলেন তখন সাহাবাদের দিকে মুখ করে বসলেন। এরপর আল্লাহর একত্ববাদ এবং আল্লাহর রাসূল হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্যবাণী পাঠ করলেন। এরপর বললেন, আজ রাতে তোমাদের মসজিদে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারটি আমার কাছে লুকায়িত ছিল না। তবে আমি আশঙ্কা বোধ করছিলাম, না জানি তোমাদের উপর এ নামায ফরয হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অক্ষমতার ব্যাপারটি সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিলেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এন্তেকাল করেন। আর গভীর রাতের নামাযের ব্যাপারটি সেভাবেই থেকে যায়। –সহীহ বুখারী; হাদীস ২০১২

৩. আব্দুর রহমান বিন আব্দ আলকারী রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> রমাযানের এক রাতে আমি উমর রাযি. এর সাথে মসজিদে গেলাম। তখন আমরা দেখতে পেলাম কেউ একাকী নামায পড়ছে, কেউ গুটি কয়েকজন লোক নিয়ে জামাআতের সাথে নামায পড়ছে। তখন উমর রাযি. বললেন, আমার মনে হয় যদি সকলে একজন ইমামের পেছনে নামায আদায় করতো তাহলে বিষয়টি শ্রেষ্ঠতর হতো। এরপর দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ হলেন। এবং সবাইকে উবাই ইবনে কা'ব রাযি. এর পেছনে একত্রিত করলেন। এরপর অন্য একদিন রাতে আমি উমর রাযি. এর সাথে মসজিদে গেলাম তখন দেখতে পেলাম সকল লোক তাদের এক ইমামের পেছনে নামায আদায় করছে। তখন উমর রাযি. বললেন, এটা কত সুন্দর একটি নতুন বিষয়! শুরু রাতে যে নামায পড়া হয় তার তুলনায় শেষ রাতের নামায উত্তম। লোকজন তখন শুরু রাত্রে নামায আদায় করতো। –সহীহ বুখারী; হাদীস ২০১০

৪. ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন,

> উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. নতুন কিছু করেননি। তিনি তাই করেছেন যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন। কিন্তু নিয়মিত জামাআতের কারণে তারাবীহ নামায উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত জামাআতের ব্যবস্থা করেননি। কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মুমিনদের ব্যাপারে ছিলেন খুবই দয়াবান এবং যারপরনাই অনুগ্রহশীল। উমর রাযি. বিষয়টি জানতেন। তিনি দেখলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এন্তেকালের পর ফরযের মাঝে কোনোরূপ সংজোযন বিয়োজন হবে না। তাই তিনি নববী রুচিবোধের প্রতি লক্ষ্য করে ১৪ হিজরীতে তারাবীহ নামাযের একটি জামাআতবদ্ধ রূপ দান করলেন। আল্লাহ তা'আলা যেন তার জন্যই এ মর্যাদার আসনটি নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। আবূ বকর রাযি. এর মনে এ চিন্তা উদগত হয়নি। যদিও সামগ্রিকভাবে তিনিই উত্তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন। আলী রাযি. উমর রাযি. এর এ উদ্যোগটিকে উত্তম বিবেচনা করেন। এবং এটিকে প্রাধান্য দেন। এবং বলেন, এটি হলো রমাযন মাসের জ্যোতির্ময় আলো। –ইবনে আব্দুল বার, আত তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মায়ানী ওয়াল আসানীদ ৮/১০৮

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, উমর রাযি. বলেছেন, এটা অর্থাৎ তারাবীহ এর বড় জামাআত কত সুন্দর নতুন একটি বিষয়। উমর রাযি. বলেননি, তারাবীহ নামায কত সুন্দর নতুন একটি বিষয়। কারণ তারাবীহ নামায যে সুন্নাত তা তো মৌলিকভাবে প্রমাণিত। –মোল্লা আলী আলকারী আলহারাবী, মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ ৪/৪৩৪

তারাবীহ নামায ২০ রাক‘আত

দলীল-প্রমাণ

১. সায়িব বিন ইয়াজিদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> তাঁরা (সাহাবা এবং তাবিয়ীন) উমর রাযি. এর যুগে রমাযান মাসে বিশ রাক‘আত পড়তেন। তিনি আরো বলেন, তাঁরা নামাযে শতাধিক আয়াতবিশিষ্ট সূরা পাঠ করতেন। এবং উসমান রাযি. এর যুগে তাদের কেউ কেউ নামায দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে লাঠিতে ভর করে দাঁড়াতেন। –ইমাম বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা; হাদীস ৪৮০১

২. সায়িব বিন ইয়াজিদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> আমরা উমর রাযি. এর যুগে বিশ রাক‘আত এবং বিতির পড়তাম। –ইমাম বাইহাকী, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার; হাদীস ৫৪০৯।

হাদীসটি সনদ বিবেচনায় সহীহ। হাদীস এবং ফিকহের অনেক ইমাম এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। যথা ইমাম নববী, তাকিউদ্দীন সুবকী, ওয়ালিউদ্দীন ইরাকী, বদরুদ্দীন আইনী এবং জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. প্রমুখ। প্রয়োজনে দেখা যেতে পারে আলমাজমু শরহুল মুহাযযাব ৩/৫২৭, নাসবুর রায়াহ ২/১৫৪, উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী ৭/১৭৮, ইরশাদুস সারী শরহু সহীহিল বুখারী ৪/৫৭৮, আল মাসাবীহ ফী সালাতিত তারাবীহ ২/৭৪ ইত্যাদি।

সায়িব বিন ইয়াজিদ রাযি. এর উপরোক্ত হাদীসটিকে শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. এবং আব্দুর রাহমান মুবারকপুরী রহ. জয়ীফ বলতে চেষ্টা করেছেন। আমাদের জানা মতে ইতিপূর্বে হাদীস বা ফিকহের কোনো ইমাম হাদীসটিকে জয়ীফ বলেননি। এ বিষয়ে শায়খ আলবানী রহ. যেসব স্থানে ত্রুটি বিচ্যুতিতে আক্রান্ত হয়েছেন তার মধ্য হতে বেশ কিছু জায়গা দলীল প্রমাণের আলোকে চিহ্নিত করেছেন সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার প্রাক্তন গবেষক মুহাদ্দিস ইসমাইল বিন আনসারী তার ‘*তাসহীহু সালাতিত তারাবীহ ইশরীনা রাক‘আতান ওয়ার রদ্দু আলাল আলবানী ফী তাযয়ীফিহী*’ নামক অনবদ্য গ্রন্থে। আর মুবারকপুরী রহ. যেসব ত্রুটি বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন

তার স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন মাওলানা হাবীবুর রহমান আ'যমী রহ. তার ‘রাক‘আতে তারাবীহ’ গ্রন্থে।

৩. ইয়াজিদ বিন রুমান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> সাহাবা এবং তাবিয়ীগণ উমর রাযি. এর যুগে রমাযান মাসে তেইশ রাক‘আত পড়তেন। –মুয়াত্তা মালিক; হাদীস ৩৮০

৪. আব্দুল আযীয বিন রুফাই রহ. বলেন,

> উবাই বিন কা'ব রাযি. রমাযান মাসে মসজিদে নববীতে লোকদের নিয়ে বিশ রাক‘আত পড়তেন এবং তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন। –মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা; হাদীস ৭৭৬৬

উপরোক্ত হাদীসগুলো বর্ণনাগত দিক থেকে মুরসাল। আর পূর্বসুরি ইমামদের মতানুসারে তাবিয়ী ইমামদের মুরসাল বর্ণনা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। বিশেষত একই বিষয়ে যদি একাধিক মুরসাল বর্ণনা থাকে কিংবা মুরসাল বর্ণনার সমর্থনে উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন সম্মিলিত কর্মধারা বিদ্যমান থাকে তবে তো তার প্রামাণিকতার বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, যে মুরসাল বর্ণনার অনুকূলে অন্য কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় কিংবা পূর্বসুরিগণ যার অনুসরণ করেছেন তা ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। –ইকামাতুদ দলীল আলা ইবতালিত তাহলীল ১/৭৫

৫. ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

> ...এ বিষয়টি প্রমাণিত, উবাই বিন কা'ব রাযি. রমাযান মাসে মুসল্লীদের নিয়ে বিশ রাক‘আত (তারাবীহ) পড়তেন এবং তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন। –ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া ২৩/১১২

৬. বিশ রাক‘আত তারাবীহ সম্বন্ধে অন্যত্র ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

> খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহ এবং মুসলিম জাতির সম্মিলিত কর্ম দ্বারা এটি প্রমাণিত। –ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া ২৩/১১৩

৭. আবূ আব্দুর রাহমান সুলামী রহ. বলেন,

> আলী রাযি. এক রমাযানে কারীদেরকে (হাফেযদেরকে) ডাকলেন। তাদের মধ্য হতে একজনকে লোকদের নিয়ে বিশ রাক‘আত পড়াতে বললেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, আলী রাযি. তাদের নিয়ে বিতর পড়তেন।

হাদীসটি আলী রাযি. থেকে অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। –ইমাম বাইহাকী রহ., আসসুনানুল কুবরা (আলজাওহারুন নাকী সংযুক্ত); হাদীস ৪৮০৪

৮. আবুল হাসনা রহ. থেকে বর্ণিত,

> আলী রাযি. এক রমাযানে এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে বিশ রাক'আত নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন। –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ২২৭

উপরোক্ত হাদীস দু'টি দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কারণ দু'টি হাদীসই হাসান পর্যায়ভুক্ত। দেখা যেতে পারে, আলজাওহারুন নাকী, ইবনুত তুরকুমানী ২/৪৯৫

উপরন্তু, ১ম (পূর্ণ ধারাক্রমানুসারে ১১তম) হাদীসটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ গ্রন্থে (২/২২৪) এবং ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. আলমুনতাকা গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৫৪২) দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, আলী রাযি. তারাবীহের জামাআত এবং রাক'আত সংখ্যা বিষয়ে দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারুক রাযি. এর নীতির উপরই ছিলেন।

৯. ইমাম আতা বিন আবী রাবাহ রহ. বলেন,

> আমি লোকদের (সাহাবায়ে কেরাম এবং প্রথম সারির তাবিয়ীগণ)-কে দেখেছি, তাঁরা বিতরসহ তেইশ রাক'আত পড়তেন। –মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা; হাদীস ৭৬৮৮

আর আতা বিন আবি রাবাহ রহ. তো নিজেই বলেছেন, আমি দুই শত জন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছি। তাহযীবুল কামাল ১৩/৪৯

১০. ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

> এটা প্রমাণিত, উবাই বিন কা'ব রাযি. রমাযান মাসের তারাবীহতে লোকদের নিয়ে বিশ রাক'আত পড়তেন এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। তাই বহু আলেমের সিদ্ধান্ত, এটিই সুন্নাত। কারণ উবাই বিন কা'ব রাযি. মুহাজির এবং আনসার সাহাবীদের উপস্থিতিতেই বিশ রাক'আত পড়িয়েছেন। এবং তাতে কেউ কোনো ধরণের আপত্তি তোলেনি। –ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া ২৩/১১২

১১. ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন,

> আমি ইমাম আবূ হানীফা রহ. কে তারাবীহ এবং এ বিষয়ে উমর রাযি. এর কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করি। তিনি প্রতি উত্তরে বলেন, তারাবীহ হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বা গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত। উমর রাযি. নিজের পক্ষ থেকে অনুমান করে নির্ধারণ করেননি। এবং তিনি এ ব্যাপারে নতুন কিছু আবিষ্কারও করেননি। তিনি দলীলের ভিত্তিতে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রাপ্ত কোনো নির্দেশনার ভিত্তিতেই এই আদেশ দান করেছিলেন। তাছাড়া উমর রাযি. যখন এই নিয়ম চালু করেন এবং উবাই বিন কা'ব রাযি. এর ইমামতিতে লোক সকলকে একত্রিত করেন এবং লোকজনও স্বতঃস্ফূর্তভাবে জামাআতবদ্ধ হয়ে এ নামায আদায় করতে থাকেন তখন সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল প্রচুর। যাদের মধ্যে উসমান, আলী, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, তালহা, যুবায়ের, মুআজ ও উবাই রাযি. প্রমুখ বড় বড় মুহাজির এবং আনসার সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের কেউ এ ব্যাপারটি প্রত্যাখান করেননি; বরং সবাই তাকে সমর্থন করেছেন, তার সাথে একমত হয়েছেন এবং অন্যদেরকে এ ব্যাপারে আদেশ করেছেন। –আল ইখতিয়ার লি তালীলিল মুখতার, ইমাম আবুল ফযল মাজদুদ্দীন আল মাওসিলী ১/৭০

১২. বিশিষ্ট তাবিয়ী আবুল আলিয়া রহ. উবাই বিন কা'ব রাযি. এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন,

> উমর রাযি. উবাই বিন কা'ব রাযি. কে রমাযান মাসে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার আদেশ করতে গিয়ে বলেন, লোকজন দিনের বেলা রোজা রাখে। কিন্তু রাতের বেলা উত্তমরূপে কুরআন পড়তে পারে না। আপনি যদি তাদের সামনে কুরআন পড়তেন। তখন উবাই বিন কা'ব রাযি. উত্তরে বলেন, আমীরুল মু'মিনীন! এ বিষয়টি তো আগে ছিল না। উত্তরে তিনি বলেন, তা আমি জানি। তবে এ বিষয়টি সর্বাধিক উত্তম। এরপর উবাই ইবনে কা'ব রাযি. লোকজন নিয়ে বিশ রাক'আত নামায পড়েন। –আলআহাদীসুল মুখতারা, ইমাম জিয়াউদ্দীন মাকদেসী; হাদীস ১১৬১

হাদীসটিতে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ছোট ছোট কয়েকটি জামাআতকে একত্র করে একজন ইমামের পেছনে একটি বড় সড় জামাআতের রূপদান একটি

ব্যবস্থাপনাগত বিষয়। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা নয়। বাস্তবে নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলীল প্রমাণও নেই। বরং বিষয়টি শরীয়তের রুচির সাথে বেশ সাযুজ্যপূর্ণ। তথাপি উবাই বিন কা'ব রাযি. এ ব্যাপারে নিজের সংশয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এভাবে এক জামাআতে তারাবীহ পড়ার ব্যবস্থা তো আগে ছিল না।' উমর রাযি. তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলে তিনি সম্মত হন। কিন্তু তারাবীহ এর রাক'আত সংখ্যার ব্যাপারে তাকে কিছু বলতে হয়নি। তিনি বিনা দ্বিধায় বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়িয়েছেন। এটা কিভাবে সম্ভব হলো? যদি বিশ রাক'আত তারাবীহ এর ব্যাপারে তাঁর কাছে নববী আদর্শ বিদ্যমান না থাকত তাহলে তো তিনি আরো শক্ত করে বলতেন, 'এ বিষয়টি তো আগে ছিল না।'

১৩. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করা হয়,

> রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসে বিশ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর পড়তেন। –মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা; হাদীস ৭৬৯২, আস সুনানুল কুবরা, বাইহাকী; হাদীস ৪৭৯৯, আলমু'জামুল কাবীর, তাবারানী; হাদীস ১২১০২, মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমাইদ; হাদীস ৬৫৩। হাদীসটি ইবনে আব্দুল বার রহ. তার আত-তামহীদ (৮/১১৫) এবং আলইসতিযকার (৫/১৫৬) গ্রন্থেও এনেছেন।

অনেক ভাই এ হাদীসটিকে মওজু বলেন। কিন্তু যখন তাদেরকে বলা হয়, হাদীসের কোনো ইমাম কিংবা অন্তত কোনো নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসের উদ্ধৃতিতে হাদীসটি মওজু বলে প্রমাণ করুন তখন তারা এ ব্যাপারে কোনো উদ্ধৃতি দিতে সক্ষমতা দেখাতে পারেন না। এটা সত্য, কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটির সনদকে জয়ীফ বলেছেন। কারণ হাদীসটির সূত্র পরম্পরায় ইবরাহীম বিন উসমান নামের একজন বর্ণনা কারী রয়েছেন। ইনি জয়ীফ পর্যায়ের রাবী। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, অগ্রগণ্য মতানুসারে ইবরাহীম বিন উসমানকে চরম পর্যায়ের যয়ীফ বা মাতরুক-পরিত্যাজ্য বলা যথাযথ নয়। দেখা যেতে পারে আলকামিল, ইবনে আদী ১/৩৮৯, তাহযীবুত তাহযীব, ইবনে হাজার আসকালানী ১/১৪৪, ই'লাউস সুনান, যফর আহমদ উসমানী ৭/৮২, রাক'আতে তারাবী, হাবীবুর রহমান আ'জমী ৬৩, রিসালায়ে তারাবীহ, মাওলানা গোলাম রাসূল (আহলে হাদীস আলেম); পৃষ্ঠা ২৪।

উপরন্তু মওযু এবং যয়ীফ হাদীসের মাঝে আকাশ জমিন ব্যবধান রয়েছে। মওযু তো হাদীসই নয়। মিথ্যুকেরা একে হাদীস নামে চালিয়ে দেয়ার ব্যর্থ

চেষ্টা করেছে মাত্র। জয়ীফ অর্থ হলো, বিবরণটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে। বলা বাহুল্য, সনদের দুর্বলতার কারণে বিবরণটিকে মিথ্যা, ভিত্তিহীন বলে দেয়া যায় না। হাদীস শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য মূলনীতি হলো, যয়ীফ হাদীস দুই শ্রেণীতে বিভক্ত:

১. যয়ীফ সনদে বর্ণিত বর্ণনাটির বক্তব্যও শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক। এই বিবরণের অনুকূলে শরয়ী কোনো দলীলের সমর্থন তো নেই-ই; বরং তার বিপরীতে দলীল বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের যয়ীফ কোনো ক্রমেই আমলযোগ্য নয়।

২. বর্ণনাটি যয়ীফ সনদে বর্ণিত, কিন্তু তার বক্তব্যের সমর্থনে শরীয়তের অন্যান্য দলীল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। মুহাক্কিক মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের সিদ্ধান্ত হলো, এ ধরনের বর্ণনাকে যয়ীফ বলা হলে তা হবে শুধু সনদের বিবেচনা। অন্যথায় বক্তব্য ও মর্মের বিচারে এটি সহীহ।

আলোচিত হাদীসটি তেমনি একটি বর্ণনা। একে শুধু সনদের বিবেচনায় দুর্বল বলা যায়; কিন্তু এর বক্তব্যের সমর্থনে ইতিপূর্বে উল্লিখিত পাঁচ ধরনের দলীলের শক্তিশালী সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় এ ধরনের যয়ীফ হাদীসকে الضعيف المتلقى بالقبول বলা হয়। অর্থাৎ এমন হাদীস যার সনদ যয়ীফ। কিন্তু এর বক্তব্য অনুযায়ী সাহাবা যুগ থেকে গোটা উম্মতের আমল চলে আসছে। এ ধরনের যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে উসূলে হাদীসের সিদ্ধান্ত হলো, তা সহীহ। উসূলে হাদীসের এ নীতি সম্বন্ধে হাজারো উদ্ধৃতি রয়েছে। তন্মধ্য হতে দু একটি উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করা হলো,

> ১. ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. বলেন, যয়ীফ হাদীস যখন ব্যাপকভাবে উম্মাহর (মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের) কাছে সমাদৃত হয় তখন সে হাদীস অনুযায়ী আমল করা হবে। এটাই বিশুদ্ধ কথা। এমন কি তখন তা হাদীসে মুতাওয়াতির (বিপুল সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত) হাদীসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। –আননুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ ১/৩৯০
>
> ২. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার একটি নিদর্শন হলো, ইমামগণ সে হাদীসের বক্তব্যের উপর আমল করার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। এক্ষেত্রে হাদীসটি গৃহীত হবে। এবং এর উপর আমল করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। উসূলের অনেক ইমাম এ মূলনীতিটি উল্লেখ করেছেন। –আননুকাত আলা মুকাদ্দামাতি ইবনিস সালাহ ১/১১৯

১৪. সাইয়িদ সাবেক রহ. বলেন,

এ বিষয়টি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত, মানুষ উমর, উসমান এবং আলী রাযি. এর যুগে বিশ রাক'আত নামায পড়তো। এটাই ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আহমাদ এবং ইমাম দাউদ অনুসৃত বিরাট সংখ্যক ফিকহবিদদের অভিমত। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, উমর, আলী এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত বিশ রাক'আতের মতটিই অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম গ্রহণ করেছেন। এটাই ইমাম সুফইয়ান সাওরী ,ইবনুল মুবারক, এবং শাফি রহ. এর অভিমত। এবং তিনি বলেন, আমি মানুষকে মক্কায় এভাবেই বিশ রাক'আত নামায আদায় করতে দেখেছি। –সয়্যিদ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২০৪

১৫. সা'লাবা ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের এক রাতে বাহিরে বের হলেন। তখন দেখলেন মসজিদের এক কোণে কিছু মানুষ নামায পড়ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরা কি করে? একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এসব লোকদের কুরআন মুখস্থ নেই। উবাই ইবনে কা'ব রাযি. এর কুরআন মুখস্থ আছে। তাই তারা উবাই ইবনে কা'ব এর পেছনে নামায পড়ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা সুন্দর কাজ করছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ কাজটিকে অপছন্দ করলেন না। বাইহাকী রহ. এর শাইখ আবূ আব্দুল্লাহ হাকেম নাইসাবুরী রহ. বলেন, এটা হাসান মুরসাল পর্যায়ের হাদীস। সা'লাবা ইবনে আবূ মালিক মদীনার প্রথম শ্রেণীর তাবিয়ী। তবে ইবনে মান্দাহ সা'লাবা ইবনে আবূ মালিককে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন।... –ইমাম বাইহাকী, সুনানে কুবরা; হাদীস ৪৭৯৪

জহীর আহসান নিমাভী রহ. হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, ইমাম বাইহাকী রহ. হাদীসটি 'মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর হাদীসটির সনদ জায়্যিদ তথা উত্তম স্তরের। সুনানে আবূ দাউদে আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত এর সাক্ষ্য হাদীসও রয়েছে (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৩৭৯, সহীহ ইবনে খুযাইমা হাদীস ২২০৮, সহীহ ইবনে হিব্বান ২৫৪১)। তবে তা হাসান পর্যায়ের নয়।

হাদীসটির টিকায় হাদীসটির সম্পূর্ণ সনদ উল্লেখ করে নিমাভী রহ. বলেন, যদি আপনি বলেন, সা'লাবা তো ইমাম ইজলী রহ. এর বর্ণনা মতে একজন তাবিয়ী তাহলে আমি বলবো, ইমাম বাইহাকী রহ. হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, ইতিহাস বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের দাবি মতে সা'লাবা ইবনে আবূ মালিক রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। ইমাম যাহাবী রহ. তাজরীদু আসমাইস সাহাবাহ গ্রন্থে বলেন, আবূ ইয়াহইয়া সা'লাবা ইবনে আবূ মালিক কুরাযী বনী কুরাইযা গোত্রের ইমাম ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছেন। এবং তিনি দীর্ঘ দিন জীবিত ছিলেন। আততাহযীব গ্রন্থে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছেন এবং তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ও উমর ইবনুল খাত্তাব, জাবির বিন আব্দুল্লাহ, উসমান বিন আফফান ও আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। –ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব ১/১৬, ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল ৪/৩৯৭, আল্লামা নিমাভী, আসারুস সুনান (টিকা ২৭৩) ২৪৭

অনেক ভাই তাহাজ্জুদ বিষয়ক একটি সহীহ হাদীসকে আট রাক'আত তারাবীহ এর সপক্ষে ব্যবহার করে থাকেন। আর এ প্রয়োগকে বৈধতা দেয়ার জন্য বলে থাকেন তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এক নামাযেরই দুই নাম। যে নামায এগারো মাস তাহাজ্জুদ থাকে তা রমাযানে এসে তারাবীহ হয়ে যায়। তাদেরকে যখন বিনীত সুরে বলা হয়, তারাবীহ তাহাজ্জুদ এক নামায সহীহ হাদীসের আলোকে প্রমাণ করুন, সাথে সাথে একথাও প্রমাণ করুন তাহাজ্জুদের নামায আট রাক'আতের চেয়ে বেশি পড়া যায় না তখন তাদের পক্ষ থেকে কোনো হাদীসই প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না। অথচ তারা বলে থাকেন, তারাবীহ আট রাক'আতের বেশি পড়া নাজায়েজ বা বিদআত। কিন্তু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তাহাজ্জুদের রাক'আত সংখ্যা নির্ধারিত নয়। দুই রাক'আত করে যত ইচ্ছা পড়তে থাকুন। যখন সুবহে সাদিক হওয়ার আশঙ্কা হবে তখন বিতর পড়ে নিন। হাদীসে এসেছে, তোমরা (তাহাজ্জুদ) ও বিতর পাঁচ রাক'আত পড়, সাত রাক'আত পড়, নয় রাক'আত পড়, এগারো রাক'আত পড় কিংবা তার চেয়ে বেশি পড়। –সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ২৪২৯, মুস্তাদরাকে হাকেম; হাদীস ১১৭৮

ইমাম যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. প্রমুখ বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। –নাইলুল আওতার, শাওকানী ৩/৪৩, আত-তালখীসুল হাবীর, ইবনে হাজার আসকালানী ২/১৪

আট রাক'আত তারাবীহ বিষয়ক দলীল-প্রমাণ

মুহতারাম মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবের বক্তব্য ও পর্যালোচনা

লেখকের বক্তব্য ও প্রথম দলীল: ১

মুহতারাম লেখক তাঁর *তারাবীহর রাকা'আত সংখ্যা: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ* নামক পুস্তিকাটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অধ্যায়টিকে দু'টি শিরোনামে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শিরোনামটি হলো '৮ রাক'আত তারাবীহ্‌র অকাট্য প্রমাণ'। লেখক তাঁর পুস্তিকার ৭ নম্বর পৃষ্ঠায় ৮ রাকা'আত তারাবীহ্‌র অকাট্য প্রমাণ অধ্যায়ে সহীহ বুখারীর আট রাক'আতের তাহাজ্জুদ বিষয়ক প্রসিদ্ধ বর্ণনাটি উল্লেখ করেন। হাদীসটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

> عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا
>
> অর্থ: আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান রাযি. একদা আয়িশা রাযি. কে জিজ্ঞেস করেন, রমাযান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায কিরূপ ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসে এবং রমাযানের বাইরে **১১** রাক'আতের বেশি নামায আদায় করতেন না। তিনি প্রথমে চার রাক'আত পড়তেন। তুমি তার সৌন্দর্য এবং দীর্ঘতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করো না। এরপর চার রাক'আত পড়তেন। তুমি তার সৌন্দর্য এবং দীর্ঘতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি তিন রাক'আত পড়তেন। –সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৫৬৯

পর্যালোচনা

হাদীসটিতে বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসে এবং অন্যান্য মাসে চার রাক'আত করে আট রাক'আত এবং তিন রাক'আত বিতর–সর্বমোট এগারো রাক'আতের চেয়ে বেশি পড়তেন না। বস্তুত এটা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক আমল ছিল না। কারণ খোদ আম্মাজান আয়িশা রাযি. এর সূত্রেই তাহাজ্জুদের নামায ফজরের সুন্নাত ব্যতিরেকে বিতরসহ তেরো রাক'আত হওয়াও প্রমাণিত আছে।

> عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة رضى الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة.
>
> অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা রাযি. কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয় রাক'আতের মাধ্যমে বিতর পড়তেন? আয়িশা রাযি. বলেন, তিনি চার রাক'আত, তিন রাক'আত, ছয় রাক'আত, আট রাক'আত, তিন রাক'আত এবং দশ রাক'আত এর মাধ্যমে বিতর পড়তেন। আর তিনি সাত রাক'আতের কম এবং তেরো রাক'আতের বেশি বিতর পড়তেন না।

দেখা যেতে পারে সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস **১৩৬২**; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার আসকালানী ৩/২৫; কিতাবুত তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১০।

যাইদ বিন খালিদ জুহানী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> আমি একদা প্রতিজ্ঞা করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাতের নামায আদায় করা দেখবো। তো দেখলাম, তিনি সংক্ষিপ্ত দু রাক'আত নামায আদায় করলেন। এরপর বেশ দীর্ঘ দু রাক'আত নামায আদায় করলেন। এরপর আবার দু রাক'আত নামায আদায় করলেন। এ দু রাক'আত পূর্বের দু রাক'আত থেকে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর আবার দু রাক'আত নামায আদায় করলেন। এ দু রাক'আত পূর্বের দু রাক'আত থেকে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর আবার দু রাক'আত নামায আদায় করলেন। এ দু রাক'আত পূর্বের দু রাক'আত থেকে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর আবার দু রাক'আত নামায আদায় করলেন। এ দু রাক'আত পূর্বের দু রাক'আত থেকে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর (এক রাক'আত) বিতর পড়লেন। এ ছিল মোট **১৩** রাক'আত। –সহীহ মুসলিম; হাদীস **১৮৪০**

অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা এটাও প্রমাণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাত্রের নামায ইশার দুই রাক'আত সুন্নাত ও বিতর ছাড়া কখনো কখনো সর্বমোট চৌদ্দ রাক'আত বা ষোল রাক'আতও হতো; বরং কোনো বর্ণনা মতে আঠারো রাক'আতও প্রমাণিত হয়। –নাইলুল আওতার, শাওকানী ৩/২১; হাদীস ৮৯৭; আত-তারাবীহু আকসারা মিন আলফি আম ফিল মাসজিদিন নাবাবী, আতিয়্যা মুহাম্মাদ সালেম, সৌদি আরব ২১

উপরন্তু যদি হাদীসটি তারাবীহ বিষয়ক হতো তাহলে স্বয়ং উম্মুল মুমিনীন মসজিদে নববীর বিশ রাক'আত তারাবীহ এর উপর আপত্তি করতেন। ১৪ হিজরী থেকে নিয়ে উম্মুল মুমিনীনের মৃত্যু সন ৫৭ হিজরী পর্যন্ত অবিরাম চল্লিশ বছর তাঁর কক্ষ সংলগ্ন মসজিদে নববীতে বিশ রাক'আত তারাবীহ হয়েছে। উম্মুল মুমিনীন কি কখনো এর উপর আপত্তি করেছেন? তার কাছে তারাবীহ এর রাক'আত সংখ্যার ব্যাপারে একটি অকাট্য হাদীস থাকবে আর তাঁর সামনে চল্লিশ বছর যাবত এই হাদীসের বিরোধিতা হবে, তারপরও তিনি নীরব থাকবেন? এটা কি কখনো সম্ভব?

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কি একই নামায?

আট রাক'আতের পক্ষে লেখক মহোদয় ও তাঁর বৃত্তভুক্ত আহলে হাদীস ভাইদের সবচেয়ে শক্তিশালী (?) যুক্তিঅস্ত্র হলো, তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ একই নামায। আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, তারা আট রাক'আতের সপক্ষে শক্তিশালী কোনো দলীল না পেয়েই এই যুক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। নতুবা এটা ধোপে টেকার মত কোনো যুক্তি নয়। কারণ, এই যে তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদকে একাকার করে দেখানো হচ্ছে এর সপক্ষে কি কোনো হাদীস, সাহাবী উক্তি, কিংবা তাবিয়ী উক্তি আছে? অন্য কোনো মাসে শেষ নিশিথে দাঁড়িয়ে কেউ কি কোনো কালে বলেছে আমি তারাবীহ পড়ছি? রমাযান মাসে ইশার নামাযের পরে তারাবীহতে দাঁড়িয়ে কেউ কি বলেছে আমি তাহাজ্জুদ পড়ছি? দু'টি নামায এক হলে এ কথা কেউ বলেননি কেন? প্রশ্ন হতে পারে একটি বিষয়ের দু'টি নাম হতে পারে। উত্তরে আমরাও বলি একটি বিষয়ের দু'টি নাম হতে পারে; বরং দু'টি কেন দুয়ের অধিক নামও হতে পারে। তবে তার জন্য শর্ত হলো, যে কোনো নামে যখন তখন সম্বোধন করা বিধিত থাকতে হবে। এক সময় এক নাম অন্য সময় ভিন্ন নাম– এমনটি হলে এটা সে বিষয়ের একাধিক নাম হলো না। তাহাজ্জুদের জায়গায় তারাবীহ, তারাবীহের জায়গায় তাহাজ্জুদ বলার বৈধতা এবং অনুমোদন থাকলেই কেবল বলা যাবে দুটো একই বিষয়। এবার আমরা তাহাজ্জুদ এবং তারাবীহ শব্দ দু'টির আভিধানিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করি। অভিধান এবং পরিভাষা এ দুটো নামাযকে একই নামায হিসেবে অভিহিত করে কি না?

নিচে বিখ্যাত কিছু আরবী অভিধান গ্রন্থের বক্তব্য তুলে ধরা হলো:

তাহাজ্জুদ:

১. তাহাজ্জুদ অর্থ রাতে ঘুমানো, ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করা। তাহাজ্জুদ শব্দটি স্ববিরোধী অর্থবহ একটি শব্দ। (অর্থাৎ শব্দটি একই সাথে ঘুমানো এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার অর্থ প্রদান করে।) –আলমুনাবী, আত্তাউকীফ আলা মুহিম্মাতিত তাআরিফ ১/২১১

২. তাহাজ্জুদ অর্থ: রাতে ঘুমানো, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া। ইসমাইল বিন হাম্মাদ আলজাউহারী, আসসিহাহ ফিললুগাহ ২/২৪৩

৩. তাহাজ্জুদ অর্থ: রাতে ঘুমানোর পর জাগ্রত হওয়া। –ড. জাউয়াদ আলী, আলমুফাসসাল ফী তারিখিল আরব ১২/৪২৪

৪. وتَهَجَّدَ القوم استيقظوا للصلاة তাহাজ্জাদাল কাউমু অর্থ মানুষ নামাযের জন্য জাগ্রত হয়েছে। –ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব ৩/৪৩১

৫. তাহাজ্জুদ অর্থ: রাতে নিদ্রা যাওয়া, নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া। সালাতুত তাহাজ্জুদ অর্থ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নফল নামায আদায় করা।

صلاة التهجد: التنفل بعد النوم... ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নফল নামায আদায় করা। –মুহাম্মাদ কালআজী, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা ১/১৮১

তারাবীহ:

১. তারাবীহ অর্থ: রমাযান মাসে দশ সালামে বিশ রাক'আত নামায আদায় করা। তারাবীহকে তারাবীহ বলে নামকরণের কারণ হলো, মানুষ তারাবীহ নামাযের ভিতরে প্রত্যেক চার রাক'আত অন্তর বসে এবং বিশ্রাম গ্রহণ করে। (তারাবীহ এটা আরবী তারবীহাহ এর বহুবচন। তারবীহাহ অর্থ বিশ্রাম গ্রহণ করা)। –মুহাম্মাদ বিন আবুল ফাতহ আলহাম্বলী, আলমাতলা' আলা আবওয়াবিল ফিকহ ১/৯৫

২. 'আমি তাদের নিয়ে তারাবীহ নামায আদায় করেছি' এখানে তারাবীহ শব্দটি তারবীহাহ এর বহুবচন। আবূ

সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রত্যেক চার রাক'আত অন্তর মুসল্লীরা বিশ্রাম গ্রহণ করে থাকে বলে তারবীহাহকে তারবীহাহ বলা হয়। -আল্লামা মুতাররিযী, *আলমুগরিব* ২/৪০৯

৩. তারাবীহকে তারাবীহ নামে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ মুসল্লীরা প্রত্যেক চার রাক'আত অন্তর বিশ্রাম গ্রহণ করে থাকে। -মুরতাযা আযযাবিদী, তাজুল আরুস ১/১৬০৪

৪. তারাবীহ এর একবচন হলো, তারবিহাহ। অর্থ, বিশ্রাম গ্রহণ করা Recreation। তারাবীহকে তারাবীহ নামে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ মুসল্লীরা প্রত্যেক চার রাক'আত অন্তর বিশ্রাম গ্রহণ করে থাকে। -The long prayers in nights of Ramadan মুহাম্মাদ কালআজী, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা ১/১২৭

৫. সালাতুত তারাবীহ অর্থ, রমাযান মাসে রাতে ইশার নামাযের পর বিশ রাক'আত নামায আদায় করা। -মুহাম্মাদ কালআজী, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা ১/১৭৫

উপরোক্ত অভিধানগুলোতে তাহাজ্জুদ এবং তারাবীহ এর স্পষ্ট সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে কোথাও তাহাজ্জুদ এবং তারাবীহকে একাকার করে দেখানো হয়নি। উল্লেখ করার মত বিষয় হলো, তাহাজ্জুদের ধাতুগত অর্থই হলো, ঘুমানো বা ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া। এতে প্রতীয়মান হয়, তাহাজ্জুদের ব্যাপারটি ঘুমোত্তর সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

কুরআন বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণে তাহাজ্জুদ নামায

তাহাজ্জুদের বিষয়টি সরাসরি পবিত্র কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করবে। এটা আপনার জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায়, আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।' -সূরা বানী ইসরাইল ৭৮

এবার লক্ষ্য করা যাক, মহান মুফাসসিরীনে কেরাম তথা কুরআন বিশেষজ্ঞগণ উপরোল্লিখিত আয়াতস্থিত তাহাজ্জুদের কি ব্যাখ্যা করেছেন:

১. তাহাজ্জুদের ব্যাপারে তিনটি উক্তি রয়েছে। (ক) নিদ্রা যাওয়া, এরপর নামায আদয় করা, এরপর আবার নিদ্রা যাওয়া, এরপর আবার নামায পড়া। (খ) ঘুম থেকে জাগ্রত

হয়ে নামায আদায় করা (গ) ইশার নামাযের পর নামায আদায় করা। এগুলো হলো তাবিয়ীনে কেরামের বিভিন্ন উক্তি। সম্ভবত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু ঘুমাতেন এরপর ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নামায পড়তেন এরপর আবার ঘুমাতেন এরপর আবার নামায আদায় করতেন তাই তাবিয়ীনে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের এ পদ্ধতির অনুসরণে ঘুমোত্তর নামাযকে তাহাজ্জুদ বলে অভিহিত করেছেন। যদি ব্যাপারটি এ কারণেই হয়ে থাকে তাহলে এটিই ঘনিষ্ঠ এবং যথোপযুক্ত অভিমত। -ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন ৫/২৮৬

২. হাজ্জাজ বিন আমর আনসারী রাযি. বলেন, তোমাদের অনেকে ধারণা করে, শেষ রাত অবধি নামায পড়া হলেই তা তাহাজ্জুদ নামায হয়ে গেল। না ব্যাপারটি এমন নয়। বরং তাহাজ্জুদ হলো ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করা এরপর আবার ঘুমিয়ে তারপর নামায আদায় করা এরপর আবার ঘুমিয়ে জাগ্রত হয়ে নামায আদায় করা। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামায এমনি ছিল। আসওয়াদ এবং আলকামা রহ. বলেন, তাহাজ্জুদ হলো, ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নামায আদায় করার নাম। -মু'জামে কাবীর তাবারানী; হাদীস ৩২১৬, মাজামাআউয যাওয়ায়েদ; হাদীস ৩৬১৬, হাইসামী রহ. বলেন, এর সনদ সহীহ এবং এ সনদের বর্ণনাকারীগণ সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারী। আবূ বকর জাসসাস, আহকামুল কুরআন ৫/৩২

৩. তাহাজ্জুদ অর্থ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া। এখন এটা একটি নামাযের নাম হয়ে গেছে। কারণ এ নামাযের জন্য জাগ্রত হতে হয়। সুতরাং তাহাজ্জুদ নামাযের পারিভাষিক অর্থ হলো, ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নামায আদায় করা। আসওয়াদ, আলকামাহ এবং আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ রহ. তাহাজ্জুদের এ অর্থই করেছেন। এরপর কুরতুবী রহ. হাজ্জাজ বিন আমরের হাদীসটি উল্লেখ করেন। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, রাতের একটা সময়ে নামাযের জন্য জাগ্রত হও। -ইমাম কুরতুবী, আলজামি' লিআহকামিল কুরআন ১০/৩০৮

৪. ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির এবং মুহাম্মাদ বিন নাসর আলকামা এবং আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তাহাজ্জুদ অর্থ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নামায আদায় করা। –ইমাম সুয়ূতী রহ., আদদুররুল মানসূর ৯/৭৬

৫. আয়াতটির অর্থ হলো, ঘুম থেকে জাগ্রত হও এবং নামায আদায় করো। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া ব্যতীত তাহাজ্জুদের নামায হয় না। জনৈক আনসার সাহাবী সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, একদা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলেন। তখন সে বলল, আজ আমি দেখবো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায আদায় করেন। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমালেন। এরপর ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। এরপর মস্তক মোবারক আকাশ পানে উত্তোলন করলেন। এরপর সূরা আলে ইমরানের চারটি আয়াত পাঠ করলেন। এরপর হাত দ্বারা কোনো ইবাদত করার ইচ্ছা করলেন এবং একটি মিসওয়াক হাতে নিলেন। এরপর তা দ্বারা দাঁত মাজলেন। এরপর উযু করলেন এবং নামায পড়লেন। এরপর ঘুমালেন। এরপর আবার জাগ্রত হলেন এবং পূর্বোক্ত কাজগুলো আবার করলেন। উলামায়ে কেরাম মনে করেন এ নামাযই সেই তাহাজ্জুদের নামায যে নামায সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন। –সুনানে নাসায়ী কুবরা; হাদীস ১০১৩৯, আবূ ইসহাক নিশাপুরী, আলকাশফু ওয়াল বায়ান ৬/১২৩

৬. আয়াতটির অর্থ হলো, ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আপনি নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হোন। আর তাহাজ্জুদ অর্থ হলো, ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নামায আদায় করা। –আবুল লাইস সামারকান্দী, বাহরুল উলূম ৩/২৩

৭. তাহাজ্জুদ ঐ নামাযকে বলা হয় যা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আদায় করা হয়। আলকামা, আসওয়াদ, ইবরাহীম নাখায়ী প্রমুখ তাহাজ্জুদের এ অর্থ করেছেন। আরবী ভাষায় তাহাজ্জুদের এ অর্থটিই প্রসিদ্ধ। তেমনিভাবে বিভিন্ন হাদীসের আলোকে প্রমাণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। ইবনে আব্বাস, আয়িশা রাযি.সহ অন্যান্য সাহাবী থেকে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি যথাস্থানে সুবিস্তর আলোচিত হয়েছে। যাবতীয় প্রশংসা এবং অনুগ্রহ আল্লাহ তা'আলার জন্য। তবে হাসান বসরী রাযি. বলেন, তাহাজ্জুদ ওই নামায যা ইশার নামাযের পর আদায় করা হয়। তার এ কথার মর্মার্থ হবে, ইশার নামাযের পর ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যে নামায আদায় করা হয় তাই তাহাজ্জুদের নামায। –তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/১৫০

৮. অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কেরামের মতে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া ব্যতীত তাহাজ্জুদ নামায হয় না। –তাফসীরুল আ'কাম ১/৩৭২

৯. আয়াতটির অর্থ হলো, তুমি রাতের কিছু সময় নামাযের জন্য জাগ্রত হও। আলকামা রহ.সহ অন্যান্য তাবিয়ীগণ বলেন, তাহাজ্জুদ হলো ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আদায় করার নামায। হাসান বসরী রহ. বলেন, ইশার শেষ সময়ের পরে যে নামায আদায় করা হয় তাই তাহাজ্জুদ। –আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ সা'আলাবী, জাওয়াহিরুল হিসান ২/৩৫৫

১০. আয়াতটির অর্থ তুমি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নামাযের জন্য দাঁড়াও। তাহাজ্জুদ অর্থই হলো, ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নামায আদায় করা। –আলাউদ্দীন আলবাগদাদী, তাফসীরুল খাযিন ৪/১৭৪

১১. আল্লামা আযহারী রহ. বলেন, আরবী ভাষায় প্রসিদ্ধ মতানুসারে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে হাজিদ (هاجد) বলা হয়। এরপর আমরা দেখলাম, শরয়ী পরিভাষায় যে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নামায আদায় করে তাকে 'মুতাহাজ্জিদ' বলা হয়। সুতরাং এখন একথা মেনে নেয়া আবশ্যক হয়ে গেল, ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নামায আদায়কারী ব্যক্তিকে মুতাহাজ্জিদ করে নামকরণ করা হয়েছে নিজের ঘুমকে দূরীভূত করার কারণে। আমি বলি, এখানে আরো একটি সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা হলো, মানুষ সাধের ঘুমকে পরিত্যাগ করে এবং নামাযের জন্য ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার কষ্টকে স্বীকার করে নেয় যাতে সে মৃত্যুকালীন ঘুমকে আনন্দময় করে তুলতে পারে। সুতরাং এই ঘুম পরিত্যাগের

মূল উদ্দেশ্য যেহেতু মৃত্যুকালীন স্বাচ্ছন্দ্যময় নিদ্রাজীবন লাভ করা তাই গভীর রাত্রের এই বিনিদ্র নামাযকে তাহাজ্জুদ করে নামকরণ করা হয়েছে। এখানে তাহাজ্জুদ নামকরণের তৃতীয় আরো একটি কারণ রয়েছে। আর তা হলো, হাজ্জাজ বিন আমর আনসারী রাযি. বলেন, তোমাদের অনেকে ধারণা করে, শেষ রাত অবধি নামায পড়া হলেই তা তাহাজ্জুদ নামায হয়ে গেল। না ব্যাপারটি এমন নয়। বরং তাহাজ্জুদ হলো ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করা এরপর আবার ঘুমিয়ে তারপর নামায আদায় করা এরপর আবার ঘুমিয়ে জাগ্রত হয়ে নামায আদায় করা। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাহাজ্জুদ নামায এমনি ছিল। –তাফসীরে রাযী ১০/১০৮

১২. তাহাজ্জুদকে তাহাজ্জুদ বলে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ এর মূল বিষয়টি হলো, ঘুমিয়ে যাওয়া এরপর জাগ্রত হয়ে নামায আদায় করা এরপর আবার ঘুমিয়ে যাওয়া এরপর আবার জাগ্রত হয়ে নামায আদায় করা। সুতরাং তাহাজ্জুদ অর্থ হলো ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নামায আদায় করা। যেমনটি ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং দাউদ আলাইহিস সালাম এর নামায। আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচে প্রিয় রোযা দাউদ আ. এর রোযা এবং আল্লাহ তা'লার নিকট প্রিয় নামায হলো, দাউদ আ. এর নামায। দাউদ আ. অর্ধ রাত্রি ঘুমাতেন এবং এক তৃতীয়াংশ রাত্রি নামায পড়তেন এরপর এক ষষ্ঠমাংশ রাত্রি ঘুমাতেন এবং তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযাবিহীন থাকতেন। –সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৭৯৬, নিযামুদ্দীন নিশাপুরী, তাফসীরু গারাইবিল কুরআন ৮/১৯৭

১৩. আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে বলেন, আপনি রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কুরআনের মাধ্যমে নামায আদায় করুন। আর তাহাজ্জুদ অর্থ রাতের বেলা ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া। হাজ্জাজ বিন আমর, আলকামা, আলআসওয়াদ এবং আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ রহ. বলেন, তাহাজ্জুদ হলো ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আদায় করার নামায। হাসান বসরী রহ.

বলেন, তাহাজ্জুদ হলো, ইশার শেষ সময়ের পর আদায় করা নামায। জনৈক আনসার সাহাবী সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, একদা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এক সফরে ছিলেন। তখন সে বলল, আজ আমি দেখবো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায আদায় করেন। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমালেন। এরপর ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। এরপর মস্তক মোবারক আকাশ পানে উত্তোলন করলেন, এরপর সূরা আলে ইমরানের চারটি আয়াত পাঠ করলেন। এরপর হাত দ্বারা কোনো ইবাদত করার ইচ্ছা করলেন। ফলে একটি মিসওয়াক হাতে নিলেন। এরপর তা দ্বারা দাঁত মাজলেন। এরপর উযু করলেন এরপর নামায পড়লেন। এরপর ঘুমালেন। এরপর আবার জাগ্রত হলেন এবং পূর্বোক্ত কাজগুলো আবার করলেন। উলামায়ে কেরাম মনে করেন এ নামাযই সেই তাহাজ্জুদের নামায যে নামায সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন। –আবূ জা'ফর তাবারী, জামিউল বায়ান ৯/২৪৫-২৪৬

১৪. আয়াতটির অর্থ, আপনি রাতের বেলা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নামায এবং কুরআন পাঠের মাধ্যমে আপনার প্রভুর উদ্দেশে তাহাজ্জুদ নামায আদায়কারী হোন। –মুহাম্মাদ আলী সাবুনী, সফওয়াতুত তাফাসীর ২/১৩৮

১৫. প্রথম রাত্রে ঘুমিয়ে এরপর জাগ্রত হয়ে নামায আদায় করা হলো তাহাজ্জুদের নামায। –সাইয়িদ কুতুব শহীদ, ফী জিলালি কুরআন ৬৫/৫৫

তাহাজ্জুদ নামাযের সময়সীমা

১. আসওয়াদ রহ. বলেন,

> আমি আয়িশা রাযি. কে জিজ্ঞেস করলাম, রাতের বেলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায কেমন ছিল। তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাত্রে ঘুমাতেন এবং শেষ রাত্রে নামায আদায় করতেন। এরপর বিছানায় ফিরে আসতেন। যখন মুয়াজ্জিন আযান দিতো তখন দ্রুত উঠে যেতেন। যদি প্রয়োজন হতো তবে

গোসল করে নিতেন। নতুবা উযু করে মসজিদে চলে যেতেন। –সহীহ বুখারী; হাদীস ১১৪৬

২. ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো গভীর রজনীর নামায। –মু'জামে তাবারানী কাবীর; হাদীস ১৬৯৫

৩. মাসরুক রহ. বলেন,

আমি আয়িশা রাযি. কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে কখন নামায আদায় করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, যখন গভীর রজনীতে মোরগের ডাক শুনতেন তখন নামায আদায় করতেন। –সহীহ বুখারী; হাদীস ১১৩২

৪. রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

একদা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো এক সফরে ছিলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সফরটি কষ্ট এবং দুর্দশার সফর। তোমাদের কেউ যখন বিতর নামায পড়বে তখন যেন সাথে আরো দুই রাক'আত পড়ে নেয়। যদি জাগ্রত হয় তবে তো ভাল কথা। নতুবা সে দুই রাক'আতই তার জন্য তাহাজ্জুদ হিসেবে গণ্য হবে। –সহীহ ইবনে খুযাইমা; হাদীস ১১০৬

হাদীসটির ব্যাখ্যায় আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন,

এ দু রাক'আত নামায হলো, ঘুমপূর্ব তাহাজ্জুদ। এটা তাহাজ্জুদ সংক্রান্ত উলামায়ে কেরামের বক্তব্যের বিপরীত কোনো বক্তব্য নয়। কারণ এটা প্রকৃত অর্থে তাহাজ্জুদ নয়; রূপক অর্থে তাহাজ্জুদ। –আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী, ফাইযুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী ৪/১

তারাবীহ নামাযের সময় সীমা

১. তারাবীহ নামাযের সময় হলো ইশার নামাযের পর থেকে নিয়ে শেষ রাত পর্যন্ত। কারণ তারাবীহ নামায ইশার নামাযের অনুগামী। তবে বিতর নামায ইশার নামাযের অনুগামী নয়। সুতরাং যদি অপবিত্রাবস্থায় ইশার নামায আদায় করা হয় আর তারাবীহ নামায পবিত্রাবস্থায় আদায় করা হয় তাহলে ইশার নামাযের সাথে সাথে তারাবীহ নামাযকেও দ্বিতীয়বার পড়তে হবে। বিতর দ্বিতীয়বার

পড়তে হবে না। –আব্দুর রাহমান শাইখযাদাহ, মাজমাউল আনহুর ফী শারহি মুলতাকাল আবহুর ১/২০২

২. তারাবীহ নামাযের সময় হলো, ইশার নামাযের পর থেকে নিয়ে সুবহে সাদিক পর্যন্ত। কারণ তারাবীহ নামায হলো, নফল নামায যা ইশার নামাযের পর সুন্নাত হিসেবে প্রবর্তন করা হয়েছে। এবং এটাই সর্বাধিক সঠিক অভিমত। –খাসরু বিন কারামুয রুমী (৮৮৫ হি. ১৪৮০ খৃ.), দুরারুল হুক্কাম শারহু গুরারিল আহকাম ১/২৩৩

৩. তারাবীহ নামাযের সময় হলো ইশার নামাযের পর থেকে নিয়ে সুবহে সাদিক পর্যন্ত। –মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর রাযী, তুহফাতুল মুলূক ১/৮১

৪. ইশার নামায সম্পন্ন করার পরই তারাবীহ নামাযের সময় আরম্ভ হয়। –আব্দুল কারীম রাফিয়ী, ফাতহুল আযীয ফী শারহিল ওয়াজীয ৭/১৫৯

৫. অধিকাংশ মাশায়েখে কেরামের অভিমত অনুসারে তারাবীহ নামাযের সময় হলো, ইশা এবং সুবহে সাদিকের মধ্যবর্তী সময়। কেউ যদি ইশার নামাযের পূর্বে তারাবীহ পড়ে তাহলে তারাবীহ নামায হবে না। তবে যদি বিতর নামাযের পরে পড়ে তাহলে আদায় হবে। কারণ তারাবীহ নামায হলো নফল নামায যা ইশার নামাযের পর সুন্নাত হিসেবে প্রবর্তন করা হয়েছে। সুতরাং তারাবীহ নামাযটি ইশার নামায পরবর্তী সুন্নাত নামাযের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। –বুরহানুদ্দীন মাহমুদ বিন আহমদ, আলমুহীতুল বুরহানী ২/১৮৪

৬. বিশুদ্ধ মতানুসারে তারাবীহ নামাযের সময় হলো ইশার নামাযের পর থেকে নিয়ে শেষ রাত পর্যন্ত। কারণ তারাবীহ নামায হলো নফল নামায যা ইশার নামাযের পর সুন্নাত হিসেবে প্রবর্তন করা হয়েছে। হিদায়া কিতাবে এমনটিই রয়েছে। –আবূ বকর ইবনে আলী যাবিদী, আলজাউহারাতুন নাইয়িরাহ ১/৩৯০

৭. রমাযান মাসে তারাবীহ এবং বিতর নামাযের সময়:

রমাযান মাসে ইশার নামাযের পর বিতরের সাথে তারাবীহ নামাযটি আদায় করা হয়। অর্থাৎ ইমাম সাহেব মুসল্লীদের নিয়ে নামায আদায় করেন এবং বিতর নামায পড়েন। এ কারণে তারাবীহতে বিতর পড়া হয়। –মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ শানকিতী, শারহু যাদিল মুস্তানকি' ৩/৪৭

৮. বিতর এবং তারাবীহের সময় হলো, ইশার নামাযের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত। কারণ পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণ থেকে এমনটিই বর্ণনা করেছেন। এবং ইমাম আবূ দাউদ রহ.সহ অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেন, আল্লাহ একটি নামায দান করেছেন যা তোমাদের জন্য লাল উট থেকেও উত্তম। আর তা হলো বিতরের নামায। ইশা থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত তোমাদের জন্য সময় সীমা বেধে দিয়েছেন। মাহামিলী রহ. বলেন, বিতরের নামাযের উৎকৃষ্ট সময় হলো, মধ্য রাত্রি অবধি সময়। কাযী আবুত তাইয়িব প্রমুখ বলেন, মধ্য রাত্রি অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। আর তারাবীহের উৎকৃষ্ট সময় তাই যা বিতরের সময় হিসেবে বলা হলো। –যাকারিয়া আলআনসারী, আসনাল মাতালিব ৩/২০৩

৯. ইশার নামায শেষ হওয়ার পর থেকে তারাবীহ নামাযের সময় প্রবেশ করে। ইমাম বাগাবী রহ. প্রমুখ এ কথা উল্লেখ করেছেন। এবং তা সুবহে সাদিক পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। –ইমাম নববী, কিতাবুল মাজমু' ৪/৩২

১০. তারাবীহ নামাযের সময় ইশার নামাযের সুন্নাতের পর বিতরের পূর্বে সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত। সুতরাং ইশার নামাযের পূর্বে তারাবীহ নামায হবে না। যে ব্যক্তি ইশার নামায পড়ে তারাবীহ পড়ল অতঃপর জানা গেল সে বিনা উযুতে ইশার নামায পড়েছে তাহলে সে তারাবীহকে পুনরায় পড়বে। কারণ তারাবীহ নামায হলো, সুন্নাত নামায যা ফরয নামাযের পর প্রবর্তন করা হয়েছে। সুতরাং তারাবীহ নামায ইশার সুন্নাতের মত ফরযের পূর্বে শুদ্ধ হবে না। –ওয়াহবাহ যুহাইলী, আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ ২/২৫

১১. ইবনে হাজার হাইতামী রহ. কে প্রশ্ন করা হলো, ইমাম হালিমী থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, 'তারাবীহ নামাযের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হলো, তা রাতের এক চতুর্থাংশ অতিক্রম করার পর আদায় করবে। আর ইশার পর শুরু সময়ে তারাবীহ নামায আদায় করা অলস এবং সৌখিন প্রকৃতির লোকদের নব উদ্ভাবিত একটি পন্থা। এটা কোনো সুন্নাহসম্মত নামায নয়।...' তো ইমাম হালিমী রহ. তারাবীহ বিষয়ে যা বললেন তা অন্যান্য ইমামের বক্তব্যের সমর্থক কি না? এবং তা নির্ভরযোগ্য কি না? এবং তার বক্তব্য মতে যে ব্যক্তি রাতের শুরু ভাগে তারাবীহ নামাযের জামাআত পেল তার জন্য কি জামাআতের সওয়াব লাভের আশায় তখন তারাবীহ পড়া উত্তম হবে না কি সুন্নাহসম্মতভাবে পড়ার জন্য বিলম্বে পড়া উত্তম হবে?

উত্তরে তিনি বললেন, মাসআলাটি 'শরহুল উবাব' গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। তো এ বক্তব্যে ঘোর আপত্তি রয়েছে। সহীহ বুখারীর বর্ণনা দ্বারা এ বক্তব্য ভণ্ডুল হয়ে যায়। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, উমর রাযি. এর শাসন আমলে উবাই রাযি. সাহাবীদের নিয়ে তারাবীহ পড়েছেন ঘুমিয়ে যাওয়ার পূর্বে। এতে ইমাম হালিমীর বক্তব্যের বিপরীত মত যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়।

তারাবীহ নামাযের উৎকৃষ্ট সময় হলো তাই যা বিতরের উৎকৃষ্ট সময়। আর তা হলো রাতের এক তৃতীয়াংশ সময়। ... তিনি তার বক্তব্যের মানদণ্ড বানিয়েছেন সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতিকে যে সাহাবায়ে কেরাম রাতের প্রথম এক চতুর্থাংশ ঘুমাতেন। এরপর দুই চতুর্থাংশ নামায পড়তেন। আর সহীহ বুখারীতে যে বর্ণনা রয়েছে তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা ঘুমের পূর্বেই নামায পড়তেন। এতে হালিমী রহ. এর বক্তব্য খণ্ডন হয়ে যায়। তাছাড়া তার বক্তব্য অন্যান্য ইমামের বক্তব্যেরও বিপরীত। কারণ শাফিয়ী মাসলাকের ইমামগণ সময়ের ক্ষেত্রে তারাবীহ নামাযকে ইশার নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। আর এর বাহ্যিক অর্থ হলো, তারাবীহ নামাযকে শুরু সময়ে পড়া উত্তম। হালিমী রহ. অন্যান্য ইমামদের বিপরীত মত গ্রহণ করেছেন। কারণ তিনি ধারণা করেছেন, তিনি সাহাবায়ে

কেরাম সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সত্য এবং যথার্থ। এ বর্ণনা যে শুদ্ধ নয় তা পূর্বে স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং পূর্বে যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তাই যথার্থ। আর যদি শুরুতে জামাআতের সাথে তারাবীহ পড়া আর শেষ রাতে বিনা জামাআতে তারাবীহ পড়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাহলে জামাআতের সাথে প্রথম রাত্রে তারাবীহ পড়াই উত্তম যদি জামাআতের যাবতীয় বিধি ও শর্ত রক্ষা করা হয়। –ইমাম ইবনে হাজার হাইতামী, আলফাতাওয়া আলকুবরা আলফিকহিয়্যাহ আলা মাযহাবিল ইমাম আশশাফিয়ী ২/৪৬-৪৭

তাহাজ্জুদ বা রাত্রিকালীন নফল নামাযের সংখ্যা কি নির্দিষ্ট?

যাইদ বিন খালিদ জুহানী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> আমি একদা প্রতিজ্ঞা করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাতের নামায আদায় করা দেখবো। তো দেখলাম, তিনি সংক্ষিপ্ত দু রাক'আত নামায আদায় করলেন। এরপর বেশ দীর্ঘ দু রাক'আত নামায আদায় করলেন। এরপর আবার দু রাক'আত নামায আদায় করলেন। এ দু রাক'আত পূর্বের দু রাক'আত থেকে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর আবার দু রাক'আত নামায আদায় করলেন। এ দু রাক'আত পূর্বের দু রাক'আত থেকে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর আবার দু রাক'আত নামায আদায় করলেন। এ দু রাক'আত পূর্বের দু রাক'আত থেকে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর আবার দু রাক'আত নামায আদায় করলেন। এ দু রাক'আত পূর্বের দু রাক'আত থেকে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর (এক রাক'আত) বিতর পড়লেন। এ ছিল মোট ১৩ রাক'আত। –সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৮৪০

আবূ মালিক কামাল ইবনে সাইয়িদ সালিম বলেন,

> হাদীসে বর্ণিত রাক'আত সংখ্যার চেয়ে বেশি পড়া জায়েয কি না? এটা এমন একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যাকে কেন্দ্র করে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থী এবং সুন্নাহর ব্যাপারে আগ্রহী ভাইদের মাঝে বিবাদ বিসংবাদ ফুসে উঠছে। তারা সমসাময়িক এক বিজ্ঞ ইমামের তাকলীদ করে বলেন, এগার রাক'আতের বেশি পড়া জায়েয নেই!! সম্ভবত সে এ ক্ষেত্রে

একটি পুণ্যের অধিকারী হবে। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বিপুল সংখ্যক উলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, নির্দিষ্ট সংখ্যক রাক'আতের অতিরিক্ত আদায় করা জায়েয আছে। এ কারণেই কাযী ইয়াজ রহ. বলেন, রাতের নামাযের ব্যাপারে এমন কোনো রাক'আত সংখ্যা নির্ধারিত নেই যে এর কম বেশ করা যাবে না। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। রাতের নামায একটি ইবাদত। এর পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাবে পুণ্যও ততো বৃদ্ধি পাবে। ইবনে আব্দুল বার রহ. আততামহীদ গ্রন্থে বলেন, এ ব্যাপারে মুসলিমদের মাঝে কোনো মতভিন্নতা নেই যে, রাতের নামাযে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। এটা নফল নামায, ভাল কাজ এবং পুণ্যের কাজ। যে ইচ্ছে কম পড়বে যে ইচ্ছে বেশি পড়বে। আমি বলি, এ অভিমতের শুদ্ধতার ব্যাপারে নিম্নের বর্ণনাগুলো প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে।

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রাতের নামায দু রাক'আত দু রাক'আত করে। যখন সুবহে সাদিক উদিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করবে তখন এক রাক'আত সংযোজন করার মাধ্যমে বিতর পড়ে নিবে। –সহীহ বুখারী; হাদীস ৪৭৩
২. রবীআহ ইবনে কা'ব আসলামী রা. একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অধিক সেজদার মাধ্যমে তোমার নিজের জন্য আমাকে সহায়তা করো। –সহীহ মুসলিম; হাদীস ১১২২
৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি যখন আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশে সিজদা করবে আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে অবশ্যই তোমার একটি পদমর্যাদা সমুন্নত করবেন এবং তোমার একটি পাপ মার্জনা করে দিবেন।
৪. উপরোক্ত প্রমাণাদির আলোকে প্রমাণিত হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য যে সংখ্যা চয়ন করেছেন তা সীমাবদ্ধ এবং সংকীর্ণ নয়। কারণ,

   (ক) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্মপন্থা তাঁর উক্তিকে সীমাবদ্ধ করে দেয় না।

   (খ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগার রাক'আতের বেশি পড়তে নিষেধ করেননি। বরং তিনি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিকতর প্রিয় নামাযকে নির্ধারিত করেছেন। আর তা হলো রাতের

তৃতীয়াংশে দাউদ আলাইহিস সালাম এর নামায। এজন্যই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, (মাজমূউল ফাতাওয়া ২২/২৭২-২৭৩) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের রাতের নামাযের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো রাক'আত সংখ্যা উল্লেখ করে যাননি। ...আর যে ব্যক্তি ধারণা করে, রমাযানে রাতের নামাযে নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে এর কম বেশ করা যাবে না, সে ভুল করেছে।

(গ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামাযের এ নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেননি। যদি মেনে নেয়া হয়, তিনি এ ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছেন (এমন কথা কেউ বলেননি।) তাহলেও এ ব্যাপারটি পূর্বোক্ত ব্যাপকভিত্তিক প্রমাণাদিকে সংকীর্ণ করার উপযোগী নয়। স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি হলো ব্যাপকভিত্তিক কোনো বিষয়কে তার কোনো একটি শাখাগত বিষয়ের কারণে সংকীর্ণ করা যায় না। তবে বিরোধপূর্ণ হলে ভিন্ন কথা।

লেখক আরো বলেন,

> আমরা পিছনে আলোচনা করে এসেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান এবং রমাযানের বাহিরে নিজ ঘরে রাতের নামায এগারো অথবা তের রাক'আতের বেশি পড়তেন না। তবে যে রাতগুলোতে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তারাবীহ নামায পড়েছেন সে রাতের নামাযের রাক'আত সংখ্যা উল্লেখ নেই। এবং এ রাতগুলোর রাক'আত সংখ্যা নির্ধারণের ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস নেই। এ কারণেই এ রাতের নামাযের রাক'আত সংখ্যা নিয়ে মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।

এরপর লেখক মহোদয় তারাবীহ এর রাক'আত সংখ্যার ব্যাপারে চারটি মত (আট, বিশ, ছত্রিশ, চল্লিশ) উল্লেখ করে বলেন,

> আমি বলি, এ ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া রহ. (২২/২৭২-২৭৩) যে অভিমত পেশ করেছেন তাই শিরোধার্য যে, ...তারাবীহ এর রাক'আত সংখ্যার ব্যাপারে সবগুলো মতই যথাযথ। রমাযান মাসে উল্লিখিত পদ্ধতির যে কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে সেটাই উত্তম হবে। মুসল্লীদের অবস্থা ভেদে শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচিত হবে। যদি মুসল্লীরা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয় তাহলে তিন রাক'আত বিতরসহ তের রাক'আত পড়া উত্তম হবে। যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে রমাযান এবং রমাযানের বাইরে পড়তেন। আর যদি তারা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম না হয় তাহলে বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়াই উত্তম। অধিকাংশ মুসলিমরা এর উপরই আমল করছে। কারণ এটা দশ এবং চল্লিশের মধ্যবর্তী পদ্ধতি। আর যদি কেউ চল্লিশ রাক'আত বা কম বেশি পড়ে তাও জায়েজ আছে। এগুলোর কোনোটিই অপছন্দনীয় হবে না। একাধিক ইমাম এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে অভিমত পেশ করেছেন। যেমন ইমাম আহমদ রহ. প্রমুখ। আর যে ব্যক্তি ধারণা করে, রমাযানে রাতের নামাযে নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে এর কম বেশ করা যাবে না সে ভুল করেছে।

আমি বলি, ফিকহী অনুধাবন এমন হওয়াই যুক্তিযুক্ত। যৌক্তিক এ ফিকহী বোধ থেকে আমাদের কতক ভাইয়েরা কতটা যোজন দূরে চলে গেছে যারা হারাম শরীফের তারাবীহ এর জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং দশ রাক'আত পড়েই উঠে চলে যায় !! আল্লাহ আমাদের এবং তাদের মার্জনা করুন। –সহীহু ফিকহিস সুন্নাহ ১/৪১৮-৪১৯

আল্লামা কাশ্মিরী রহ. এর বক্তব্য

গাইরে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা তাহাজ্জুদ সংক্রান্ত সহীহ বুখারীর একটি হাদীসের অযথার্থ ব্যাখ্যা করে তা তারাবীহ এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন। এবং বলেন, তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ একই নামাযের দুই নাম। যে নামায সারা বছর তাহাজ্জুদ হিসেবে গণ্য হয় তাই শুধু রমাযান মাসে এসে তারাবীহতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যখন তাঁদেরকে বলা হয়, ভাই! তাহাজ্জুদ এবং তারাবীহ একই নামায বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণ করে দেখান। তখন তারা হাদীসের পথে না গিয়ে আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. কে তুলে ধরেন। আমরা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. এর পূর্ণ বক্তব্যটিকে উদ্ধৃত করে সে ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চেষ্টা করবো। আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন,

> ব্যাপকভাবে উলামায়ে কেরাম বলে থাকেন, তারাবীহ এবং সালাতুল লাইল ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত দু'টি নামায। আমার মতে এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কথা হলো, এ দু'টি একই নামায। যদিও দু'টির মাঝে বৈশিষ্ট্যগত ব্যবধান রয়েছে। যেমন তারাবীহকে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকভাবে পড়া হয় এবং জামাআতসহ আদায় করা হয় এবং কখনো শুরু রাত্রে পড়া হয় আবার কখনো সাহরীর সময় পর্যন্ত পড়া হয়। তাহাজ্জুদ এসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কারণ তাহাজ্জুদ শেষ রাতে পড়া হয় এবং তাতে কোনো জামাআত হয় না। আর বৈশিষ্টগত

> ব্যবধানের কারণে দু'টি নামাযকে আলাদা দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা আমার নিকট পছন্দনীয় নয়। এ দু'টি নামায মূলত একই নামায। শুরু রাত্রে পড়া হলে তা তারাবীহ হয় আর শেষ রাতে পড়লে তা তাহাজ্জুদ নামায হয়ে যায়। আর বৈশিষ্টগত ব্যবধানের কারণে ভিন্ন নামে নামকরণ করা কোনো নতুন বিষয় নয়। কারণ উম্মাহর ঐকমত্য হলে নামের ভিন্নতায় কোনো সমস্যা নেই। –আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী, ফাইযুল বারী ৪/২৩, ২৪

কাশ্মিরী রহ. এখানে যে ধারণাটি দেয়ার চেষ্টা করেছেন তা হয়তো তাঁর নিজস্ব বিবেচনায় যথার্থ এবং যৌক্তিক ছিল। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় এখানে ভিন্নমত প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ এবং উপাদান রয়েছে। কারণ সত্তাগত সব রকমের নামাযই এক ও অভিন্ন। পদ্ধতিগতভাবে কোনো নামাযের মাঝে ব্যবধান তৈরি করার কোনো সুযোগ নেই। কিয়াম, রুকু, সিজদা, কিরাত, জালসা নামাযের এসব মৌলিক দিক বিবেচনায় সব নামাযই এক। সময় কিংবা জামাআতের বিবেচনায় নামাযগুলো ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়। একই নামায দুপুরে পড়লে যোহর হয়ে যায় এবং সূর্যোদয়ের দেড় দুই ঘণ্টা পর পড়লে তা ইশা হয়ে যায়। অথচ এ দু'টি নামাযের মাঝে কোনো রকমের ব্যবধান নেই। এমনকি দু'টি নামাযের রাক'আত সংখ্যাও এক ও অভিন্ন। তাহলে কি আমাদের জন্য একথা বলার সুযোগ আছে, এ দু'টি একই নামাযের দুই নাম? এখানে তো ব্যবধান শুধু সময়ের ও কিরাতগত নীরাতা ও সরবতার। অন্য কোনো কিছুতে ব্যবধান নেই। ধাতুগতভাবে দু'টি পদার্থ এক হলেও তা বৈশিষ্ট্য কিংবা গুণগত কারণে আলাদা শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়। লৌহ নির্মিত পৃথিবীর তাবৎ উপকরণই এক ও অভিন্ন। কিন্তু প্রক্রিয়াগত, গুণগত কিংবা বৈশিষ্টগত কারণে তা হাজারো শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েছে। বস্তুত বৈশিষ্ট্যগত কারণেই বস্তুনিচয়ের মাঝে শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টি হয়ে যায়। নতুবা পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিসই ধাতুগতভাবে একজাতীয় উপাদানে প্রস্তুতকৃত। লোহা, পানি, মাটি, বৃক্ষ, প্রাণী ইত্যাদী কয়েকটি মৌলিক জিনিসকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীটা চলমান। এ গুটি কয়েকটি বস্তু থেকেই পৃথিবীর লক্ষ কোটি শ্রেণীর বস্তুনিচয় তৈরি হয়েছে। এজন্য বস্তুগতভাবে লৌহনির্মিত সব জিনিসকে এক বলে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাছাড়া একটি জিনিসের কয়েকটি নাম হতে পারে। তবে শর্ত হলো, যে কোনো সময় এবং যে কোনো স্থানে যে কোনো নামে ডাকার সুযোগ অবারিত থাকতে হবে। স্থান কাল পাত্র ভেদে নাম পরিবর্তন হলে বুঝতে হবে জিনিসটা মূলত এক ও অভিন্ন নয়। সুতরাং শুরু রাত্রে পড়লে যে নামাযকে তারাবীহ বলা যায় তাহাজ্জুদ বলা যায় না কেবল

শেষ রাত্রে পড়লেই তাকে তাহাজ্জুদ বলা যায় এ দুই নামের নামাযকে আর যাই হোক এক নামায বলা যায় না।

কাশ্মিরী রহ. আরো বলেন,

> 'তবে তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে ভিন্ন শ্রেণীর ব্যবধান তখনই প্রমাণিত হবে যখন প্রমাণিত হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীহ নামাযের সাথে সাথে তাহাজ্জুদও পড়েছেন। মুহাম্মাদ বিন নাসর কিয়ামুল্লাইল সংক্রান্ত কয়েকটি অধ্যায় রচনা করেছেন। এবং তিনি লিখেছেন, কোনো কোনো সালাফের অভিমত হলো, যে ব্যক্তি তারাবীহ নামায পড়বে তার জন্য তাহাজ্জুদ পড়া নিষেধ। আবার কেউ কেউ বলেন, তার জন্য সাধারণ নফল নামায পড়ার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের মতভিন্নতাটা তেমন জটিল হয়নি। কারণ তাদের মতে এ দু'টি নামায একই নামায। উমর রাযি. এর কর্মপন্থা এ বক্তব্যের সমর্থন করে। কারণ তিনি নিজ গৃহে শেষ রাতে তারাবীহ পড়তেন। অথচ তিনি নিজেই স্বউদ্যোগে তারাবীহ নামায জামাআতসহ মসজিদে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করেননি। তার কারণ হলো, তিনি জানতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্মপন্থা হলো, শেষ রাতে তারাবীহ পড়া। এরপর তিনি এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামকে সতর্ক করলেন, তোমরা শুরু রাতে যে নামায পড়ো তার তুলনায় শেষ রাতের নামায শ্রেষ্ঠতর। তো তিনি দু'টি নামাযকে এক করে দিয়েছেন। এবং শেষ রাতের নামাযকে শুরু রাতের নামাযের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন। উলামায়ে কেরাম যখন উমর রাযি. এর বক্তব্যের মর্মার্থ বুঝতে পারলেন না তখন তারা তাঁর বক্তব্যকে দু'টি আলাদা নামাযের সপক্ষে প্রমাণ বানিয়ে ফেললেন। এবং বিশ্বাস করে নিলেন, তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ আলাদা দু'টি নামায। –আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী, ফাইযুল বারী ৪/২৩, ২৪

প্রথম কথা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম যে তারাবীহ এর সাথে তাহাজ্জুদ পড়েননি তারও কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়নি তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর তাহাজ্জদ নামায ফরয ছিল। এরপর মি'রাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায

ফরয হলে তাহাজ্জুদ নামাযের আবশ্যকতা রহিত হয়ে যায়। –সূরা মুয্যাম্মিল-৩, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫৭৪, মা'আরিফুল কুরআন ৭৮৭
ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,

> রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পদার্পন করলেন তখন দেখলেন, ইয়াহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? তারা উত্তরে বলল, এটি একটি পুণ্যময় দিন। এ দিন আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাইলকে তাদের শত্রুদের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন। ফলে মূসা আ. রোযা রেখেছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি মুসা আ. এর ব্যাপারে তোমাদের তুলনায় বেশি অধিকার রাখি। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। এ ঘটনার পর আল্লাহ তা'আলা এক মাসের রোযার বিধান প্রবর্তন করে আয়াত অবতীর্ণ করলেন। –সহীহ বুখারী; হাদীস ২০০৪, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ৩/২৫৫

সারকথা, তাহাজ্জুদ এটি ইসলামের প্রথম যুগের বিধান। রমাযানের রোযা ফরয হওয়ার অনেক আগে ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় তাহাজ্জুদ বিষয়ে সূরা মুয্যাম্মিল অবতীর্ণ হয়। আর রমাযানের রোযা ফরয হয় হিজরতের পর মদীনায় দ্বিতীয় হিজরীতে। আর তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতা'আলা রমাযানের রোযা তোমাদের উপর ফরয করেছেন এবং আমি এই মাসে রাত জেগে নামায পড়াকে সুন্নাত করেছি। –সুনানে নাসায়ী; হাদীস ২২০৯, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ১৩২৮

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত হাদীসে রমাযানের রাতে যে নামাযকে সুন্নাত করেছে তা দ্বারা যদি তাহাজ্জুদ উদ্দেশ্য হয় তাহলে তো হাদীসটি অনর্থক সাব্যস্ত হয়ে যায়। কারণ তাহাজ্জুদ নামাযের বিধান তো আগে থেকেই পুরো বছরের জন্য প্রবর্তিত হয়ে আছে। তো এখন নতুন করে তাহাজ্জুদকে সুন্নাত হিসেবে প্রবর্তন করার কী মানে হতে পারে? তাছাড়া রোযার বিধান প্রবর্তিত হওয়ার আগে তো বহু রমাযান অতীত হয়েছে সেসব রমাযানে কি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম তাহাজ্জুদ আদায় করেননি? আদায় করে

থাকলে এখন নতুন করে তাহাজ্জুদের বিধান প্রণয়নের কি স্বার্থকতা থাকতে পারে। তাছাড়া তাহাজ্জুদের বিধানটি আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কুরআনে পাকে অবতীর্ণ করেছেন। তাহলে এ ব্যাপারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত বাণীটি কি করে প্রযোজ্য হতে পারে? যদি বলা হয় রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত তাহাজ্জুদের বিধানটিরই সীমাহীন গুরুত্ব বুঝানোর জন্য উক্ত উক্তি করেছেন। তাহলে বলব, আল্লাহ প্রদত্ত তাহাজ্জুদের বিধানটি তো সারা বছরের জন্য ব্যাপৃত ছিল। এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে তো রমাযানের মাঝে সীমিত করে দেয়া হয়েছে। দু'টি বিষয়ের সীমানা পরিধি তো এক হওয়া চাই। তা না হলে গুরুত্ব বর্ণনার কোনো সুযোগ থাকে না। বরং তা আলাদা দু'টি বিষয়ে পরিণত হয়ে যায়। বরং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীটি এমন নামাযের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যার বিধান কুরআন মাজীদের মাধ্যমে নয়, হাদীসের মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়েছে। আর তা হলো তারাবীহ নামায।
তাহাজ্জুদ ইসলামের শুরু যুগে সবার উপর ফরয ছিল। এক বছর পর তাহাজ্জুদের ফরয বিধান রহিত হয়ে রমাযান এবং অন্যান্য মাসে নফল হিসেবে চলমান থাকে। সা'দ বিন হিশাম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> আমি আয়িশা রাযি. কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায সম্বন্ধে। তখন তিনি বললেন, তুমি কি পাঠ করোনি {يا أيها المزمل}? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পাঠ করেছি। আয়িশা রাযি. বললেন, যখন এ সূরাটির প্রথম অংশ অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবায়ে কেরাম রাতে নামায পড়তে শুরু করেন। ফলে তাঁদের পদদ্বয় ফুলে যায়। সূরার শেষ অংশ এগারো মাস আকাশে আবদ্ধ থাকে। এক বছর পর তা অবতীর্ণ হয়। সুতরাং রাতের নামায ফরয হওয়ার পর নফলে পরিণত হয়ে যায়। –সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৩৪২

আয়িশা রাযি. এর হাদীস দৃষ্টে ইমাম বাগাভী রহ. বলেন,

> এই আয়াতের আলোকে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ রাত্রির নামায একসময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সমগ্র উম্মতের উপর ফরয করা হয়। এটা পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার পূর্বের কথা। এই আয়াতে তাহাজ্জুদের নামায কেবল ফরযই করা হয়নি; বরং তাতে রাত্রির কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ নিযুক্ত থাকাও ফরয করা হয়েছে। কারণ আয়াতের

মূল আদেশ হচ্ছে, কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাত্রি নামাযে রত থাকা। উক্ত আয়াতের আদেশ পালনার্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ রাত্রি তাহাজ্জুদের নামাযে ব্যয় করতেন। ফলে তাঁদের পদদ্বয় ফুলে যায় এবং আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ একবছর পর সূরার শেষাংশ فاقرءوا ماتيسر منه অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ নামাযে দণ্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যক্ত করা হয় যে, যতক্ষণ নামায পড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামায পড়াই তাহাজ্জুদের জন্য যথেষ্ট। এই বিষয়টি সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে নাসায়ীতে আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, মিরাজ রাত্রিতে পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হলে তাহাজ্জুদের আদেশ রহিত হয়ে যায়। তবে এরপরও তাহাজ্জুদ সুন্নাত থেকে যায়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। –মা'আরিফুল কুরআন (বাংলা); পৃষ্ঠা ১৪১৪

হাদীসটির পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। তা হলো, তাহাজ্জুদ প্রথমে ফরয ছিল। এরপর তা নফল করা হয়। অন্য দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীহ নামায ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে জামাআতবদ্ধভাবে নিয়মতান্ত্রিক পড়েননি। এখন যদি বলা হয়, তাহাজ্জুদ এবং তারাবীহ একই নামায তাহলে প্রশ্ন হয়, একই নামাযকে একবার ফরয করলেন এরপর আবার তার ফরয বিধান রহিত করে নফল করে দিলেন এরপর আবার সেই নামাযের নফল বিধান রহিত করে দিয়ে আবার ফরয করে দিবেন বা দিতেন? ইসলামী শরীয়ার কোনো বিধানের ক্ষেত্রে কি এমনটি হয়েছে যে, একবার ফরয করে আবার নফল করা হয়েছে। এরপর আবার ফরয করা হয়েছে বা ফরয করার আশংকা বা আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন তাহাজ্জুদ শেষ রাতে পড়তেন। মাসরুক রহ. বলেন,

আমি আয়িশা রাযি. কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে কখন নামায আদায় করতেন? উত্তরে তিনি বললেন, যখন গভীর রজনীতে মোরগের ডাক

শুনতেন তখন নামায আদায় করতেন। –সহীহ বুখারী; হাদীস ১১৩২

অন্য দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীহ নামায শুরু রাত্র থেকে পড়া আরম্ভ করতেন। আবূ যর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রোযা রাখতাম। তিনি আমাদের নিয়ে রমাযান মাসে রাতের নামায পড়েননি। তবে রমাযানের সাত দিন অবশিষ্ট থাকতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নামায পড়লেন। রমাযানের ছয় দিন বাকি থাকতে আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন না। আবার রমাযানের পাঁচ দিন বাকি থাকতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্ধ রাত্র পর্যন্ত আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমাদের সারা রাত নামায পড়ার সুযোগ দিতেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন কোনো ব্যক্তি ইমামের নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত তার সাথে নামায পড়ে তখন তার আমল নামায় সারা রাত নামায পড়ার পুণ্য লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। এরপর রমাযানের চার দিন বাকি থাকতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন না। তবে রমাযানের তিন দিন বাকি থাকতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পরিবার, স্ত্রী এবং অন্যান্য লোকদের একত্রিত করলেন এবং আমাদের নিয়ে সফলতা ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত নামায পড়লেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সফলতা কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাহরীর সময়। এরপর রমাযানের অন্যান্য দিনগুলোতে আমাদের নিয়ে রাতের নামায পড়েননি। –সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৩৭৭, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ১০৯২

সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবিয়ীগণও শুরু রাত্র থেকে তারাবীহ পড়া আরম্ভ করতেন। হাসান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

মানুষ রমাযান মাসে নামায পড়ত। যখন রাতের একচতুর্থাংশ গত হয়ে যেত তখন ইশার নামায পড়ত। এবং যখন নামায থেকে ফিরে আসত তখন রাতের

> একচতুর্থাংশ অবশিষ্ট থেকে যেত। —মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক; হাদীস ৭৭৪০

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় তাহাজ্জুদ একাকী পড়তেন। কখনো লোকজন ডেকে জামআত করতেন না। তবে যদি কেউ এসে দাঁড়িয়ে যেত তবে তিনি কিছু বলতেন না। যেমন ইবনে আব্বাস রাযি. নিজে একবার তাহাজ্জুদের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তবে তারাবীহ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এর জন্য কয়েকবার ডেকে ডেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাআত করেছেন। অন্য দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের জন্য পুরো রাত কখনো জাগ্রত থাকেননি। আয়িশা রাযি. বলেন,

> রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোর পর্যন্ত পূর্ণ রাত নামায পড়েননি এবং কোনো রাত্রে পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়েননি। —সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৩৪২

আয়িশা রাযি. এর এ বক্তব্য ছিল তাহাজ্জুদ বিষয়ে। নতুবা উপরে আবূ যর রাযি. এর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহে সাদিক পর্যন্ত তারাবীহ নামায পড়েছেন। আর আবূ যর রাযি. এর বর্ণনা সম্পর্কে আয়িশা রাযি. এর সম্যক ধারণা ছিল। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ স্ত্রীদেরকে একত্রিত করে তারাবীহ নামায পড়েছেন। সুতরাং এ বিষয়টি আয়িশা রাযি. এর অগোচরে থাকার কোনো প্রশ্নই উঠে না। —ফাতাওয়া রশীদিয়া ৩৫২

তারাবীহর রাকাত সংখ্যা বিষয়ে আল্লামা কাশ্মিরী রহ. এর অভিমত

সালাফী ভাইয়েরা আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে কি বুঝাতে চান? তারা কি বুঝাতে চান, কাশ্মিরী রহ. যেহেতু জোর দিয়ে বলেছেন, তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ এক নামায সুতরাং তার নিকটও তারাবীহ এর রাক'আত সংখ্যা বিশ রাক'আত নয়; আট রাক'আত? তবে শুনুন তাঁর তারাবীহের রাকাত সংখ্যা বিষয়ক বক্তব্য। কাশ্মিরী রহ. বলেন,

> উমর রাযি. থেকে তারাবীহ নামাযের বিভিন্ন সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তমূলক চূড়ান্ত বক্তব্য হলো, তারাবীহ নামাযের রাক'আত সংখ্যা হলো বিশ রাক'আত; সাথে বিতরের তিন রাক'আত। মুয়াত্তা মালিকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, উমর রাযি. কিরাতকে সংক্ষিপ্ত করে দিয়ে রাক'আত সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন। উম্মাহর সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়ে যাওয়ার পর এখন আমাদের জন্য আলোচনার সুযোগ নেই যে, এটা উমর রাযি. এর ইজতিহাদপ্রসূত কর্মপদ্ধতি ছিল কি না? যে ব্যক্তি হাদীস অনুযায়ী আমল করতে চায় তার জন্য উত্তম হলো, সাফল্য বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ সাহরীর সময় শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তারাবীহ নামায পড়বে। কারণ এটা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রমাযানের শেষ দিনের নামায। আর যে ব্যক্তি আট রাক'আত তারাবীহকে যথেষ্ট মনে করে এবং বৃহত্তম জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এবং তাদেরকে বিদআতের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তারা অবশ্যই তাদের পরিণতি দেখতে পাবে। —আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী, ফাইযুল বারী ৪/৩৪১

অন্যত্র আল্লামা কাশ্মিরী রহ. বলেন,

> ইমাম চতুষ্টয়ের কেউ তারাবীহের রাক'আত সংখ্যা বিশের কম বলেননি। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কেরামের অভিমত এটিই। —আলআরফুস সাযী শরহু সুনানিত তিরমিযী ২/২৯৩

ইমাম বুখারী রহ. এর কর্মপন্থা

গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় একটি বিষয় হলো, গাইরে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা আট রাক'আত তারাবীহ এর পক্ষে ইমাম বুখারী রহ. এর তাহাজ্জুদ বিষয়ক নির্দিষ্ট হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকেন এবং ইমাম বুখারী রহ. এর অনুসরণের খুব আগ্রহ ও উদ্দীপনা প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. কি আট রাক'আত তারাবীহ এর পক্ষে ছিলেন? তারাবীহ নামায আদায়ের ব্যাপারে তাঁর কর্মপন্থা কি ছিল? ইতিহাস বলে, ইমাম বুখারী রহ. তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদকে এক নামায মনে করতেন না; বরং দু'টি নামাযকে ভিন্ন ভিন্ন নামায মনে করতেন। তিনি রাতের প্রথম ভাগে তারাবীহ পড়তেন এবং শেষ ভাগে তাহাজ্জুদ পড়তেন। আর তারাবীহের প্রতি রাক'আতে বিশ আয়াত করে পাঠ করতেন এবং এভাবেই কুরআন খতম করতেন। ঘটনাটি ইবনে হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীর ভূমিকা গ্রন্থ হাদয়ুস সারীতে, ইউসুফ আলমিযযী তাহযীবুল কামাল গ্রন্থে এবং খতীবে বাগদাদী রহ. তাঁর রিজাল গ্রন্থ তারিখে বাগদাদে নির্ভরযোগ্য সূত্রে এনেছেন। বিষয়টির আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

> قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن خالد حدثنا مقسم بن سعد قال كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلى بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين آية

وكذلك إلى أن يختم القرآن وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال

অর্থ: মাকসাম বিন সা'দ রহ. বলেন, রমাযান মাসে রাতের প্রথম ভাগে মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারীর নিকট তাঁর শিষ্যবৃন্দ জড়ো হয়ে যেত। তখন তিনি তাদের নিয়ে নামায পড়তেন। এবং প্রত্যেক রাক'আতে বিশ আয়াত করে পাঠ করতেন। এবং এভাবে তিনি কুরআন খতম করতেন। আর সাহরীর সময় নামাযে কুরআনের অর্ধাংশ থেকে নিয়ে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পাঠ করতেন। এভাবে তিন রাতে সাহরীর সময় কুরআন খতম করতেন। –ইবনে হাজার আসকালানী, হাদয়ুস সারী ৫৬৩, ইউসুফ আলমিযযী, তাহযীবুল কামাল ২৪/৪৪৬, খতীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ ২/১২, ইবনে আসাকির, তারিখু মাদীনাতি দিমাশক ৫২/৭৯, আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়াহ ৩/১৯, আবূ ইয়া'লা হাম্বালী, তাবাকাতুল হানাবিলাহ ১/১৯৬

এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয়, ইমাম বুখারী রহ. অন্যান্য উলামায়ে সালাফের মত তারাবীহকে তাহাজ্জুদ থেকে ভিন্ন নামায মনে করতেন। সাথে সাথে এটাও প্রমাণ হয়, ইমাম বুখারী রহ. তারাবীহ আট রাক'আত নয়; বেশি পড়তেন। কারণ তারাবীহ আট রাক'আত পড়লে রমাযান মাস ত্রিশ দিনে হলেও প্রতি রাক'আতে বিশ আয়াত করে পড়ে কুরআন খতম করা সম্ভব নয়।

আহলে হাদীস উলামায়ে কেরামের নিকট তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ

আমাদের সালাফী ভাইয়েরা তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ নামাযকে এক বলছেন এবং তা লোকসমাজে প্রচার করে চলছেন। অথচ তাদের দায়িত্বশীল আলেমগণ মনে করেন, তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ ভিন্ন দু শ্রেণীর নামায। এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ গাইরে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরীর একটি আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। মাওলানা আব্দুল্লাহ চকরালভী যখন তারাবীহ তাহাজ্জুদ নামায এক হওয়ার কথা প্রচার করতে আরম্ভ করে তখন মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী লিখেন

... এই সুস্পষ্ট জবাব পেয়েও ওই মৌলভী সাহেব (চকরালভী) তা মানতে রাজি হননি; বরং জবাবের 'জবাব' তৈরির অনেক চেষ্টা করেছেন। তার সকল চেষ্টার সারকথা এই যে, প্রথম রাতের নামায এবং শেষ রাতের নামায বস্তুত একই নামায, দুই নামায নয়। তারাবীহ যা প্রথম রাতে পড়া হয় তার অপর নাম তাহাজ্জুদ। এ কথার জবাবে এটুকু

বলাই যথেষ্ট যে, এ দাবির পক্ষে কোনো দলীল নেই। বরং বিপক্ষে দলীল রয়েছে। কেননা তাহাজ্জুদ শব্দের অর্থই হলো, ঘুম থেকে জেগে নামায আদায় করা। কামূসে রয়েছে, تهجد-استيقظ অর্থ: সে ঘুম থেকে জাগ্রত হলো। 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানে এবং রমাযানের বাইরে এগারো রাক'আতের বেশি পড়তেন না।' এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, প্রথম রাত এবং শেষ রাতের নামায একই নামায; বরং এ হাদীস থেকে শুধু এটুকুই প্রমাণ হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগারো রাক'আত নামায পড়তেন।' –সানাউল্লাহ অমৃতসরী, আহলে হাদীস কা মাযহাব; পৃষ্ঠা ৯২-৯৩

অন্য দিকে রমাযান মাসে ইশার সাথে তারাবীহ নামায পড়ার পর তাহাজ্জুদ পড়া যাবে কি না এ প্রশ্নের উত্তরে ফাতাওয়ায়ে সানাইয়াতে বলা হয়েছে,

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি রমাযান মাসে ইশার সময় তারাবীহ নামায পড়ল সে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে পারবে কি না?

উত্তর: পারবে। কেননা তাহাজ্জুদের সময়ই হচ্ছে সুবহে সাদিকের আগে। প্রথম রাতে তাহাজ্জুদ হয় না।

প্রশ্ন: রমাযান মাসে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুই নামায থাকে, না তারাবীহ নামাযই তাহাজ্জুদের স্থলবর্তী হয়ে যায়?

উত্তর: যদি তারাবীহ প্রথম রাতে আদায় করা হয় তবে তা শুধু তারাবীহ বলে গণ্য হয়। আর শেষ রাতে পড়লে তা তাহাজ্জুদের স্থলবর্তী হয়। –সানাউল্লাহ অমৃতসরী, ফাতাওয়া সানাইয়্যাহ ১/৬৮২-৬৫৪

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তর থেকে যে বিষয়গুলো উপলব্ধ হয়:

১. যে ব্যক্তি প্রথম রাতে তারাবীহ পড়ে সে শেষ রাতে তাহাজ্জুদও পড়তে পারে। যেহেতু আজকাল সকল মানুষ প্রথম রাতেই তারাবীহ পড়ে থাকে তাই তাদের শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়া উচিত।

২. তাহাজ্জুদের সময় হলো রাতের শেষ ভাগে।

৩. প্রথম রাতের ইবাদতকে তাহাজ্জুদের স্থলবর্তী বলা যায় না।

৪. কেউ যদি কখনো শেষ রাতে তারাবীহ পড়ে তবে তা তাহজ্জুদেরও স্থলবর্তী হবে। এ কথার আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা

মাওলানা সানউল্লাহ অমৃতসরী দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'তারাবীহ তাহাজ্জুদের স্থলবর্তী হওয়ার কারণে এই দুইটি এক নামায হওয়া প্রমাণিত হয় না। যেমন জুমআর নামায জোহরের স্থলবর্তী হওয়ায় জুম'আ যোহর এক নামায হওয়া প্রমাণিত হয় না।' –আহলে হাদীস কা মাযহাব; পৃষ্ঠা ৯৩

–মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ অনূদিত ড. শাইখ মুহাম্মাদ ইলয়াস ফয়সাল রচিত নবীজীর নামায; পৃষ্ঠা ৩৭০-৩৭৩

তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেয়া হয়, বিশ রাক'আত তারাবীহ উমর রাযি. কর্তৃক প্রবর্তিত ছিল এবং এটা তার ইজতিহাদপ্রসূত বিষয় ছিল তবুও এটাকে পরিত্যক্ত বিদ'আত বলে ফেলে দেবার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, ইমাম আউযায়ী রহ. বলেন,

> যখন নতুন কোনো বিষয়ের অবতারণা হয় এবং সেটাকে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম প্রত্যাখান না করে তাহলে সেটা সুন্নাত হিসেবে পরিগণিত হয়ে যায়। যেমন উমর রাযি. তারাবীহ নামাযের ক্ষেত্রে লোকজনকে একত্রিত করলেন যাতে উবাই বিন কা'ব রাযি. তাদের নিয়ে জামাআতবদ্ধভাবে নামায আদায় করেন। যখন উমর রাযি. পরদিন দেখলেন, লোকজন জামাআতবদ্ধভাবে তারাবীহ নামায আদায় করছে তখন বললেন, বাহ কত সুন্দর এ ব্যাপারটি! উমর রাযি. কর্তৃক জামাআতবদ্ধ এ রূপকে (আভিধানিক) বিদআত বলায় কোনো আপত্তি নেই। এটা তো মূলত সুন্নাত। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার তিরোধানের পর তোমরা যারা বেঁচে থাকবে তারা নানা ধরনের মতভিন্নতা দেখতে পাবে। সেক্ষেত্রে তোমরা আমার এবং আমার সত্যনিষ্ঠ সুপথপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের সুন্নাহ ও আদর্শকে গ্রহণ করবে। একে তোমরা আকড়ে ধরবে এবং দন্তমাড়ির সাহায্যে কামড়ে ধরার ন্যায় প্রাণপণে আকড়ে ধরবে। এবং তোমরা (ধর্মীয় বিষয়ে) নবাবিস্কৃত বিষয়াদি থেকে খুব সতর্কতার সাথে নিবৃত্ত থাকবে। কারণ প্রতিটি নব আবিস্কৃত বিষয়ই হলো বিদআত। আর প্রতিটি বিদআত হলো পথভ্রষ্টতা। (সুনানে আবুদাউদ ৪৬০৭, সুনানে তিরমিযী ২৬৭৬, মুসনাদে আহমদ ১৬৬৯২, সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২, সহীহ ইবনে হিব্বান ৫) সুতরাং তারাবীহ নামাযে লোকজনকে একত্রিত করা সুন্নাত যা উপরোল্লিখিত হাদীসের ভাষ্যে প্রমাণিত। –হাফেয আবুল ওয়ালীদ আলবাজী, আত তা'দীল ওয়াত তাজরীহ ১/৪৪

তারাবীহ নামায ৮ রাক'আত কেন?

আট রাক'আত তারাবীহর ব্যাপারে অফলাইনে অনলাইনে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চলছে। এবং বলা হচ্ছে, তারাবীহ তাহাজ্জুদ একই নামাযের দুই নাম। আচ্ছা, মেনে নিলাম তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ আট রাক'আত। প্রশ্ন হলো, রাক'আত সংখ্যা আটে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে কেন? সহীহ হাদীসের আলোকে প্রমাণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামায সর্বনিম্ন চার রাক'আত পড়েছেন এবং সর্বোচ্চ আট রাক'আত পড়েছেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্তিগত হাদীসের আলোকে প্রমাণিত, তাহাজ্জুদ নামায দু রাক'আতও পড়া যায়। তাহলে তারাবীহ নামায আট রাক'আত বলে কেন প্রচারণা চালানো হচ্ছে? তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এক হলে তো তারাবীহ নামায দু রাক'আত ও চার রাক'আতও পড়া যায়।

লেখকের বক্তব্য ২

পুস্তিকাটির পঞ্চম অধ্যায়টি হলো, 'বিভিন্ন প্রতারণা ও অপকৌশল' সংক্রান্ত। পঞ্চম অধ্যায়টিকে লেখক সাতটি উপশিরোনামে বিভক্ত করেছেন। সপ্তম উপশিরোনামটি হলো, 'হাদীস বিকৃতির দুঃসাহস'। এ শিরোনামে তিনি চারটি বিকৃতি (?) উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় বিকৃতিটি হলো, সহীহ বুখারী থেকে কিতাবু সালাতিত তারাবীহ (তারাবীহ নামাযের অধ্যায়) কে বিয়োজন করণ। লেখক মহোদয় এ একই বিষয়ে দু'টি জায়গায় আলোচনা করেছেন। (১) 'হাদীস বিকৃতির দুঃসাহস' উপশিরোনামের অধীনে। (২) পুস্তিকার শুরুতে ৮ নাম্বার পৃষ্ঠায়। আমরা যেহেতু পুস্তিকাটির শুরু থেকেই লেখকের আপত্তিকর বক্তব্যগুলোর উপর পর্যালোচনা উপস্থাপন করছি তাই লেখকের ৮ নম্বর পৃষ্ঠার বক্তব্য উল্লেখ করে তার উপর পর্যালোচনামূলক আলোচনা করবো। এবং ঘনিষ্ঠ প্রাসঙ্গিকতায় সপ্তম শিরোনামের প্রথম বিকৃতিটি সম্বন্ধেও আমরা পর্যালোচনা তুলে ধরবো।

মুহতারাম লেখক তাঁর পুস্তিকার আট নম্বর পৃষ্ঠায় লেখেন,

> বিশেষ করে ইমাম বুখারী (রহঃ) (আয়েশা রা. বর্ণিত **১১** রাকাতের) হাদীছটি كتاب صلاة التراويح 'তারাবীহ্‌র ছালাত' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়ে 'রমাযান ও অন্য মাসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর

রাত্রির ছালাত’ অনুচ্ছেদেও হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও আরেকটি অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত শিরোনাম উল্লেখ করলেও ভারত উপমহাদেশের ছাপা ছহীহ বুখারী থেকে তা বাদ দেয়া হয়েছে। কারণ হল, **প্রথমতঃ** মুসলিম সমাজে মিথ্যাচার করা হয় যে, ‘আয়িশা রাযি.-এর উক্ত হাদীছে তাহাজ্জুদের কথা বলা হয়েছে’, ‘তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পৃথক ছালাত’, ‘তারাবীহ ২০ রাক‘আত আর তাহাজ্জুদ ১১ রাক‘আত’ ইত্যাদি। কিন্তু ইমাম বুখারীর শিরোনামের মাধ্যমে উক্ত দাবিগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ছহীহ বুখারীর পাঠদান ও পাঠগ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ শিক্ষক-ছাত্র ও ওলামায়ে কেরামকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ ইমাম বুখারীর বিষয়টি যখন তারা বুঝতে পারবেন তখন তাদের নিকট বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, তারাবীহর ছালাত ৮ রাক‘আত; ২০ রাক‘আত নয়। তাই ন্যাক্কারজনক কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ছল-চাতুরী করে ইসলামী শরী‘আতকে কখনো গোপন আল্লাহ তা‘আলা তার ছাপানোর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। (এ বাক্যটি বাউসা হেদাতী পাড়া, তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০ এ এভাবেই লেখা আছে। জানি না কোন ধরনের প্রমাদ এখানে কাজ করেছে। তবে সুধারণাবশত বলা যেতে পারে যান্ত্রিক প্রমাদেই বাক্যটির এ দুরাবস্থা হয়েছে।) তাই সিরিয়া, মিসর, কুয়েত, লেবানন, সউদী আরবসহ অন্যান্য দেশে ছহীহ বুখারী যত বার ছাপানো হয়েছে সেখানেই উক্ত শিরোনাম বহাল রয়েছে, তা পুরাতন হোক আর নতুন হোক। আফসোস! হক্ব গোপন করার এই কৌশলী ব্যবসা আর কত দিন চলবে।!”

পর্যালোচনা

আমরা শুরুতেই লেখকের বক্তব্যের উপর কোনো মন্তব্যে না গিয়ে হাদীস শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় ‘বর্ণনার যুগ পরবর্তী সময় সম্পর্কিত আলোচনা’ এর সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনা উপস্থাপন করতে চেষ্টা করবো।

সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারী

ইমাম বুখারী রহ. থেকে তাঁর সহীহকে তাঁর যেসব শিষ্য শুনে বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলো,

১. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আলফারাবরী (মৃত্যু ৩২০ হি.)। তিনি সহীহ বুখারী দুই বার শ্রবণ করেছেন।

একবার ফারাবরে ২৪৮ হিজরীতে। দ্বিতীয়বার বুখারায় ২৫২ হিজরীতে।

২. ইবরাহীম বিন মা’কিল আননাসাফী (মৃত্যু ২৯৪ হি.)। তিনি সহীহ বুখারীর কিছু পৃষ্ঠা শ্রবণ করতে পারেননি। সে পৃষ্ঠাগুলো বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী রহ. থেকে অনুমতি নিয়ে।

৩. হাম্মাদ বিন শাকির আননাসাভী (মৃত্যু ২৯০/৩১১ হি.)। তাঁরও সহীহ বুখারীর কিছু অংশ ছুটে গেছে।

৪. আবূ তালহা মানসূর বিন মুহাম্মাদ আলবাযদাভী (মৃত্যু ৩২৩ হি.)। ইমাম বুখারী রহ. থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ ব্যক্তি।

৫. কাযী হুসাইন বিন ইসমাঈল আলমাহামিলী (মৃত্যু ৩৩০ হি.)। তিনি বাগদাদে ইমাম বুখারীর কাছ থেকে সহীহ বুখারীর হাদীস শ্রবণ করেছেন। কিন্তু তখন তার কাছে সহীহ বুখারীর কোনো কপি ছিল না। ইমাম বুখারী রহ. যখন শেষ বার বাগদাদে আসেন তখন তিনি হাদীস লেখানোর একটি মজলিস করেন। তখন মাহামিলী রহ. বুখারী রহ. থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। যারা মাহামিলী রহ. সূত্রে সহীহ বুখারীর হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের ভুল করেছেন।

ইমাম বুখারী রহ. থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্য হতে ফারাবরী রহ. হলেন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তৎকর্তৃক বর্ণিত সহীহ বুখারীর কপিটি সীমাহীন প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইবনে রশীদ রহ. বলেন, ফারাবরী রহ. কর্তৃক বর্ণিত সহীহ বুখারীর কপিটি ক্রমাগত পাঠদান হতে থাকে। ফলে মুসলিম সমাজ এ কপিটিকে লুফে নেয়। এবং এর উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। –ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারীম, রিওয়াইয়াতু ওয়া নুসাখুল জামিয়িস সহীহ লিলবুখারী ১/১২

ফারাবরী রহ. থেকে যারা সহীহ বুখারী বর্ণনা করেছেন তারা হলেন,

১. আবূ আলী সাঈদ বিন উসমান বিন সাঈদ বিন সাকান

২. মুহাম্মাদ বিন আহমদ আলমারওয়াযী

৩. মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আলজুরজানী

৪. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আসসারাখসী
৫. মুহাম্মাদ বিন মাক্কী আলকুশমিহানী
৬. আহমদ বিন আহমদ আলআখসিক্তী
৭. মুহাম্মাদ বিন উমার বিন শাব্বুইয়াহ
৮. ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আলকুশানী
৯. আবূ আহমদ আলহাম্মুভী
১০. ইবরাহীম বিন আহমদ আলমুস্তামলী

আলমুস্তামলী রহ. ৩১৪ হিজরী শতাব্দিতে সহীহ বুখারী শ্রবণ করেন। মুস্তামলী রহ. বলেন,

> আমি ফারাবরী রহ. এর কাছে রক্ষিত মূল কপি থেকে বুখারী রহ. এর সহীহ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করি। তখন দেখি, ফারাবরী রহ. এর কপিটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাতে বেশ কিছু জায়গা শূন্য পড়ে আছে। তন্মধ্য হতে এমন কিছু অধ্যায়বৃত্তান্ত রয়েছে যার পরে কোনো কিছু লেখা নেই। এবং এমন কিছু হাদীস রয়েছে যেগুলোকে কেন্দ্র করে কোনো অধ্যায়বৃত্তান্ত প্রস্তুত করা হয়নি। তখন আমি এসব অসঙ্গতির কিছু কিছু জায়গায় সংযোজন-বিয়োজন করে দিই।

আবুল ওয়ালিদ বাজী রহ. বলেন,

> উপরোক্ত উক্তি শুদ্ধ হওয়ার বড় প্রমাণ হলো, আবূ ইসহাক মুস্তামলী, আবূ মুহাম্মাদ সারাখসী, আবুল হাইসাম কুশমিহানী এবং আবূ যায়দ মারওয়াযী এর কপিগুলোর মাঝে পূর্বাপরসহ বহু ব্যবধান রয়েছে। অথচ সবাই একটিমাত্র মূলকপি থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ব্যবধানের কারণ হলো, প্রত্যেকেই যেকোনো জায়গা থেকে কাগজের টুকরো, চিরকুট ইত্যাদিতে অনুলিপি তৈরি করেছে। এরপর তার ভিতরে সবাই যার যার মত করে সংযোজন করেছে। এর প্রমাণ হলো, তুমি দেখবে কোনো কোনো কপিতে দুই বা ততধিক অধ্যায়বৃত্তান্ত সংযুক্ত হয়ে আছে। এগুলোর মাঝে কোনো হাদীস নেই। আমি কথাগুলো এজন্যই উল্লেখ করলাম যে, আমাদের এলাকার মানুষগুলো অধ্যায়বৃত্তান্ত এবং হাদীসের মধ্যকার সমন্বয়ের মর্মার্থ অনুসন্ধানের ব্যাপারে খুব বেশি গুরুত্বারোপ করে থাকে এবং একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে এমন কৃত্রিমতার পরিচয় দেয় যা বৈধতার পর্যায়ে পড়ে না। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. আবুল ওয়ালীদ আলবাজী রহ. এর উক্তিটি উল্লেখ করার পর বলেন, অধ্যায়বৃত্তান্ত এবং হাদীসের মাঝে সমন্বয় বিধানে জটিলতা সৃষ্টির পেছনে এটি একটি গ্রহণযোগ্য কারণ। তবে এরকম ক্ষেত্র খুবই কম। –ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১/৩-৪, ১৫, আবুল ওয়ালীদ আলবাজী, আততা'দীল ওয়াত তাজরীহ ১/২৭২, ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারীম, রিওয়াইয়াতু ওয়া নুসাখুল জামিয়িস সহীহ লিলবুখারী ১/১২

সহীহ বুখারীর কপিগুলোতে আমরা যে, 'কিতাবু সালাতিত তারাবীহ' দেখতে পাচ্ছি তা একমাত্র মুস্তামলী রহ. এর কপিতেই বিদ্যমান ছিল। ফারাবরী রহ. থেকে বর্ণনাকারী আর কারো কপিতে এই শিরোনামটির উপস্থিতি ছিল না। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

> একমাত্র মুস্তামলীর বর্ণনাতেই এমনটি রয়েছে। এবং অন্যান্যদের বর্ণনা থেকে উক্ত শিরোনাম এবং বাসমালা বাদ পড়েছে। আইনী রহ. বলেন, একমাত্র মুস্তামলীর বর্ণনায় এমনটি রয়েছে। অন্যদের বর্ণনায় এমনটি পাওয়া যায় না। –ফাতহুল বারী ৪/২৯৫, উমদাতুলকারী ২১/২৮৮

উপরে সূত্রপরম্পরায় আলোচিত হয়েছে, ফারাবরী রহ. থেকে প্রাপ্ত কপিতে কিছু অসঙ্গতি ছিল। মুস্তামলী রহ. তাতে কিছুটা সংস্কার করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে কি করে দৃঢ় বিশ্বাস করা যায়, 'কিতাবু সালতিত তারাবীহ' শিরোনামটি ইমাম বুখারী রহ. কর্তৃক প্রদত্ত? ইমাম বুখারী রহ. থেকে অনুলিপিকারীদের মধ্য হতে ফারাবরী রহ. বিশুদ্ধ, ত্রুটিমুক্ত এবং পরিমার্জিত অনুলিপিকারী হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছেন। মুস্তামলী রহ. ব্যতীত অন্য কেউ ফারাবরী রহ. থেকে প্রাপ্ত কপিতে হাত দিয়েছেন বলে কোনো বর্ণনা নেই। এক্ষেত্রে কোনো মুদ্রণকারী ব্যক্তি বা সংস্থা যদি ইবনে সাকান, আলমারওয়াযী, আলজুরজানী, আসসারাখসী, আলকুশমিহানী, আলআখসিক্তী, আলকুশানী প্রমুখ মহান ব্যক্তিদের কপি অনুসরণ করে সহীহ বুখারী ছাপেন তাহলে কি বলা যাবে '*ছহীহ বুখারীর পাঠ দান ও পাঠগ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ শিক্ষক-ছাত্র ও ওলামায়ে কেরামকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ ইমাম বুখারীর বিষয়টি যখন তারা বুঝতে পারবেন তখন তাদের নিকট বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, তারাবীহর ছালাত ৮ রাক'আত; ২০ রাক'আত নয়। তাই ন্যাক্কারজনক কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ছল-চাতুরী করে ইসলামী শরী'আতকে কখনো গোপন (করা যায় না।)*

আল্লাহ তা'আলা তার ছাপানোর ব্যবস্থা করে রেখেছেন।...আফসোস! হক্ব গোপন করার এই কৌশলী ব্যবসা আর কত দিন চলবে।!!'?
ভারতীয় প্রকাশক সংস্থা সহীহ বুখারী ছাপানোর ক্ষেত্রে এই কাজটি করেছেন। তারা মুস্তামলীর কপি অনুসরণ না করে অন্যদের কপি অনুসরণ করেছেন। আর অন্যদের কপিগুলোতে উক্ত শিরোনামটির অস্তিত্ব ছিল না। তো এতে কি করে ভারতীয় প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ ' ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা এবং হক গোপন করার কৌশলী ব্যবসা করা'র অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে গেলেন! এই অভিযোগগুলো প্রথমে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে না করে ফারাবরী রহ. থেকে অনুলিপিকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে করা প্রয়োজন ছিল। কারণ তারাই প্রথম তাদের কপিগুলোতে উক্ত শিরোনামটি বাদ দিয়েছেন (?!)। উপরন্তু সহীহ বুখারীর ভারতীয় কপিতে পার্শ্বটীকায় 'কিতাবু সালাতিত তারাবীহ' শিরোনামটি উল্লেখ করে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, মুস্তামলীর বর্ণনায় এ শিরোনামটি রয়েছে। আর সেখানে শিরোনামটি না থাকলেও শিরোনামপূর্ব বাসমালাহ কিন্তু ঠিকই রয়েছে। বিসমিল্লাহকে বড় করে লিখে অন্যান্য অনুচ্ছেদ থেকে উক্ত শিরোনামাধীন অনুচ্ছেদটিকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে।

ভারতীয় কপির শুরুতে অনুসরণীয় কপি সম্বন্ধে একটি বিশেষ জ্ঞাতব্যও দিয়ে দেয়া হয়েছে। জ্ঞাতব্যটির আরবী ভাষ্য নিম্নরূপ:

> وقد استكمل تصحيح المتن والحواشى مطابقة للنسخة الصحيحة المصطفائية المشهورة المطبوعة فى سنة ١٣٠٥ بعد جهد وسعى بليغ وصرف كثير والامرالملحوظ ان خط مطبوعنا هذا وقلمه وطرزه فائق على جميع المطبوعات السابقة من اول عهدنا الى يومنا هذا. (المكتبة الاشرفية ديوبند يوبى هند)
>
> অর্থ: ১৩০৫ হিজরী শতাব্দিতে মুদ্রিত প্রসিদ্ধ এবং বিশুদ্ধ 'মুসতাফায়ী কপি'র অনুসরণে সীমাহীন কষ্ট সাধনা এবং বহু সম্পাদনা ও পরিমার্জনা করার পর সহীহ বুখারীর মূলপাঠ এবং পার্শ্বটীকা বিশুদ্ধ করণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, আমাদের মুদ্রিত কপির হস্তলিপি, তার লেখনী এবং তার লেখ্যরীতি আমাদের পূর্ব যুগ থেকে নিয়ে অদ্যাবধি মুদ্রিত পূর্বের সমস্ত কপি থেকে শ্রেষ্ঠ। (আলমাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ইউপি, ইন্ডিয়া)

সুতরাং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার পূর্বে উপরোক্ত দাবির অসারতা প্রমাণ করা প্রয়োজন ছিল। তেমনিভাবে উপরোক্ত অভিযোগটি

'মুস্তাফায়ী কপি' কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও করা উচিৎ ছিল। কারণ ভারতীয় কপিটি ওই কপিকে অনুসরণ করেই তৈরি করা হয়েছে।

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর স্বসংকলিত কপির মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করতেন এবং শিক্ষার্থীরা তাঁর মাধ্যমে তাঁর সে কপি থেকে হাদীস শ্রবণ করতো এবং তাঁর জীবদ্দশায় তারা নিজেদের জন্য কপি তৈরি করে নিত। এতে প্রতীয়মান হয়, ইমাম বুখারী রহ. তাঁর কপিতে যা কিছু সংকলন করেছিলেন তাতে তিনি আস্থাশীল ছিলেন। তবে ইমাম বুখারী রহ. বেশ কিছু জায়গা ফাঁকা রেখে দিয়েছিলেন এ আশায় যে, পরবর্তীতে তিনি তাতে সংযোজন করবেন। কিন্তু সে সুযোগ তিনি পাননি। –আব্দুর রাহমান বিন ইয়াহইয়া আলমুআল্লিমী, আলআনওয়ারুল কাশিফাহ ১/২৭৩

আমাদের কাছে যেটা মনে হচ্ছে, তা হলো, ইমাম বুখারী রহ. তার নিজস্ব কপিটিতে কিছু স্পেস রেখে দিয়েছিলেন। তার কারণ হলো, তিনি তার গ্রন্থগুলোকে একাধিকবার লিপিবদ্ধ করতেন। এটা রচনার ক্ষেত্রে তার সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং বিশেষ মনোনিবেশের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ তিনি যা লিখতেন এবং বর্ণনা করতেন তা ক্রমাগত পরিমার্জন এবং সম্পাদনা করতেন। ফলে তাঁর গ্রন্থগুলো চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার ব্যাপারে তিনি আস্থাশীল হতেন। উপরোক্ত নানা ধাপের মধ্য দিয়ে তার কপিগুলো বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে। অথচ তখন তিনি তার গ্রন্থালয় এবং গ্রন্থপুঞ্জি থেকে যোজন দূরে অবস্থান করছিলেন। ফলে সে স্পেসগুলো পূর্ণ করার সুযোগ তাঁর হয়নি। –ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারীম, রিওয়াইয়াতু ওয়া নুসাখুল জামিয়িস সহীহ লিলবুখারী ১/১২
সারাখসী, কুশমিহানী সূত্রে বর্ণিত আবূ যর রহ. এর কপি থেকে عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم অংশটি عن ربه عز وجل এ সূত্র অংশের মধ্য হতে বাদ পড়ে গেছে। কিন্তু মুস্তামলীসহ অন্যদের কপিগুলোতে ঠিকই বহাল রয়েছে। কাযী ইয়াজ রহ. আসিলী রহ. এর উদ্ধৃতিতে বলেন, عن النبي صلى الله عليه وسلم অংশটুকু ফারাবরীর মূলকপিতে ছিল না। বরং আবদূস রহ. তা সংযুক্ত করেছেন। –আবূ ইউসুফ মুহাম্মাদ যায়েদ, আলজাওয়াহিরুল হুরাইরিয়্যাহ মিন কালামি খাইরিল বারিয়্যাহ ২/৪৩৫

সহীহ বুখারীর কিছু কিছু জায়গায় ফারাবরী এর নিজস্ব বক্তব্যও এসেছে। এমনি একটি বক্তব্য প্রসঙ্গে আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন,

> এটা বুখারী রহ. এর বক্তব্য নয়। এটা অনুলিপিকারী সংযুক্ত করেছেন। ফারাবরীর এ সূত্রটি ইমাম বুখারীর সূত্র ভিন্ন অন্য একটি সূত্র। অনেক ক্ষেত্রে ফারাবরী রহ. এমনটি করে থাকেন। কারণ তিনি যখন বুখারীর সূত্র ব্যতীত নিজস্ব

> কোনো সূত্র পান তখন তিনি তা উল্লেখ করে দেন। –ফাইযুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী ১/২২২

আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. আরো বলেন,

> সহীহ বুখারীর ১৯ টি কপি রয়েছে। তন্মধ্য হতে একটা হলো কারীমা বিনতে আহমদ রহ. এর কপি। কারীমা বিনতে আহমদ হলো একজন মুহাদ্দিস রমণী। সহীহ বুখারীর অনুলিপিকারীদের মধ্য হতে তিন জন হানাফী মাসলাকের অনুসারী ছিলেন। ১. ইবরাহীম বিন মা'কিল নাসাফী। তিনি ইমাম বুখারীর সরাসরি ছাত্র ছিলেন। ২. হাম্মাদ বিন শাকির। ৩. শামসুদ্দীন সাগানী। আমার মতে শামসুদ্দীন সাগানী রহ. এর কপিটি বেশি নির্ভরযোগ্য ছিল। কারণ তিনি বলেন, বুখারী রহ. এর কাছে যে কপিটি পাঠ করা হয়েছে সে কপি থেকে আমি প্রতিলিপি প্রস্তুত করেছি।... জেনে রেখো, কপির ভিন্নতার কারণে মর্মার্থও ভিন্ন হয়ে যায়। তার কারণ হলো, শিক্ষার্থীরা যখন গ্রন্থকার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছে তখন তারা মূল হাদীস গ্রহণ করেছে। প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্টগুলোর প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এবং এ বিষয়টিকে তারা ঐচ্ছিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে যে যার মত করে বর্ণনা করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক অবগত। –ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারীম, রিওয়াইয়াতু ওয়া নুসাখুল জামিয়িস সহীহ লিলবুখারী ১/২১

সহীহ বুখারীর বর্ণনা বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে যাওয়া এবং বর্ণনাকারীদের কপির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সংযোজন-বিয়োজন, অগ্র-পশ্চাত এবং বিলুপ্তিসহ নানা রকম ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। সহীহ বুখারীর উৎকৃষ্ট এবং নির্ভুল অনুলিপিকারীরূপে প্রসিদ্ধি লাভকারী হাফেয ইউনিনী রহ. বলেন,

> সহীহ বুখারীতে অধ্যায় বৃত্তান্ত, হাদীস এবং শব্দের মাঝে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। –ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারীম, রিওয়াইয়াতু ওয়া নুসাখুল জামিয়িস সহীহ লিলবুখারী ১/৩৮-৩৯

ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল কারীম রহ. রচিত 'রিওয়াইয়াতু ওয়া নুসাখুল জামিয়িস সহীহ লিলবুখারী' তে অধ্যায় এবং অনুচ্ছেদ শিরোনামের সংযোজন-বিয়োজন এবং অগ্র-পশ্চাত করণসহ বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণনার বিভিন্নতা শিরোনামে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় প্রস্তুত করা হয়েছে। অধ্যায়টির আরবী পাঠ নিম্নরূপ: خامساً: اختلاف الروايات في عناوين الكتب والأبواب إثباتاً وحذفاً وتقديماً وتأخيراً، ونحو ذلك রিওয়াইয়াতু ওয়া নুসাখুল জামিয়িস সহীহ লিলবুখারী ১/৬৭। এতে অনেকগুলো উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। তাতে দেখানো হয়েছে, অনুচ্ছেদ শিরোনামের বিষয়টি কোনো কোনো কপিতে গিয়ে অধ্যায় শিরোনামে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং আপত্তিকর ভাষায় অভিযোগ তোলার পূর্বে লেখকের জন্য সহীহ বুখারীর কপিগত ব্যবধান বিষয়ক আলোচনা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন ছিল।

লেখকের বক্তব্য: ৩

'হাদীস বিকৃতির দুঃসাহস' উপশিরোনামের দ্বিতীয় বিকৃতিটি হলো সুনানে আবূ দাউদের একটি বর্ণনার নুসখা বা কপিগত পরিবর্তন পরিবর্ধন। এ বিকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার শুরুতে লেখক ছোট্ট একটি গৌরচন্দ্রিকা টেনেছেন। গৌরচন্দ্রিকাটি বেশ চমকপ্রদ বলে মনে হয়েছে। তাই লেখকের ভূমিকাটি দিয়েই আমরা আমাদের মূল আলোচনা শুরু করি। লেখক বলেন,

> দলীয় গোঁড়ামী মানুষকে অন্ধ ও বধির করে ফেলে। উপমহাদেশের মাযহাবী আলেমগণের অনেকে উক্ত ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে নিজেরা বিভ্রান্ত হয়েছেন, অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করেছেন। কোনভাবে যখন ছহীহ হাদীছের হুকুম খণ্ডন করা সম্ভব হয়নি তখন হাদীছের শব্দ, বাক্য, শিরোনাম বিকৃতি করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেননি। হাদীছের পরিবর্তন, বৃদ্ধিকরণ, হ্রাসকরণ সর্বক্ষেত্রেই উৎসাহ প্রদান করেছে মাযহাবী সংকীর্ণতা। শুধু তারাবীহ সংক্রান্ত নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হ'ল- (পৃষ্ঠা ৮২)

এরপর লেখক তাঁর মূল আলোচনা শুরু করেছেন এভাবে,

> (এক) হাদীছের প্রধান ছয়টি গ্রন্থে ২০ রাক'আতের কোন হাদীছ নেই। অথচ আবূ দাউদের উদ্ধৃতি পেশ করা হয়ে থাকে। কারণ হ'ল দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার প্রধান শিক্ষক শাইখুল হিন্দ নামে খ্যাত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (১২৩৮-১৩৩৮ হিঃ) সুনানে আবূ দাউদের একটি হাদীছের শব্দ পরিবর্তন করেছেন। যদিও হাদীছটি ইমাম আবূ দাউদসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের নিকট যঈফ। মূল হাদীছটি হ'ল-عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب، فكان يصلى لهم عشرين ليلة

> হাসান থেকে বর্ণিত, ওমর রাযি. উবাই ইবনে কা'বের মাধ্যমে লোকদের একত্রিত করেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে ২০ রাত্রি ছালাত আদায় করান। উক্ত হাদীছের টীকায় মাওলানা মাহমূদুল হাসান নিজের পক্ষ থেকে শব্দ তৈরি করে বলেছেন, অন্য বর্ণনায় عِشْرِينَ رَكْعَةً 'বিশ রাক'আত' রয়েছে। এই বিকৃতি শব্দেই দিল্লী 'মুজতবাই প্রেস' আবূ দাউদ ছাপায়। অতঃপর মাওলানা খায়রুল হাসান আবূ দাউদ শরীফের টীকা লিখতে গিয়ে 'বিশ রাক'আত' মিথ্যা কথাটুকু মূল হাদীছের সাথে যোগ করেন এবং হাদীছের শব্দ عشرين ليلة 'বিশ রাত' টীকায় যোগ করেন। যা দিল্লী মজীদী প্রেস থেকে ছাপানো হয়। উক্ত সংস্করণটি ১৯৮৫ সালে দেওবন্দের 'আসাহহুল মাতাবে' প্রেস কর্তৃক ছাপা হয়, যা আজও পর্যন্ত সমগ্র ভারত উপমহাদেশে পড়ানো হচ্ছে। অথচ তার পূর্বে ১২৬৪ হিজরীতে দিল্লী মুহাম্মাদী প্রেস, ১২৭২ হিজরীতে দিল্লী কাদেরী প্রেস সহ মধ্যপ্রাচ্য তথা মিশর, সিরিয়া, লেবানন, কুয়েত, সউদী আরব প্রভৃতি রাষ্ট্রে প্রকাশিত আবূ দাউদের কোন একটিতেও ঐ মিথ্যা শব্দ নেই। (পৃষ্ঠা ৮৩)

পর্যালোচনা

মুহতারাম লেখক মহোদয় উপরোক্ত বিকৃতি সংক্রান্ত তথ্য আহরণ করেছেন 'ইবনে আহমাদ সালাফী, আহলে হাদীসের প্রকৃত পরিচয় (কলিকাতা: সালাফী প্রকাশনী, ১নং মারকুইস লেন, ২য় সংস্করণ ঃ ১৯৯৭), পৃঃ ৬৬-৬৭।' থেকে। এবার আমরা লেখকের সহযোগিতার্থে তাঁর তথ্যসূত্রটিকে আরেকটু শক্তিময় করে তুলতে চাচ্ছি।

ড. মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান আ'যমী সাহেব মদীনা ভার্সিটির একাডেমিক ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যায় একটি নিবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি এ তথ্য বিকৃতির (?) বিষয়টি তুলে ধরেন। খুব সম্ভব লেখক ও ইবনে আহমাদ সালাফী সাহেবের মূলসূত্র এ ম্যাগাজিন। সারকথা, ড. যিয়াউর রহমান আ'যমী, লেখক এবং তাদের সহমত পোষণকারীদের মূল বক্তব্য হলো, শাইখুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী রহ. নিজের পক্ষ থেকে শব্দ তৈরি করে عشرين ليلة (বিশ রাত) কে عِشْرِينَ رَكْعَةً (বিশ রাক'আত) বানিয়েছেন। তার এ জাল কার্যক্রম টীকা-টিপ্পনীর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে

মাওলানা খায়রুল হাসান সাহেব এসে টীকার মিথ্যা কথাটুকু হাদীসের মূল পাঠের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন। এ হলো তাদের সারবক্তব্য।

এদিকে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের ৭ তারিখ সকাল ৬টা ৩৮ মিনিটে উমর আলী ইবনে ইউসুফ সাহেব 'মুলতাকা আহলিল হাদীস' নামের একটি জনপ্রিয় আরব সাইটে একটি নিবন্ধ পোস্ট করেন। নিবন্ধটির শিরোনাম ছিল, 'তালাবুর রদ্দি ওয়াত তাওযীহ মিন মান ইয়াকুলু বিকওলিশ শাইখিল আলবানী ফী কিয়ামিল্লাইলি ওয়া সালাতিত তারাবীহ' (কিয়ামুল লাইল এবং তারাবীহ নামাযের ব্যাপারে শাইখ আলবানী রহ. কে যারা সমর্থন করেন তাদের থেকে জবাব এবং সুস্পষ্ট বক্তব্য কামনা)। নিবন্ধটিতে তিনি বেশ চমৎকার আলোচনা করেন। সেখানে তিনি ড. যিয়াউর রহমান আ'যমী সাহেবের উপরোক্ত আপত্তির জবাব দিতে গিয়ে বলেন,

> ...ইমাম যাহাবী রহ. (মৃত্যু ৭৪৮হি.) তাঁর সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থে উবাই ইবনে কা'ব রাযি. এর জীবনীতে عشرين ليلة (বিশ রাত) এর পরিবর্তে عِشْرِينَ رَكْعَةً (বিশ রাক'আত) শব্দটি উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি বলেন, সুনানে আবূ দাউদে আছে, ইউনুস ইবনে উবাইদ হাসান রহ. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. রমাযানের নিশিকালীন নামাযে লোকদেরকে উবাই ইবনে কা'ব রাযি. এর পেছনে একত্রিত করে দিলেন। ফলে তিনি তাদেরকে নিয়ে বিশ রাক'আত নামায পড়তেন।' এবং ইমাম হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু ৭৭৪হি.) জামিউল মাসানীদের ১ নম্বর খণ্ডের ৮৬ নম্বর পৃষ্ঠায় বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন: উমর রাযি. উবাই রাযি. এর পেছনে লোকদেরকে একত্রিত করেছেন। ফলে তিনি তাদেরকে নিয়ে বিশ রাক'আত নামায পড়েছেন।

সিয়ারু আ'লামিন নুবালাতে ইমাম যাহাবী রহ. এর আরবী বক্তব্য নিম্নরূপ:

(وَفِي "سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ" يُوْنُسُ بنُ عُبَيْدٍ، عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع النَّاسَ عَلَى أُبِي بنِ كَعْبٍ فِي قِيَامِ رمضان فكان يصلي بهم عشرين ركعة.)

আমরা শাইখ শুআইব আলআরনাউত রহ. এর তাহকীক কৃত সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থটি খুলে দেখেছি। সেখানে ১/৪০০ পৃষ্ঠায় অবিকল উপরোক্ত বক্তব্যই উল্লিখিত হয়েছে। অণু পরিমাণও ব্যবধান নেই। উপরন্তু শাইখ শুআইব আল আরনাউত রহ.ও সুনানে আবূ দাউদের عشرين ركعة শব্দযুক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করে সনদ বিষয়ক সামান্য আলোচনাও করেছেন।

হাফেয ইমাম ইবনে কাসীর রহ. তাঁর জামিউল মাসানীদ গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। একটু কষ্ট হলেও মূল গ্রন্থটি অনুসন্ধান করে খুলে দেখার সুযোগ হয়েছে। হাদীস উপস্থাপনায় হাফেয ইবনে কাসীর রহ. এর বক্তব্য নিম্নরূপঃ

> হাসান ইবনে আবুল হাসান বসরী এর সূত্রে উবাই ইবনে কা'ব রাযি. এর বিবরণঃ হুশাইম আমাকে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে ইউনুস বর্ণনা করেছেন, সে হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন, উমর রাযি. লোকদেরকে উবাই ইবনে কা'ব রাযি. এর ইমামতে লোকদের জড়ো করলেন। ফলে তিনি তাদের নিয়ে বিশ রাক'আত নামায পড়তেন। এবং ইমাম আবূ দাউদ শুজা' ইবনে মাখলাদ থেকে, সে হুশাইম থেকে, সে ইউনুস ইবনে উবাইদ থেকে, সে হাসান থেকে, সে উবাই থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

জামিউল মাসানীদ, ইমাম ইবনে কাসীর, মাসানীদু উবাই ইবনে কা'ব অধ্যায়, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৫৫; হাদীস ২৬, লেবাননস্থ দারুল ফিকর প্রকাশনী, ড. আব্দুল মু'তী আমীন কালআজী কর্তৃক টীকাকৃত।

মুহাম্মাদ আলী সাবুনী তাঁর 'আলহাদয়ুন নববী আসসহীহ লিসালাতিত তারাবীহ' নামক পুস্তিকার ৫৭ নম্বর পৃষ্ঠায় সুনানে আবূ দাউদের এ বিশ রাক'আত সংক্রান্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের কিছু সালাফী ভাই তাঁর উপর চড়াও হয়েছেন। কারণ, কেন তিনি এ মিথ্যা এবং বিকৃত বর্ণনা উল্লেখ করলেন? এবং তারা বলেছেন মুহাম্মাদ আলী সাবুনী সাহেবই প্রথম হিন্দুস্তানী আলেমদের জালকৃত এবং বিকৃত বর্ণনাটি ব্যবহার করলেন। ফল কি দাঁড়ালো? আমরা আপাতত কোন বর্ণনাটি শুদ্ধ আর কোনটি অশুদ্ধ, কোনটি প্রণিধানযোগ্য আর কোনটি প্রণিধানযোগ্য নয় এ জটিল সমীকরণে যেতে চাচ্ছি না। এখানে সুস্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, হাদীস বিকৃতি ও জাল করার দায়ে হিন্দুস্তানের মাওলানা মাহমূদুল হাসান রহ. এবং মাওলানা ফখরুল হাসান রহ.ই প্রথম অভিযুক্ত নন। বরং অভিযোগ সত্য হলে হাদীস ও ইতিহাস শাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু ৭৭৪হি.) এবং ইমাম যাহাবী রহ. (মৃত্যু ৭৪৮হি.)-ই হলেন প্রথম শ্রেণীর অভিযুক্ত ব্যক্তি। এমন কি সমকালীন হাদীস শাস্ত্রের প্রাণপুরুষ শাইখ শুআইব আল আরনাউত রহ.ও এ অভিযোগ থেকে মুক্ত নন । সুতরাং অভিযোগ সত্য হলে হিন্দুস্তানী উলামায়ে কেরাম মূলত বিকৃতি ও জাল করার মহৎ (?) কাজটি আঞ্জাম দেননি। বরং তারা এক্ষেত্রে ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইবনে কাসীর রহ. এর মত জগতখ্যাত ব্যক্তিত্বদের অনুসরণ করেছেন মাত্র। এতে যদি কোনো দায় সৃষ্টি হয়ে যায়

তাহলে প্রথম দায়বদ্ধ হবেন ইবনে কাসীর এবং যাহাবী রহ. এর মত মহীরূহগণ।

লেখকের বক্তব্য ও দ্বিতীয় দলীলঃ ৪

লেখক মহোদয় তাঁর পুস্তিকার দশ নাম্বার পৃষ্ঠায় আট রাক'আত তারাবীহর পক্ষে দ্বিতীয় দলীলটি উল্লেখ করেছেন। দলীলটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ-

أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي قال حدثنا عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله ﷺ في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج فيصلي بنا فأقمنا فيه حتى أصبحنا فقلنا يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بنا قال إني كرهت - أو خشيت - أن يكتب عليكم الوتر

অর্থঃ ঈসা বিন জারিয়া রাযি. জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযি. এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন, রমাযানের এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে আট রাক'আত এবং বিতর পড়লেন। পরদিন আমরা মসজিদে একত্রিত হলাম। আশা করছিলাম, তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হবেন এবং আমাদের নিয়ে নামায পড়বেন। এভাবে সকাল হয়ে গেলে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আশা করছিলাম, আপনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হবেন এবং আমাদের নিয়ে নামায পড়বেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আশঙ্কা করেছিলাম, তোমাদের উপর বিতর ফরয করে দেয়া হবে। –সহীহ ইবনে খুযাইমা ২/১৩৮; হাদীস ১০৭০

পর্যালোচনা

ক. হাদীসটির সূত্রানুগ আলোচনাঃ

হাদীসটির সূত্রে ঈসা বিন জারিয়া নামের একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় ইমাম তাকে মাতরুক এবং মুনকারুল হাদীস বলে অভিহিত করেছেন। মাতরূক অর্থ পরিত্যাজ্য; যার বর্ণনা দলীল বা সমর্থক দলীল কোনো ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়। মুনকারুল হাদীস হলো, এমন একজন বর্ণনাকারী যিনি ভুল বা আপত্তিকর কথাকে ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেন।

ইমাম ইবনে আদী রহ. উপরোক্ত হাদীসটিকে গায়রে মাহফুজ (অরক্ষিত) সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে আদী রহ. এর পরিভাষায় গায়রে মাহফুজ শব্দটি মুনকার বা বাতিল বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ইমাম আবূ দাউদ রহ. বলেন, তাঁর বর্ণনায় বহু মুনকার হাদীস রয়েছে। মুনকার যয়ীফ হাদীসেরই একটি প্রকার। তবে তা এতটাই দুর্বল যে, এর দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা বিধিত

নয়। বিস্তারিত জানতে দেখা যেতে পারে, তাহযীবুল কামাল ১৪/৫৩৩, আলকামিল, ইবনে আদী ৬/৪৩৬, আয-যুআফাউল কাবীর, উকাইলী ৩/৩৮৩; ইতহাফুল মাহারাহ বি আতরাফিল আশারাহ, ইবনে হাজার আসকালানী ৩/৩০৯।

হাদীসটিকে শাইখ আলবানী রহ. হাসান লিগাইরিহী বলে অভিহিত করেছেন। অথচ তিনি অসংখ্য সহীহ হাদীসকেও মওযু বা যয়ীফ বলেছেন! হাবীবুর রহমান আ'জমী রহ.ও সহীহ ইবনে খুযাইমা এর টীকায় ঈসা ইবনে জারিয়া এর ব্যাপারে মৃদু আপত্তি করে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হলো, হাদীসটি যঈফ।

উপরন্তু এটি রমাযানের এক রাতের ঘটনা। আর সে সময় জামাআতবদ্ধ তারাবীহ এর প্রচলন ছিল না। সে হিসেবে বর্ণনাটি সহীহ ধরে নেয়া হলেও একথা বলার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, অবশিষ্ট রাক'আতগুলো একাকি পড়ে নেয়া হয়েছে। আর এটা নিছক কোনো অনুমান বা সম্ভাবনা নয়; সহীহ মুসলিমে এ ধরনের একটি ঘটনা রয়েছে। ঘটনাটিতে বলা হয়েছে, আনাস রাযি. বলেন,

> রমাযানের এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন। আমি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে দাঁড়িয়ে যাই। এরপর আরেকজন আসে। সে এসে আমার পাশে দাঁড়ায়। এরপর আরেকজন আসে। এভাবে একটি জামাআতে পরিণত হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অনুধাবন করতে পারলেন, আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছি তখন নামাযকে সংক্ষেপ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর নিজ গৃহে গিয়ে আরো কিছু নামায পড়লেন যা আমাদের কাছে পড়েননি। ভোর হলে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলাম, গত রাতে কি আমাদের উপস্থিতি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। এবং তোমাদের এ ব্যাপারটিই আমাকে আমার কৃত কার্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। –সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৬২৫

হাদীসটিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 'এরপর নিজ গৃহে গিয়ে আরো কিছু নামায পড়লেন যা আমাদের কাছে পড়েননি।'

সার কথা, বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও অস্পষ্ট বক্তব্য সম্বলিত একটি মুনকার ও দুর্বল বর্ণনাকে উপরোক্ত অকাট্য দলীলসমৃদ্ধ এবং সর্বসম্মত একটি বক্তব্যের বিপক্ষে দাঁড় করানো আদৌ যথার্থ নয়। উপরন্তু যদি হাদীসটি সহীহ হতো এবং এর দ্বারা আট রাক'আত তারাবীহ প্রমাণিত হতো তাহলে হযরত জাবের রাযি. ই তো সর্বপ্রথম বিশ রাক'আতের বিপক্ষে এই হাদীসটি উপস্থাপন করতেন।

খ. লেখকের সনদ বিষয়ক আলোচনার বিশ্লেষণ

মুহতারাম লেখক ঈসা ইবনে জারিয়া রহ. এর উপরোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন,

> হাদীছটি কয়েকটি সূত্রে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮হি.) তাঁর 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করার পর বলেন, 'হাদীছটির সনদ উত্তম স্তরের' অর্থাৎ হাসান। শাইখ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'হাদীছটির সনদ হাসান'।

ইমাম যাহাবী রহ. এর আরবী ভাষ্য হলো, اسناده وسط । লেখক মহোদয় এর অর্থ করেছেন 'হাদীছটির সনদ উত্তম স্তরের'। অর্থটি যথার্থ হয়নি। কারণ এর শাব্দিক অর্থ করলে অর্থ হবে হাদীসটির সনদ মধ্যম পর্যায়ের। সব মধ্যমই উত্তম হয় না। তাছাড়া ওয়াসাত শব্দটি হাদীসবেত্তাদের পরিভাষায় কি অর্থে ব্যবহৃত হয় সেদিকটিও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন ছিল। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা, বর্ণনাকারীর অবস্থাভেদে হাদীসের বিধান আরোপিত হয়। এবার ওয়াসাত স্তরের বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে হাদীসবেত্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা জেনে নেয়া যাক:

> ১. বারযায়ী রহ. বলেন, আমি আবূ যুরআ রাযী রহ. কে ইসমাঈল বিন মুজালিদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, সে কেমন? তখন তিনি বললেন, সে একেবারে মিথ্যাবাদীদের পর্যায়ভুক্ত নয়; ওয়াসাত পর্যায়ের। –উবাইদুল্লাহ বিন আব্দুল কারীম, আযযুআফা ওয়া আজউইবাতু আবি যুরআ রাযী আলা সুওয়ালাতি বারযায়ী ১/৪০
>
> ২. ইয়াকুব বিন শাইবা রহ. কোনো কোনো হাদীসের ক্ষেত্রে বলেন, এর সনদ মধ্যম পর্যায়ের; প্রমাণিত নয় এবং বাজেয়াপ্তও নয়; সহায়ক পর্যায়ের। –ইমাম সাখাবী রহ., আলগায়াহ ফী শারহিল হিদায়াহ ফী ইলমির রিওয়াইয়াহ ১/৮৩

৩. সাঈদ ইবনে জামহান সম্পর্কে ইমাম যাহাবী রহ. সাদুকুন ওয়াসাতুন বলে মন্তব্য করে চূড়ান্ত মন্তব্যে বলেন, আবূ হাতিম রহ. বলেন, এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে না। –আলকাশিফ ফী মা'রিফাতি মান লাহু রিওয়াইয়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তাহ ১/১৩২

৪. ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহ. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে বলেন, এ হলো ওয়াসাত স্তরের বর্ণনাকারী। আর ওয়াসাত শব্দটি তা'দীল এর পঞ্চম স্তরের একটি শব্দ। আর এ স্তরের বর্ণনাকারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা যায় না। বরং এদের হাদীস দ্বারা শুধু প্রমাণ সহায়তা গ্রহণ করা যায়। –বুহুসুন ফিল আহাদীসিয যায়ীফা ২/৫

আলী ইবনুল মাদীনী এবং পরবর্তী হাদীসবেত্তাদের মধ্য হতে ইমাম যাহাবী রহ. এর বক্তব্যে 'ওয়াসাত' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তো এটা কি তা'দীল পর্যায়ের শব্দ? শাব্দিক অর্থ থেকে প্রতীয়মান হয়, ওয়াসাত বিশেষণে বিশেষিত বর্ণনাকারী তা'দীল এবং তাজরীহ এর মধ্যবর্তী স্তরের ব্যক্তি। যে ব্যক্তি এ স্তরের হবে তাকে তা'দীল স্তরে উন্নীত করা সমীচীন হবে না। যেমনিভাবে একে জরহের স্তরেও নামিয়ে দেয়া যাবে না। তো এ ধরনের হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা প্রাধান্য দানকারী অন্যান্য হাদীসের উপর নির্ভরশীল। আর তা হলো মুতাবিআত এবং শওয়াহেদ হাদীস। এ ভিত্তিতেই বলা হয়, ওয়াসাত পর্যায়ের বর্ণনাকারী সালিহুল হাদীস স্তরভুক্ত যাদের হাদীস দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা যায় না। তবে প্রমাণ সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এ ধরনের কয়েকটি ব্যবহার নিম্নে প্রদত্ত হলো,

ক. ইয়াযীদ বিন কাইসান ইয়াশকুরী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আলকাত্তান বলেন, সে নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনাকারী নয়। সে সালিহ ওয়াসাত স্তরের বর্ণনাকারী।

খ. মুহাম্মাদ বিন যাবারকান সম্পর্কে আবূ যুরআ রাযী রহ. বলেন, সে সালিহ এবং ওয়াসাত স্তরের বর্ণনাকারী। আমি বলি, এ ধরনের বাক্য প্রমাণ করে যে, এ স্তরের বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রমাণ উপস্থাপনের উপযোগী নয়। –আব্দুল্লাহ আলজুদাই, তাহরীরু উলূমিল হাদীস ৩/৭৮

গ. ইয়া'কুব বিন শাইবা রহ. বলেন, ওয়াসাত স্তরের ইসনাদ; প্রমাণিতও নয় এবং পরিত্যজ্যও নয়। অর্থাৎ সালিহ

পর্যায়ের। কখনো এটা দ্বারা সহায়তা গ্রহণ করা হয়। –ইমাম সাখাবী, ফাতহুল মুগীস ১/৭৫

ঘ. যে বর্ণনাকারী সম্পর্কে 'শাইখুন ওয়াসাতুন' শব্দ ব্যবহার করা হয় তদবর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণসহায়তার যাবতীয় শর্ত পালন সাপেক্ষে প্রমাণ সহায়তা গ্রহণ করা যাবে। এককভাবে এর দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা যাবে না। –লিসানুল মুহাদ্দিসীন ২/২৯১

ঙ. ইয়াযীদ বিন কাইসান ইয়াশকুরী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আলকাত্তান বলেন, সে নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনাকারী নয়; সে সালিহ ওয়াসাত স্তরের বর্ণনাকারী। –ইমাম যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৭/৩৫৯

এতো গেল, ওয়াসাত শব্দটি সম্বন্ধে মুহাদ্দিসীনে কেরামের কিছু মন্তব্য। এতে পরিষ্কার হলো, এ শব্দটিকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকেন। দু একজন ইমাম শব্দটিকে হাসান উপযোগী শব্দ হিসেবে বিবেচনা করলেও অধিকাংশের মত কিন্তু বিপরীত মেরুর। এমনকি ওয়াসাত শব্দ সম্বন্ধে আমাদের আলোচ্য ইমাম -যার মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এ আলোচনার সূত্রপাত- ইমাম যাহাবী রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গিও কিন্তু মধ্যম স্তরের নয়। যা তার বক্তব্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

এবার আমরা আলোচিত বর্ণনাকারী ঈসা ইবনে জারিয়া সম্বন্ধে রিজাল শাস্ত্রবিদদের কিছু মন্তব্য তুলে ধরবো:

১. ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, ঈসা ইবনে জারিয়া একজন বিতর্কিত বর্ণনাকারী। ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন রহ. বলেন, এর থেকে বহু অস্বীকৃত এবং প্রত্যাখ্যাত বর্ণনা বর্ণিত রয়েছে। –আলকাশিফ ফী মা'রিফাতি মান লাহু রিওয়াইয়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তাহ ২/৫০

২. ইমাম ইবনে আদী রহ. তার থেকে কিছু হাদীস (এর মধ্যে আমাদের আলোচিত হাদীসটি অন্যতম) বর্ণনা করার পর বলেন, সবগুলোই গাইরে মাহফুজ। (আর ইবনে আদী রহ. এর ভাষায় গায়রে মাহফুয শব্দটি মুনকার বা বাতিল বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়)। –আলকামিল ফিযযুআফাইর রিজাল ৬/২৭৪

৩. ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন রহ. কে ঈসা ইবনে জারিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তার থেকে একমাত্র ইয়া'কুব আলকুম্মী ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমার জনা নেই। وحديثه ليس بذاك তার হাদীস তেমন সুবিধাজনক নয়। –তারীখে ইবনে মায়ীন ২/১২১

৪. ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন রহ. আরো বলেন, এর থেকে বহু অস্বীকৃত এবং প্রত্যাখ্যাত বর্ণনা বর্ণিত রয়েছে। –তারীখে ইবনে মায়ীন ২/১২২

৫. ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন রহ. বলেন, এর থেকে বহু অস্বীকৃত এবং প্রত্যাখ্যাত বর্ণনা বর্ণিত রয়েছে। ইমাম নাসায়ী রহ. বলেন, সে মুনকারুল হাদীস এবং তার থেকে মাতরুক (পরিত্যাজ্য) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। –ইমাম যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৫/২৬৪

৬. আবূ দাউদ রহ. বলেন, ঈসা ইবনে জারিয়া মুনকারুল হাদীস। উকাইলী রহ. তার আযযুআফা গ্রন্থে ইসা ইবনে জারিয়াকে উল্লেখ করেছেন। –ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব ৭/১৪৮

৭. ইবনুল জাওযী রহ. ইসা ইবনে জারিয়াকে যয়ীফ বর্ণনাকারীদের শ্রেণীভুক্ত করেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. আততাকরীব গ্রন্থে উল্লেখ করার পর বলেন, এর মাঝে লীন তথা শিথিলতা রয়েছে। –ইউসুফ আলমিযযী, তাহযীবুল কামাল টিকা সম্বলিত ২২/৫৯০

৮. ইমাম নাসায়ী রহ. বলেন, ইসা ইবনে জারিয়া মুনকার। –ইমাম নাসায়ী, আযযুআফা ওয়াল মাতরুকীন ১/২১৬

একমাত্র আবূ যুরআ রাযী এবং ইবনে হিব্বান রহ. ব্যতীত আর কেউ ঈসা ইবনে জারিয়া সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য করেননি। সবাই তার সম্পর্কে নেতিবাচক এবং বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

সহীহ ইবনে হিব্বানের মুহাক্কিক শুআইব আলআরনাউত রহ.ও হাদীসটির ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন, إسناده ضعيف। অর্থাৎ হাদীস সূত্রটি যয়ীফ। –সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ২৪০৯ (শামিলা সংস্করণ)

লেখকের বক্তব্য ও তৃতীয় দলীল: ৫

লেখক মহোদয় তাঁর পুস্তিকার **১১** নম্বর পৃষ্ঠায় আট রাক'আত তারাবীহ এর পক্ষে **৩** নম্বর হাদীসটি উল্লেখ করেন। হাদীসটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

حدثنا عبد الاعلى حدثنا يعقوب عن عيسى بن جارية حدثنا جابر بن عبدالله قال جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إنه كان مني الليلة شئ يعني في رمضان قال وماذاك يا أبي قال نسوة في داري قلن إنا لانقرأ القرآن فنصلي بصلاتك قال فصليت بهن ثمان ركعات وأوترت فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئا

অর্থ: জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, একদা উবাই বিন কা'ব রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রমাযানের রাত্রে আমার পক্ষ থেকে একটি ঘটনা ঘটে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটা কি হে উবাই? উবাই ইবনে কা'ব রাযি. বললেন, আমার বাড়িতে কিছু মহিলা এসেছিলো। তারা বললো আমরা কুরআন পাঠ করতে পারি না। তাই আমরা আপনার সাথে নামায আদায় করতে পারবো কি? ফলে আমি তাদের নিয়ে আট রাক'আত নামায আদায় করি এবং বিতর পড়ি। এটা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌন সম্মতিমূলক সুন্নাত। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বললেন না।

হাদীসটি মু'জামে তাবারানী আউসাত, মুসনাদে আবূ ইয়ালা, মুসনাদে আহমদসহ বেশ কয়েকটি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তবে মুসনাদে আহমদ এর মুহাক্কিক হামযা আহমদ যাইন হাদীসের সূত্রটিকে যয়ীফ বলে মন্তব্য করেছেন। আহমদ শাকের ও হামযা আহমদ যাইন টীকা কৃত মুসনাদে আহমদ ১৫/৪০৭; হাদীস ২০৯৯৭। তেমনিভাবে মুসনাদে আবূ ইয়ালা এর মুহাক্কিকও হাদীসটির সূত্রকে যয়ীফ বলে মন্তব্য করেছেন। –মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৩/৩৩৬; হাদীস ১৮০১ (শামিলা সংস্করণ)

পর্যালোচনা

ক. হাদীসের মধ্যকার শব্দ বিশ্লেষণ:

سنة الرضا (সুন্নাতুর রিযা-মৌন সম্মতিমূলক সুন্নাত) বনাম شبه الرضا (শিবহুর রিযা- মৌন সম্মতিসদৃশ সুন্নাত)

হাদীসটিতে গ্রন্থের ভিন্নতায় ও গ্রন্থের কপির ভিন্নতায় সংশ্লিষ্ট শব্দটির মাঝে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। হাদীসটির মধ্যকার (سنة الرضا) 'সুন্নাতুর রিযা' শব্দটি শামিলা সংস্করণের মাজমাউয যাওয়ায়িদের তিনটি নুসখার (কপি) মধ্য হতে একটিমাত্র নুসখায় এবং শামিলার তুহফাতুল আহওয়াযী ও মুহাম্মাদ ইবনে আলী নীমাভী রহ. এর আসারুস সুনানে এসেছে। কিন্তু মু'জামে তাবারানী আউসাত, মুসনাদে আবূ ইয়'লা, মুসনাদে আহমদ, মুহাম্মাদ ইবনে নাসর মারওয়াযী রহ. এর কিয়ামুললাইল, শামিলা সংস্করণের মাজমাউয যাওয়য়িদ এর দু'টি নুসখাসহ সবগুলো হাদীস গ্রন্থে شبه الرضا (শিবহুর রিযা) শব্দ এসেছে। এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কাউকে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে চাই না।

খ. নাম বিশ্লেষণ:

লেখক মহোদয় তার বইটির ১১ নাম্বার পৃষ্ঠার ১২ নাম্বার টীকায় লিখেছেন, 'মুহাম্মাদ ইবনে নাছর আলমারূযী'। শব্দটি বস্তুত আলমারূযী নয়; আলমারূযী লেখা প্রচণ্ড রকমের ভুল। শব্দটি হলো আলমারওয়াযী। –ইমাম সামআনী, আলআনসাব ৫/২৬৫

গ. সনদ বিশ্লেষণ:

লেখক তাঁর পুস্তিকার ১১ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেন, ইমাম হায়ছামী (রহঃ) বলেন, 'হাদীছটির সনদ হাসান'। কিন্তু লেখক মহোদয়দের গুরু ব্যক্তিত্ব শাইখ আলবানী রহ. কিন্তু হাইসামী রহ. এর সব তাহকীকের উপর সন্তুষ্ট নন।

ঘ. অনুবাদগত অর্থ বিশ্লেষণ:

লেখক মহোদয় এগার নাম্বার পৃষ্ঠার ১৪ নাম্বার টীকায় শাইখ আলবানী রহ. এর وسنده يحتمل للتحسين عندى এ আরবী উক্তিটি উল্লেখ করেছেন। আর মূল গ্রন্থে এর অর্থ করেছেন, 'আমার নিকট হাদীছটির সনদ হাসান হওয়ারই প্রমাণ বহন করে'। লেখক মহোদয় আরবী মন্তব্যটুকুর এ কি অর্থ করলেন? এখানে প্রমাণ বহন করার অর্থই বা কোথা থেকে এলো? এত গুরুত্বই বা কোত্থেকে এলো? বাক্যটির সরল অর্থ হবে, 'আমার মতে হাদীসটির সনদ হাসান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' এমন আবশ্যিক এবং নিশ্চিত অর্থ তো আমরা বাক্যটি থেকে পাই না।

উপরন্তু এগুলো তো রিজাল শাস্ত্রের জরাহ তা'দীলের বাক্য। রিজাল শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় এ জাতীয় বাক্য ব্যবহৃত হয়। এবার আমরা এ সংক্রান্ত রিজাল শাস্ত্রের কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করব:

> ১. তেমনিভাবে যেসব হাদীস হুসন এবং যু'ফ এর সম্ভাবনা রাখে তাও যয়ীফ হাদীসের শ্রেণীভুক্ত। এজন্য আমরা কতক হাদীসবেত্তাকে দেখি, তারা অনেক ক্ষেত্রে কোনো হাদীসকে হাসান এবং যয়ীফ এর মধ্য হতে কোনো একটি বিশেষণে বিশেষিত করতে গিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। তখন তাদের পরিভাষায় আমরা ব্যবহার হতে দেখি, حديث حسن إن شاء الله (আল্লাহ চাহে তো হাদীসটি হাসান হবে), حديث محتمل للتحسين (হাদীসটি হাসান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে), إسناده مقارب (হাদীসটির সনদ হাসান হওয়ার কাছাকাছি) এ জাতীয় দ্বিধাজনক বাক্যগুলো। এসব বাক্য মূলত হাদীসের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হুকুম না হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এর কারণ হলো বর্ণনাকারীর কতক গুণাবলী বা অন্য কোনো বিষয়ে রিজাল শাস্ত্রবিদদের সংশয় থেকে যায়। –ড. আব্দুল গনী বিন আহমদ, উসূলুত তাসহীহ ওয়াত তাযয়ীফ ১/৪
>
> ২. 'শাইখ' এবং 'সালিহুল হাদীস' শ্রেণীর রাবীদের হাদীসগুলো حديث محتمل للتحسين (হাদীসটি হাসান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে) এর শ্রেণীভুক্ত। ইবনে আবূ হাতেম রাযী রহ. যদিও শাইখ শব্দটিকে সালিহুল হাদীস থেকে শ্রেয় বলে অভিহিত করেছেন; কিন্তু তার পরবর্তী ব্যাখ্যা অনুসারে প্রমাণিত হয়, এ ধরনের বিশেষণে বিশেষিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা যায় না। –আব্দুল্লাহ বিন জুদাই', তাহরীরু উলূমিল হাদীস ৩/১৭৩
>
> ৩. পূর্বতন কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ কোনো কোনো সনদের ক্ষেত্রে বলেন, هذا إسناد محتمل للتحسين । এর অর্থ এই নয় যে, এ সনদের হাদীসটি প্রমাণিত। বরং এ জাতীয় বাক্য জারাহ ভিত্তিক বাক্য ليس بالقوي ,هذا إسناد لين ,ليس بذلك এর পর্যায়ভুক্ত। আর এ শব্দগুলো যয়ীফ হাদীসের বৈশিষ্ট্যগত শব্দ। –প্রাগুক্ত

সুতরাং লেখক মহোদয়ের অনুবাদে হাদীস শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে চরম আপত্তি রয়েছে।

ঙ. ঈসা ইবনে জারিয়ার ব্যাপারে শাইখ আলবানী রহ. এর অবস্থান:

বস্তুত ঈসা ইবনে জারিয়া সম্বন্ধে শাইখ আলবানী রহ. এর দ্বিমুখী অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে আমরা ঈসা ইবনে জারিয়া সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যগুলো তুলে ধরতে চেষ্টা করবো:

> ১। এক জায়গায় তিনি ঈসা ইবনে জারিয়া থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের সূত্রকে সম্ভবনাময় হাসান সূত্র (إسناد محتمل للتحسين) বলে অভিহিত করেন। এরপর বলেন, ঈসা ইবনে জারিয়া হলো একজন বিতর্কিত রাবী। দু এক লাইন পরে গিয়ে ঈসা ইবনে জারিয়া বর্ণিত হাদীসটিকে সহীহ বলে ঘোষণা দেন। –আসসিলসিলাতুস সহীহা হাদীস ১৭৬০, (শামেলা)
>
> ২। অন্য এক জায়গায় তিনি ঈসা ইবনে জারিয়া থেকে বর্ণিত হাদীসের সূত্রকে ‘পূর্ববর্ণিত হাদীসের কারণে হাসান’ (حسن بما قبله) বলে অভিহিত করেছেন। যখন তাঁর ব্যাপারে অভিযোগ করা হলো, তিনি ঈসা ইবনে জারিয়া এর বর্ণিত বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করেন তখন তিনি বেশ উষ্মা প্রকাশ করেন। এবং তিনি এ অভিযোগকে মিথ্যা অভিযোগ হিসেবে অভিহিত করলেন। দেখুন, তামামুল মিন্নাহ ফিত্তা'লীকি আলা ফিকহিস সুন্নাহ ১/২৬৮।
>
> ৩। অন্যত্র তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন, আমি নিরঙ্কুশভাবে ঈসা ইবনে জারিয়ার বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করিনি; বরং এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছি, তার বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা যায় না। –রিসালাতু কিয়ামি রমাযান লিলআলবানী ১/৩

শাইখ আলবানী রহ. এর উপরোক্ত মন্তব্যগুলো দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, তাঁর বক্তব্যে কিছুটা ধোঁয়াশা পরিলক্ষিত হলেও তিনি ঈসা ইবনে জারিয়াকে প্রমাণযোগ্য মনে করেন না।

চ. ইমাম যাহাবী রহ. এর মন্তব্যের বাস্তবতা:

লেখক মহোদয় তাঁর পুস্তিকার ১১ নম্বর পৃষ্ঠায় হাদীসটির সমর্থনে মুবারকপুরী রহ. এর মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। মুবারকপুরী রহ. তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াযীতে যে আলোচনা করেছেন তার সারবক্তব্য হলো,

> আট রাক'আত সম্পর্কিত প্রথম হাদীসটি সম্বন্ধে ইমাম যাহাবী রহ. তার মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন এবং ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদীসটি ফাতহুল বারীতে এনেছেন। আর ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীর ভূমিকায় স্পষ্ট করে বলেছেন, তিনি এ ব্যাখ্যা গ্রন্থে হাসান হাদীস থেকে নিম্ন পর্যায়ের কোনো হাদীস আনবেন না। –তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪২

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মুবারকপুরী রহ. এর এ মন্তব্য হলো, লেখক মহোদয় উপস্থাপিত দ্বিতীয় হাদীস সম্বন্ধে। কিন্তু লেখক মহোদয় দ্বিতীয় হাদীসের মন্তব্যকে তার তৃতীয় হাদীসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে দিয়েছেন।

মুবারকপুরী রহ. এর মন্তব্য বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হলো, হাদীসটি সম্বন্ধে ইমাম যাহাবী রহ. এর মন্তব্য বিষয়ে কিছুটা সুদীর্ঘ আলোচনা আমরা পূর্বোক্ত হাদীসের আলোচনায় (লেখকের বক্তব্য ও দ্বিতীয় দলীল ৪) করেছি। সেখানে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি, ইমাম যাহাবী রহ. যে বাক্যে হাদীসটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন হাদীস শাস্ত্রে তার অবস্থান এবং ব্যাখ্যা কী। পাঠককে আলোচনাটি আরেকবার দেখে নিতে অনুরোধ করবো। দ্বিতীয়ত ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীতে যেসব হাদীস এনেছেন তার সব হাদীসই কি আপনারা বিনা বাক্যে গ্রহণ করেন? উত্তর ইতিবাচক নয়। এমন অসংখ্য হাদীস রয়েছে যেগুলোকে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীতে এনেছেন কিন্তু আপনারা সেগুলোকে যইফ বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এখানে ফাতহুল বারীর প্রসঙ্গ টানা নিতান্তই আইওয়াশ। উপরন্তু ফাতহুল বারীতে যাকারিয়া আ. এর বৃক্ষ মাঝে আত্মগোপন করা এবং পরবর্তীতে করাত যোগে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু বরণ করা সংক্রান্ত অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাটিও এসেছে। সুতরাং ফাতহুল বারীকে সব বর্ণনার ক্ষেত্রে নিরাপদ জ্ঞান করা যায় না। তবে সামগ্রিক বিবেচনায় এর বর্ণনাগুলোর উপর আস্থা স্থাপন করার অবকাশ রয়েছে।

ছ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র জীবন জুড়েই আট রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন!

লেখক মহোদয় ১২ নাম্বার পৃষ্ঠায় আলবানী রহ. এর একটি উক্তি উল্লেখ করে আলোচনার একটা পরিসমাপ্তি টানতে চেয়েছেন। লেখক বলেন,

> যখন আমরা বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করি তখন আমাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে এই সংখ্যার উপরই অব্যাহত ধারায় আমল করেছেন। এর অতিরিক্ত কিছু করেননি- তা রমাযান মাসে হোক বা তার বাইরে হোক।

আমরা বলি, 'রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে এই সংখ্যার উপরই অব্যাহত ধারায় আমল করেছেন। এর অতিরিক্ত কিছু করেননি- তা রমাযান মাসে হোক বা তার বাইরে হোক'। এটি একটি প্রমাণহীন বক্তব্য। এর সপক্ষে সুপ্রমাণিত কোনো তথ্যসূত্র নেই। বরং আমরা বলবো, এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক আমল ছিল না। কারণ খোদ আম্মাজান আয়িশা রাযি. এর সূত্রেই তাহাজ্জুদের নামায ফজরের সুন্নাত ব্যতিরেকে বিতরসহ তেরো রাক'আত হওয়া প্রমাণিত আছে। দেখুন, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৩৬২, ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার আসকালানী ৩/২৫; কিতাবুত তাহাজ্জুদ, অধ্যায় ১০।

অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা এটাও প্রমাণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাত্রের নামায ইশার দুই রাক'আত সুন্নাত ও বিতর ছাড়া কখনো কখনো সর্বমোট চৌদ্দ রাক'আত বা ষোল রাক'আত হতো; বরং কোনো বর্ণনামতে আঠারো রাক'আতও প্রমাণিত হয়। –নাইলুল আওতার, শাওকানী ৩/২১; হাদীস ৮৯৭; আত-তারাবীহু আকসারা মিন আলফি আম ফিল মাসজিদিন নাবাবী, আতিয়্যা মুহাম্মাদ সালেম, সৌদি আরব ২১

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب ولكن أوتروا بخمس أوبسبع أوبتسع أوبإحدى عشرة ركعة أوأكثر من ذلك
>
> অর্থ: তোমরা মাগরিবের নামাযের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিন রাক'আত বিতর পড়ো না। তবে তোমরা তাহাজ্জুদ ও বিতর পাঁচ রাক'আত পড়ো, সাত রাক'আত পড়ো, নয় রাক'আত পড়ো, এগারো রাক'আত পড়ো কিংবা তার চেয়ে বেশি পড়ো। –মুস্তাদরাকে হাকেম হাদীস ১১৩৭,

ইমাম যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. প্রমুখ বলেন, হাদীসটি সহীহ। –নাইলুল আউতার, শাউকানী ৩/৪৩, আত-তালখীসুল হাবীর, ইবনে হাজার আসকালানী ২/১৪

সর্বশেষ এ হাদীস সম্বন্ধে আমাদের মূল বক্তব্য হলো, এ হাদীসটির বর্ণনাসূত্রে সেই ঈসা ইবনে জারিয়া রয়েছেন। যার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা পূর্বোক্ত হাদীসের ক্ষেত্রে করে এসেছি। সুতরাং এ হাদীসকে নিরেট প্রমাণযোগ্য মনে করার কোনো সুযোগ নেই। তাছাড়া আলবানী রহ. এর মন্তব্য ভাষা কিন্তু এ হাদীসের ক্ষেত্রে অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে। অথচ পূর্বোক্ত হাদীসের ক্ষেত্রে তার বক্তব্য ছিল সংশয়হীন স্পষ্ট। কিন্তু বর্ণনাকারী সেই ঈসা ইবনে জারিয়াই আছেন।

লেখকের বক্তব্য ও চতুর্থ-সপ্তম দলীল: ৬

সম্মানিত গ্রন্থকার তাঁর ছোট্ট গ্রন্থিকার ১৪ থেকে ১৮ নাম্বার পৃষ্ঠায় সায়িব বিন ইয়াযিদ রাযি. সূত্রে আট রাক'আত তারাবীহ এর সপক্ষে ৪টি (৪-৭) হাদীস এনেছেন। হাদীসগুলোর আরবী ভাষ্য তাঁর দেয়া উদ্ধৃতিসহ নিম্নরূপ:

৪।

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

অর্থ: সায়িব বিন ইয়াযীদ রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রাযি. উবাই ইবনে কা'ব ও তামীম দারী রাযি. কে লোকদের নিয়ে ১১ রাক'আত নামায আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন। –মুআত্তা মালিক; হা.নং ৩৭৯

৫।

حدثنا أبو مُحَّد عبد الله بن يونس قال ثنا بقي بن مخلد رحمه الله قال ثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن مُحَّد بن يوسف أن السائب أخبره أن عمر جمع الناس على أبي وتميم فكانا يصليان إحدى عشرة ركعة يقرآن بالمئين يعني في رمضان. المصنف لإبن أبي شيبه– ٢٥٤/٣

৬।

وقال الإمام سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد الله بن مُحَّد حدثني مُحَّد بن يوسف سمعت السائب بن يزيد يقول كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بإحدى عشرة ركعة. عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق ابادي– ٣١٨/٢٥

৭।

روى عن أبي مجلز عند مُحَّد بن نصر وأخرج من طريق مُحَّد بن إسحاق حدثني مُحَّد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال كنا نصلي زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة. فتح الباري لابن حجر– ٢٥٤/٤

পর্যালোচনা

হাদীসগুলো সম্পর্কে আপাতত আমাদের কোনো রকমের অনাগ্রহ নেই। থাকার প্রশ্নও আসে না। যদিও ইবনে আব্দুল বার রহ. ১১ রাক'আতের বর্ণনাগুলোকে বর্ণনাকারীর বর্ণনাগত বিচ্যুতি বলে অভিহিত করেছেন। এখন সমস্যা যেটা সেটা হলো স্বয়ং এ সায়িব বিন ইয়াযীদ রাযি. এবং আরো

কয়েকজন তাবিয়ী সূত্রে বিশ রাক‘আত তারাবীহ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি সহীহ বর্ণনাও রয়েছে। যেগুলো আমরা প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছি।

মুহতারাম লেখক এবং তাদের এ ধারার উলামায়ে কেরাম হয়তো এ দুই ধরনের হাদীসের মাঝে সমন্বয়ের পথ গ্রহণ না করে প্রাধান্যের পথ বেছে নিবেন। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা, প্রাধান্যের পথে এগুলে একটি বর্ণনার মাঝে যারপরনাই কসরত করে খুঁত বের করার আপ্রাণ সাধনা করতে হবে। আর তাঁরা স্বতঃসিদ্ধ সেই পথটিই বেছে নিয়েছেন। সায়িব বিন ইয়াযীদ রাযি. এর এগার রাক‘আত সংক্রান্ত হাদীসটিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তাঁরা বিশ রাক‘আত সংক্রান্ত হাদীসগুলোতে নানা ধরনের খুঁত ধরতে চেষ্টা করেছেন। কি কি খুঁত ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে তার ধরণ সম্বন্ধে সামনে আলোচনা আসছে।

মুহতারাম লেখক মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত হাদীসের উদ্ধৃতিতে কয়েকটি অসঙ্গতি রয়েছে,

> ১। লেখক মহোদয় ছয় নম্বর হাদীসের আরবী পাঠের শেষাংশ লিখেছেন إحدى عشرة ركعة । অথচ এখানে হবে بإحدى عشرة ركعة। দৃশ্যত ভুলটি ছোট মনে হলেও ব্যাকরণগত দিক থেকে এটা অনেক বড় একটা ভুল। এতটুকু ভুলের কারণে বাক্যটিতে চরম পর্যায়ের অর্থবিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে। বাক্যটিকে স্ব অবস্থানে রেখে একে শুদ্ধ করার কোনো কৌশলই কার্যকর হবে না। তবে ভুলটি অনিচ্ছাকৃত হতে পারে বলেও আমরা বিশ্বাস করি।
>
> ২। মুহতারাম লেখক ছয় এবং সাত নম্বর হাদীসের উদ্ধৃতি গ্রন্থের নাম যথাক্রমে লিখেছেন আউনুল মা'বুদ এবং ফাতহুল বারী। মূল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন; কিন্তু সেখান থেকে হাদীস আনেননি। হাদীস এনেছেন উপরোক্ত সহায়ক গ্রন্থদ্বয় থেকে। এটা কিন্তু হাদীসের শাস্ত্রীয় বিবেচনায় নীতিসিদ্ধ নয়। হাদীসের উদ্ধৃতি দিতে হবে হাদীসের মূল গ্রন্থ থেকে; যেখানে হাদীসটি সূত্রপরম্পরাসহ উল্লিখিত হয়েছে। সকাল সন্ধ্যা যাদের মুখে হাদীস এবং হাদীসের শুদ্ধতার বাণী শোভা পায় তাদের থেকে হাদীস বিষয়ক এমন আচরণ আমরা আশা করতে পারি না।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। মুহতারাম লেখক যে চারটি হাদীস উল্লেখ করেছেন তাতে উপস্থাপনাগত বৈচিত্র থাকলেও মূল বক্তব্য এবং ভাববাচ্য এক

ও অভিন্ন। এবং চারটি হাদীসই মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সূত্রে সায়িব বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। সুতরাং সংখ্যার বিচারে হাদীস চারটি হলেও মূল বক্তব্য বিবেচনায় হাদীস মূলত একটিই। আপাতত হাদীসগুলোর ব্যাপারে আমাদের কোনো বিরূপ মন্তব্য নেই।

আমাদের প্রশ্ন হলো, সায়িব ইবনে ইয়াযীদ থেকে কি একমাত্র ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা'ই বিশ রাক‘আতের কথা বর্ণনা করেছেন? উত্তর হলো, না, ব্যাপারটি এরকম নয়। আরো অনেক তাবিয়ী রয়েছেন, যারা সায়িব বিন ইয়াযীদ রাযি. থেকে বিশ রাক‘আতের বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে আমরা সামনে আলোচনা করবো। দ্বিতীয় কথা হলো এখানে সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে যয়ীফ হাদীস দাঁড়িয়ে যায় নি যে, আপনার জন্য একে মুনকার বলার সুযোগ থাকবে। বরং সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে সহীহ হাদীস দাঁড়িয়েছে বলা যায়। এখন আপনি কোন পথ গ্রহণ করবেন। বিশ রাক‘আতের বর্ণনা গ্রহণ করা হলে দু'টি হাদীসের উপরই আমল হয়ে যাচ্ছে। আর আট রাক‘আতের বর্ণনা গ্রহণ করা হলে একটির উপর আমল হচ্ছে, আরেকটি পরিত্যাগ হচ্ছে। হাদীসের নিষ্ঠাবান ধারক বাহকরা যদি সহীহ হাদীস পরিত্যাগ করেন তবে নামের স্বার্থকতা অক্ষুণ্ন থাকে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

২০ রাক'আত তারাবীহ বিষয়ক দলীল-প্রমাণ

মুহতারাম মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবের আপত্তি ও পর্যালোচনা

লেখকের আপত্তি ১

মুহতারাম লেখক তার পুস্তিকার ২৩ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখেন,

> ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে যতগুলো বর্ণনা পাওয়া যায় তন্মধ্যে মাত্র একটি বর্ণনা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে বানানো হয়েছে, যা রিজাল-শাস্ত্রবিদগণের ঐকমত্যে যঈফ ও জাল। আর ছাহাবীগণের মধ্যে একজন ছাহাবীর নামে কথিত কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সেগুলোও পরস্পর বিরোধী। কোনটা যঈফ, কোনটা জাল। আর বাকী যা বর্ণিত হয়েছে তার সবই কয়েকজন তাবেঈ থেকে, সেগুলোও কোনটা মুনকার, কোনটা যঈফ আবার কোনটা জাল। যথাযথ প্রমাণসহ উক্ত বর্ণনাগুলোর অবস্থা নিম্নে তুলে ধরা হ'ল:

এরপর লেখক বিশ রাক'আত সম্পর্কিত একটি মারফু হাদীস এবং আঠারটি আসারে সাহাবা ও তাবিয়ী উল্লেখ করেছেন।

পর্যালোচনা

উপরোক্ত হাদীসগুলোর মধ্য হতে আপত্তিকর মারফু হাদীসটি নিয়ে এ পর্যায়ে আমরা কোনো আলোচনায় যাবো না। সনদের বিচারে ত্রুটিযুক্ত নিছক এ ধরণের হাদীস দ্বারা এককভাবে বিশ রাক'আত তারাবীহ প্রমাণের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। তাই আমরা এ হাদীসটির ক্ষেত্রে উপস্থাপনাগত বিষয়ে সহমত পোষণ না করলেও প্রমাণযোগ্য না হওয়ার ক্ষেত্রে সহমত পোষণ করছি। সত্য কথা এবং সত্য বিষয়ে সহমত পোষণ করতে আমাদের আপত্তি এবং প্রান্তিকতা কোনোটিই নেই।

লেখকের আপত্তি ২

মুহতারাম লেখক তাঁর পুস্তিকার ২৮ নম্বর পৃষ্ঠায় ২০ রাক'আত বিষয়ক দ্বিতীয় হাদীসটি উল্লেখ করে তার উপর আপত্তি করেছেন। হাদীসটি উল্লেখ করার পূর্বে তিনি একটি শিরোনাম করেছেন এবং ভূমিকাস্বরূপ কিছু কথা বলেছেন। লেখকের শিরোনাম ও ভূমিকা নিম্নরূপ:

> <u>একজন ছাহাবীর নামে উদ্ধৃত ২০ রাক'আতের বিভ্রান্তিকর বর্ণনা:</u>
>
> ২০ রাক'আতের পক্ষে মাত্র একজন ছাহাবী থেকে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যা পরস্পর বিরোধী হওয়ায় 'মুযত্বারাব', ছহীহ হাদীছের মুখালেফ হওয়ায় 'মুনকার'। এ সমস্ত অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার কারণে কোনটা যঈফ, কোনটা জাল।

লেখক উদ্ধৃত হাদীসটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

> وقد أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن مُحَّد بن الحسين بن فنجويه الدينوري بالدامغان ثنا أحمد بن مُحَّد بن إسحاق السني أنبأ عبد الله بن مُحَّد بن عبد العزيز البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ بن أبي ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة قال وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يتوكؤن على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شده القيام
>
> অর্থ: সায়িব বিন ইয়াযীদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রাযি. এর যুগে লোকসকল রমাযান মাসে বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন। তিনি আরো বলেন, তখন তারা শত আয়াত বিশিষ্ট কিরাত পাঠ করতেন। এবং উসমান রাযি. এর সময়ে দাঁড়ানোটা কষ্টসাধ্য হয়ে যাওয়ার কারণে তারা লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। –সুনানে কুবরা বাইহাকী; হাদীস ৪৩৯৩

লেখক মহোদয়ের ভাষায় হাদীসটির বিশ্লেষণ:

> 'তাহক্বীক্ব: বর্ণনাটি জাল। এটি তিনটি দোষে দুষ্ট।
>
> <u>প্রথমতঃ এর সনদে আবূ আব্দুল্লাহ ইবনে ফানজুবী আদ-দায়নূরী নামক রাবী আছে। সে মুহাদ্দিছগণের নিকট অপরিচিত। রিজাল শাস্ত্রে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। এজন্য শাইখ মুবারকপুরী (রহ.) বলেন,</u>
>
> لم أقف على ترجمته فمن يُدَّعِيْ صحة هذا الأثر فعليه اَنْ يَثْبُتَ كونَه ثقة قابلا للاحتجاج
>
> আমি তার জীবনী সম্পর্কে অবগত হ'তে পারিনি। সুতরাং যে ব্যক্তি এই আছারের বিশুদ্ধতা দাবী করবে তার উপরে অপরিহার্য হবে নির্ভরযোগ্য হিসাবে দলীলের উপযুক্ততা

প্রমাণ করা'। যার কোন পরিচয়ই নেই তার বর্ণনা কিভাবে গ্রহণীয় হতে পারে? মুহাদ্দিসগণের নিকটে এরূপ বর্ণনা জাল বলে পরিচিত। –পৃষ্ঠা ২৮

পর্যালোচনা

লেখক মহোদয়ের অসঙ্গতি

মূল আলোচনার পূর্বে মুহতারাম লেখকের উপরোক্ত বক্তব্যের কয়েকটি অসঙ্গতির দিকে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। অসঙ্গতিগুলো ছোট খাট অসঙ্গতি নয়। দীনী অনুপ্রেরণা থেকেই আমরা এ অসঙ্গতিগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছি। তাছাড়া মুহতারাম লেখক তার পুস্তিকার কিছু কিছু জায়গায় বেশ আপত্তিকর ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন। এবং যেসব বিষয়কে উপজীব্য করে তিনি এমন আচরণ কর্মে ব্রতী হয়েছেন আমাদের দৃষ্টিতে তা নিতান্তই একরৈখিক অধ্যয়নের কর্মফল; শাস্ত্রীয় বিবেচনায় যা আদৌ যথার্থ নয়। তাঁর ভাষারীতি দেখে মনে হয় না, তিনি শাস্ত্রীয় এবং আরবী বৈকারণিক এমন ভুলের শিকার হতে পারেন। আল্লাহ আমাদের সব ধরণের প্রান্তিকতা থেকে মুক্তি দান করুন।

অসঙ্গতি ১: লেখক আল্লামা মুবারকপুরী রহ. এর আরবী পাঠে হরকত তথা স্বরচিহ্ন ব্যবহার করেছেন। তন্মধ্য হতে দু'টি শব্দের স্বরচিহ্ন নিতান্তই প্রমাদপূর্ণ এবং ভ্রান্তিকর। প্রমাদপূর্ণ স্বরচিহ্নে আরবী পাঠটুকুর যে অর্থ হয় সে অর্থ কিন্তু লেখক তার বাংলা অনুবাদে করেননি। আমরা আরবী পাঠ সংশ্লিষ্ট শব্দ দু'টিকে প্রমাদপূর্ণ সে স্বরচিহ্নের মাধ্যমে আলাদা করে দিয়েছি। এখানে কি ধরণের প্রমাদ সৃষ্টি হয়েছে তা উদঘাটনের ভার আমরা সচেতন পাঠকের উপর ছেড়ে দিলাম। পাঠক যদি আরবী ভাষা বিষয়ে অভিজ্ঞ হন তবে খুব সহজেই এর বৈকারণিক বিচ্যুতি আপনার সামনে ফুটে উঠবে। আর যদি অভিজ্ঞ না হন তবে বিনীত অনুরোধ করবো, কোনো আরবী ভাষা বোদ্ধা থেকে এর ভ্রান্তি জেনে নিবেন। একটু অনুসন্ধিৎসু করে তুলতেই পাঠককে এ কষ্টটুকু দিলাম।

অসঙ্গতি ২: মুহতারাম লেখক সংশ্লিষ্ট হাদীসের বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছেন আবূ আব্দুল্লাহ ইবনে ফানজুবী আদ-দায়নূরী। শব্দটা বস্তুত ফানজুবী নয়; ফানজুইয়াহ। ফানজুইয়াহ একটি নাম। এটা সম্বন্ধগত কোনো পরিচিতি নয় যে একে ফানজুবী বলার অবকাশ থাকবে। ইবনে ফানজুইয়াহ ইতিহাস এবং রিজাল শাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ একটি নাম। এ নামের এমন ভুল ব্যবহার লেখক মহোদয় থেকে আশা করতে পারি না। এ বিচ্যুতি প্রমাণের জন্য আনুমানিক শতখানি গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করা যাবে। দু একটি উদ্ধৃতি গ্রন্থ উল্লেখ করছি।

–সুনানে বাইহাকী কুবরা ২/৪৯৩, ইমাম যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৪৮/২৭৯, তাজুল আরুস ১/১৪৮৫

অসঙ্গতি ৩: লেখক মহোদয় সংশ্লিষ্ট বর্ণনাকারীর সম্বন্ধযুক্ত নামটি উল্লেখ করেছেন আদ-দায়নূরী। লেখক এখানে শব্দটির একটি চরম ভুল ব্যবহার করেছেন। বস্তুত শব্দটি আদ-দায়নূরী নয়; আদ-দাইনাওয়ারী। দাইনাওয়ার বর্তমান ইরানের হামাদান এবং কিরমানশাহ (কিরমিসীন) শহরের সন্নিকটস্থ একটি পাহাড় অধ্যুষিত শহর। এ শহরের সাথে সংযুক্ত হয়েই বর্ণনাকারীর সম্বন্ধযুক্ত নাম হয়েছে আদ-দাইনাওয়ারী। দেখুন, আসসাম'আনী, আলআনসাব ২/৫৩১, মু'জামুল বুলদান ৯/৩৭৮।

লেখক মহোদয়ের খুঁত আবিষ্কার: ১

এবার মূল আলোচনায় ফিরে আসা যাক। মূল আলোচনাটি ছিল সায়িব বিন ইয়াযীদ কর্তৃক বর্ণিত বিশ রাক'আত সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাপারে লেখকের আপত্তি। লেখকের আপত্তির ভাষারীতিটা আরেকবার লক্ষ্য করুন। '*প্রথমত: এর সনদে আবূ আব্দুল্লাহ ইবনে ফানজুবী আদ-দায়নূরী নামক রাবী আছে। সে মুহাদ্দিছগণের নিকট অপরিচিত। রিজাল শাস্ত্রে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। যার কোন পরিচয়ই নেই তার বর্ণনা কিভাবে গ্রহণীয় হতে পারে? মুহাদ্দিসগণের নিকটে এরূপ বর্ণনা জাল বলে পরিচিত।*' –পৃষ্ঠা ২৮

লেখক বলতে চাচ্ছেন, আবূ আব্দুল্লাহ ইবনে ফানজুইয়াহ মুহাদ্দিসগণের নিকট একজন অপরিচিত ব্যক্তি। লেখক মূলত উলূমুল হাদীসের পারিভাষিক শব্দ 'মাজহুল' এর আভিধানিক অর্থ করেছেন অপরিচিত বলে। এখন আমরা দেখতে চেষ্টা করবো, মাজহুল কাকে বলে? পারিভাষিক এ শব্দটি ইবনে ফানজুইয়াহ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় কি না?

বাস্তবতা

মাজহুল বিষয়ক বিশ্লেষণ

মাজহুল তিন প্রকার:

(১) মাজহুলুল আইন।

(২) মাজহুলুল হাল।

(৩) আলমাসতুর

১। মাজহুলুল আইন: মাজহুলুল আইন বলা হয়, এমন বর্ণনাকারীকে শিক্ষা দীক্ষায় যার কোনো প্রসিদ্ধি নেই এবং হাদীসবেত্তারাও তার শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে কোনো পরিচয় তুলে ধরেননি এবং একজন মাত্র বর্ণনাকারী থেকেই তার হাদীস জ্ঞাত হয়েছে। মাজহুলুল আইন পর্যায়ের বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত

হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যদি মাজহুলুল আইন পর্যায়ের বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা রিজাল শাস্ত্রবিদ কর্তৃক সত্যায়িত হয় তবে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের দু'টি পন্থা রয়েছে:

(১) তার থেকে বর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণনাকারী তার নির্ভরযোগ্যতার সত্যায়ন করবে।

(২) তার থেকে বর্ণনাকারী ব্যক্তিই তার নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সত্যায়ন করবে। তবে শর্ত হলো এ সত্যায়নকারী 'জারহ তা'দীল' শাস্ত্রের ইমাম পর্যায়ের কেউ হবেন।

২। মাজহুলুল হাল: মাজহুলুল হাল এমন বর্ণনাকারীকে বলা হয় যার বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ ন্যায়পরায়ণতা গোচরীভূত নয়। এবং তার থেকে একাধিক বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেছে; কিন্তু তাকে নির্ভরযোগ্য বলে কেউ ঘোষণা দেয়নি। মাজহুলুল হাল পর্যায়ের বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ মতানুসারে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩। আলমাসতুর: আলমাসতুর এমন বর্ণনাকারীকে বলা হয় যার বাহ্যিক ন্যায়পরায়নতা পরিজ্ঞাত, কিন্তু অভ্যন্তরীণ ন্যায়পরায়নতা গোচরীভূত নয়। এবং তার থেকে একাধিক বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেছে; কিন্তু তাকে নির্ভরযোগ্য বলে কেউ ঘোষণা দেয়নি। আলমাসতুর পর্যায়ের বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ মতানুসারে গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. অবশ্য মাজহুলকে দু ভাগে বিভক্ত করেছেন। –তাউযীহুল আফকার মা'আ তানকীহিল আনযার ২/১৯২, ফাতহুল মুগীস (মাজহুল বিষয়ক আলোচনা), নূরুদ্দীন ইত্‌র, মানহাজুন নাকদ ফী উলূমিল হাদীস ১/৮৯, মাহমুদ তাহ্হান, তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস ১/৬৫

মাজহুল বিষয়ক প্রাসঙ্গিক অনেক আলোচনা রয়েছে 'মুস্তালাহুল হাদীস' সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে। তবে এখানে মাজহুল বিষয়ক মূল কথাগুলো তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে।

এখন আমরা মাজহুল বিষয়ক এ আলোচনার আলোকে বর্ণনাকারী ইবনে ফানজুইয়াহকে জাস্টিফাই করবো যে, মূলত এ বর্ণনাকারী মাজহুলের পর্যায়ভুক্ত হয় কি না?

এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা ইবনে ফানজুইয়াহ সম্পর্কে উলামায়ে মুহাদ্দিসীনের কিছু বক্তব্য তুলে ধরবো।

রাবী বিষয়ে আলোচনা

১। মুহাম্মাদ আবুল মা'আলী ইবনুল গাযী রহ. বলেন,

ইবনে ফানজুইয়াহ এর প্রকৃত নাম হলো, আবূ আব্দুল্লাহ আলহুসাইন বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আদ-দাইনাওয়ারী। তিনি হাফিয, হুজ্জাহ এবং হাদীস শাস্ত্রের একজন ইমাম ছিলেন। তার হাদীস বিষয়ক বহু গ্রন্থ রয়েছে। ৪১৪ হিজরী সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। –দিওয়ানুল ইসলাম ১/৮৭

২। বিখ্যাত আরবী অভিধানবিদ আল্লামা যাবিদী রহ. বলেন,

আবূ আব্দুল্লাহ আলহুসাইন বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আদ-দাইনাওয়ারী একজন হাফিয পর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর আলোচনা আলমাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ গ্রন্থের শুরুতে উল্লিখিত হয়েছে। আব্দুল গাফির আলফারিসী তারীখে নাইসাবুর গ্রন্থে তাঁর আলোচনা এনেছেন। এবং তাঁর প্রশংসা করেছেন। ৪১৪ হিজরী সনে তাঁর ইন্তেকাল হয়। –তাজুল আরূস ১/১৪৮৫

৩। হাফেয আবূ বকর ইবনুন নুকতাহ আলহাম্বালী রহ. বলেন,

ইসমাঈল বিন আব্দুর রাহমান ইবনে সাঈদ নাইসাবুরী রহ. আবূ আব্দুর রাহমান নাসায়ী রহ. এর আসসুনান আবূ আব্দুল্লাহ আলহুসাইন বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে ফানজুইয়াহ থেকে শ্রবণ করেছেন। –আততাকয়ীদ লিমা'রিফাতি রুওয়াতিস সুনানি ওয়াল আসানীদ ১/১৬২

৫। হাফেয আবূ বকর ইবনুন নুকতাহ আলহাম্বালী রহ. আরো বলেন,

শিরওয়াইহ তারিখে হামাদানে উল্লেখ করেছেন, আবূ আব্দুল্লাহ আলহুসাইন বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে ফানজুইয়াহ থেকে তাঁর দুই ছেলে আবুল কাসিম সুফইয়ান এবং আবূ বকর মুহাম্মাদ, আবুল ফাতহ ইবনে আব্দুস, আবুল কাসিম মাক্কি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে দাকীন আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি 'সিকাহ' এবং 'সাদুক' পর্যায়ের রাবী ছিলেন। অনেক 'মুনকার' রিওয়ায়াত তিনি বর্ণনা করতেন। তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রচুর রচনাসম্ভার রেখে গেছেন। তাঁর থেকে প্রখ্যাত মুফাসসির আহমদ বিন মুহাম্মাদ সা'লাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নাইসাবুরে ৪১৪ হিজরী সনে ইন্তেকাল

করেন। –আততাকয়ীদ লিমা'রিফাতি রুওয়াতিস সুনানি ওয়াল আসানীদ ১/১৯০

ইবনে ফানজুইয়াহ এর ছেলে সুফইয়ান সম্বন্ধে আলাদা শিরোনাম তৈরি করে ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

সুফইয়ান ইবনুল হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ফানজুইয়াহ আসসাকাফী আলহামাদানী আবুল কাসিম। তিনি তাঁর পিতা আবূ আব্দুল্লাহ এবং আবূ উমর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আলবিসতামী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। –তারীখুল ইসলাম ৪৮/২৭৯

৬। হাফেয আবূ বকর ইবনুন নুকতাহ আলহাম্বালী রহ. বলেন,

হাফিয আবুল কাসিম আব্দুর রাহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মান্দাহ রহ. হাফিয আবূ আব্দুল্লাহ আলহুসাইন বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে ফানজুইয়াহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। –আততাকয়ীদ লিমা'রিফাতি রুওয়াতিস সুনানি ওয়াল আসানীদ ১/২৫৮

৭। আলী ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আলমাদীনী আন নাইসাবুরী হাফিয আবূ আব্দুল্লাহ আলহুসাইন বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে ফানজুইয়াহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। –আততাকয়ীদ লিমা'রিফাতি রুওয়াতিস সুনানি ওয়াল আসানীদ ১/৩১৩

৮। মুহাম্মাদ বিন উসমান বিন আহমদ বিন জালাহ হাফিয আবূ আব্দুল্লাহ আলহুসাইন বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে ফানজুইয়াহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। –ইবনে হাজার আসকালানী, তাবসীরুল মুনতাবিহ বিতাহরীরিল মুশতাবিহ ১/৪৩১

৯। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

হাফিয আবূ আব্দুল্লাহ আলহুসাইন বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে ফানজুইয়াহ সুনানে নাসায়ী আবূ বকর ইবনুস সুন্নী থেকে শ্রবণ করেছেন। –প্রাগুক্ত

১০। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

মুহাদ্দিস আবূ আব্দুল্লাহ আলহুসাইন বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ফানজুইয়াহ আসসাকাফী

আদদাইনাওয়ারী নাইসাবুরে ৪১৪ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। –তাযকিরাতুল হুফফায ৩/৩৭১

১১। আবূ আব্দুল্লাহ আলহুসাইন বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ফানজুইয়াহ আসসাকাফী আদদাইনাওয়ারী থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেন তারা হলেন, ১. জা'ফার আবহারী ২. আব্দুর রাহমান ইবনে আবূ আব্দুল্লাহ ইবনে মান্দাহ ৩. সা'দ বিন হামদ ৪. আবুল ফাযল আলকুমসানী ৫. আহমদ বিন আব্দুল্লাহ ৬. আবূ গালিব বিন কাসসার ৭. আবুল ফাতহ বিন আব্দূস ৮. আবূ নাসির আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়িদ ৯. আলী ইবনে আহমদ ইবনুল আখরাম ১০. আবূ সালিহ আল মুয়াজ্জিন ১১. মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আলমুযাক্কী ১২. মক্কী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে দুলাইর ১৩. আহমদ ইবনুল হুসাইন আলকরসী ১৪. ইমাম বাইহাকী ১৫. ইবনে ফানজুইয়ার ছেলে আবূ বকর এবং ১৬. সুফইয়ান । –আবূ আব্দুল্লাহ হামিদ বিন আহমদ, শুয়ূখুল বাইহাকী ফিস সুনানিল কুবরা ১/১৯

১২। ইবনে মাকুলা রহ. বলেন,

আবূ সা'দ সামআনী রহ. বলেছেন, আলহুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন আনবাহ হলেন, আদদাইনাওয়ার এলাকার অধিবাসী আবূ আব্দুল্লাহ আলহুসাইন বিন মুহাম্মাদ ইবনে ফানজুইয়াহ আসসাকাফী। তিনি অনেক বড় হাফিয এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা। –ইবনে মাকুলা, ইকমালুল কামাল ৬/১১৮

১৩। ইবনে মাকুলা রহ. বলেন,

আব্দুর রহমান বিন গায' বিন মুহাম্মাদ আবূ মুসলিম আলআত্তার আননুহাওয়ান্দী আবূ আব্দুল্লাহ আলহুসাইন বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে ফানজুইয়াহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। –ইবনে মাকুলা, ইকমালুল কামাল ৭/২০

১৪। আবূ বকর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল গনী আলবাগদাদী রহ. বলেন,

আবূ আব্দুল্লাহ আলহুসাইন বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ফানজুইয়াহ আবূ বকর ইবনুস সুন্নী রহ. থেকে নাসায়ী রহ. এর আসসুনান শ্রবণ করেছেন। –তাকমিলাতুল ইকমাল ৪/৪৯৫

১৫। আবূ আব্দুল্লাহ আলহুসাইন বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ফানজুইয়াহ আবূ বকর ইবনুস সুন্নী রহ. থেকে নাসায়ী রহ. এর আসসুনান শ্রবণ করেছেন। আর এ ইবনে ফানজুইয়াহ এর অনেক গ্রন্থ

রয়েছে। তিনি ৪১৪ হিজরী সনে রবীউল আউয়াল মাসে জুমআরর দিন রাতে ইন্তেকাল করেন। –ইবনে নাসিরুদ্দীন আদদিমাশকী, তাউযীহুল মুশতাবিহ ৭/৬৪

১৬। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

> ইবনে ফানজুইয়াহ হলেন আশশাইখুল ইমাম (শাইখ ইমাম), আলমুহাদ্দিসুল মুফীদ (উপকার এবং কল্যাণের আধার মুহাদ্দিস), বাকিয়াতুল মাশায়িখ (হাদীস বিশারদদের শেষ কৃতি) আবূ আব্দুল্লাহ আলহুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালিহ ইবনে শুআইব ইবনে ফানজুইয়াহ আস সাকাফী আদদাইনাওয়ারী। তিনি যাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তারা হলেন, হারুন আল আত্তার, আবূ আলী ইবনে হাবশ, আবূ বকর ইবনুস সুন্নী, আবূ বকর আলকাতিয়ী, ঈসা ইবনে হামিদ আররুক্কাজী, আবুল হুসাইন আহমদ বিন জা'ফর ইবনে হামাদান আদ দাইনাওয়ারী এবং হামাদান ও অন্যান্য শহরের অসংখ্য উলামায়ে কেরাম।
>
> তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন জা'ফর আলআবহারী, আব্দুর রাহমান ইবনে মান্দাহ, সা'দ বিন হামদ, তাঁর দুই ছেলে সুফইয়ান এবং মুহাম্মাদ, আবুল ফাজল আলকুমসানী, আবুল ফাতহ আব্দূস ইবনে আব্দুল্লাহ, আহমদ বিন মুহাম্মাদ ইবনে সায়ীদ, আলী ইবনে আহমদ ইবনে আখরাম আলমুয়াজ্জিন, আবূ সালিহ আহমদ বিন আব্দুল মালিক আলমুয়াজ্জিন, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আলকিরমানীসহ অসংখ্য উলামায়ে কেরাম। শিরওয়াইহ তাঁর তারীখ গ্রন্থে বলেন ইবনে ফানজুইয়াহ 'সিকাহ এবং সাদুক' পর্যায়ের বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি ৪১৪ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। –সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৭/৩৮৩

১৭। হিবাতুল্লাহ ইবনে আবিস সাহবা মুহাম্মাদ ইবনে হায়দার আন নাইসাবুরী আবূ আব্দুল্লাহ আলহুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালিহ ইবনে শুআইব ইবনে ফানজুইয়াহ আস্‌সাকাফী আদ-দাইনাওয়ারী থেকে সুনানে নাসায়ী শ্রবণ করেছেন। –সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৮/৫৮৯

১৮। হাফিয আহমদ বিন মুহাম্মাদ ইবনে গালিব আবূ বকর আলখাওয়ারিযামী থেকে আবূ আব্দুল্লাহ আলহুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালিহ ইবনে শুআইব ইবনে ফানজুইয়াহ আস্‌সাকাফী আদ্‌দাইনাওয়ারী সুনানে নাসায়ী শ্রবণ করেছেন। –ইবনুন নুকতাহ, আততাকয়ীদ লিমা'রিফাতি রুওয়াতিস সুনানি ওয়াল আসানীদ ১/১২৭

এখন পাঠক আপনিই বিবেচনা করুন ইবনে ফানজুইয়ার মত মহান হাদীসবেত্তা মাজহুল হতে পারেন কি না। মাজহুলের তিনটি প্রকারের কোনো একটি প্রকারও কি তাঁর ক্ষেত্রে ফিট করা সম্ভব? বস্তুত শাস্ত্রীয় বিবেচনায় তো তাঁর ক্ষেত্রে কোনভাবেই মাজহুল প্রয়োগ হয় না। লেখক মহোদয় যে বৃত্তের মাঝে পদচারণা করেন সে বৃত্তভুক্ত ভাইয়েরা আমাদের দিকে অন্ধ তাকলীদের তীর ছুড়ে মারেন। আমাদের সবিনয় প্রশ্ন হলো, মুবারকপুরী রহ. যখন একজন পরিচিত রাবীকে মাজহুল বললেন তখন মুহতারাম লেখকের কি ঘেটে দেখার প্রয়োজন ছিল না যে, আসলেই সংশ্লিষ্ট বর্ণনাকারী মাজহুল কি না?

এবার দেখুন সালাফী ভাইদের গুরু পর্যায়ের ইমাম শাইখ আলবানী রহ. ইবনে ফানজুয়াহ রহ. সম্বন্ধে কি বলেন। তিনি বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ ইবনুল হুসাইন ইবনে ফানজুইয়াহ সাকাফী একজন সিকাহ ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের রাবী। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৭/৩৮৩) এবং শাযারাতুয যাহাব (৩/২০০) গ্রন্থদ্বয়ে তাঁর জীবনী আলোচিত হয়েছে। –সিলসিলাতুল আহাদীসিস যয়ীফা ওয়াল মাউযুআহ ১/১৮৫

শাইখ আলবানী রহ. এর মন্তব্যের আরবীপাঠ নিম্নরূপঃ

وأبو عبد الله بن الحسين بن فنجويه الثقفي ثقة مترجم في "سير أعلام النبلاء" (٣٨٣/١٧) و"شذرات الذهب" (٢٠٠/٣) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (١٨٥/١)

লেখক মহোদয়ের খুঁত আবিষ্কারঃ ২

মুহতারাম লেখকের ভাষায় দ্বিতীয় খুঁতটি হলো,

> দ্বিতীয়তঃ উক্ত বর্ণনায় ইয়াযীদ ইবনে খুছায়ফাহ নামে একজন মুনকার রাবী আছেন। সে ছহীহ হাদীছের বিরোধী হাদীছ বর্ণনাকারী। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এজন্য তাকে মুনকার বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী ও ইবনে হাজার আসক্বালানী তা সমর্থন করেছেন। তছাড়া সে যে মুনকার রাবী তার প্রমাণ হ'ল, সায়িব বিন ইয়াযীদ থেকে সে এখানে ২০ রাক'আতের কথা বর্ণনা করেছে। অথচ আমরা ৮ রাক'আতের আলোচনায় সায়িব ইবনে ইয়াযীদ থেকে মোট ৪টি হাদীস (৪-৭) উল্লেখ করেছি, যার সবগুলোই ছহীহ।

সুতরাং এই বর্ণনা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। –পৃষ্ঠা ২৮-২৯

বাস্তবতা

ক. এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম বক্তব্য হলো, ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাহ রাযি. একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী। আলআসরাম রহ. এর সূত্র মতে ইমাম আহমদ রহ., ইমাম আবূ হাতিম রাযী, ইমাম নাসায়ী এবং ইবনে সা'দ রহ. তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন রহ. বলেন 'সিকাতুন হুজ্জাতুন'। ইমাম মালেক রহ.সহ সমস্ত ইমামগণ তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. তার 'আসসিকাত গ্রন্থে তাঁর আলোচনা এনেছেন। হাফেয আবুল হাজ্জাজ মিযযী রচিত তাহযীবুল কামাল এবং হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রচিত তাহযীবুত তাহযীব এবং হাদয়ুসসারী গ্রন্থে ইয়াযীদ বিন খুসাইফা রাযি. সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, আপনাদের মান্যবর ব্যক্তিত্ব আলবানী রহ. কে ইসমাঈল আনসারী রহ. অভিযোগ করেছিলেন, যে তিনি ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাকে যয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। আলবানী রহ. তার অভিযোগকে চরমভাবে প্রত্যাখান করে বলেছেন, আমি ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাকে যয়ীফ হিসেবে সাব্যস্ত করিনি; বরং আমি তাকে সিকা তথা গ্রহণযোগ্য বলেছি। দেখুন আলবানী রহ. এর বক্তব্য:

> দ্বিতীয়ত তিনি আমার ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন, আমি উমর রাযি. থেকে বিশ রাক'আত তারাবীহ বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাকে যয়ীফ হিসেবে সাব্যস্ত করেছি। এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তিনি তার পুস্তিকার কয়েক পৃষ্ঠা কালো করেছেন। যাতে তিনি আয়িম্মায়ে কেরামের উক্তির সমর্থনে আমাকে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, উক্ত বর্ণনাকারী হলো সিকা তথা গ্রহণযোগ্য। অথচ তিনি জানেন, এক্ষেত্রে আমি তাদের বিরোধী নই। আমি আমার পুস্তকে ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাহ উমর রা. থেকে তারাবীহ এর যে রাক'আত সংখ্যা বর্ণনা করেছেন তার দুর্বলতার বিভিন্ন দিক বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছি, ইবনে খুসাইফাহ যদিও সিকা তথা নির্ভরযোগ্য কিন্তু ইমাম আহমদ এক বর্ণনা মতে তার ব্যাপারে বলেছেন মুনকারুল হাদীস। এরপর আমি সংশ্লিষ্ট বর্ণনাকারী সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ বক্তব্যে সে যে আমার নিকট নির্ভরযোগ্য সে বিষয়টি দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছি। সুতরাং সেগুলো বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। আমার উপর শাইখের মিথ্যারোপের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কেউ ইচ্ছে করলে আমার আলোচনাগুলো দেখে নিতে পারে। –তামামুল মিন্নাহ ফিত তা'লীকি আলা ফিকহিস সুন্নাহ ১/২৫৩

খ. মুহতারাম লেখক বলেছেন

> ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এজন্য তাকে মুনকার বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী ও ইবনে হাজার আসকালানী তা সমর্থন করেছেন।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর দু'টি অভিমত রয়েছে। একটি আসরাম রহ. কর্তৃক বর্ণিত অভিমত। এতে বলা হয়েছে তিনি 'সিকাহ' ছিলেন। অন্য একটি বর্ণনা হলো আজুর্‌রী রহ. কর্তৃক ইমাম আবূ দাউদ রহ. সূত্রে বর্ণিত অভিমত। সেখানে বলা হয়েছে তিনি মুনকারুল হাদীস ছিলেন। এ দু'টি বর্ণনাই ন্যায়সঙ্গতভাবে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তার তাহযীবুত্তাহযীব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তো এতে ইমাম আহমদ রহ. এর মুনকারুল হাদীস উক্তির উপর ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর সমর্থন কিভাবে প্রমাণিত হলো? দু'টি অভিমতের মধ্য হতে যে কোনো একটির উপর ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর সমর্থন প্রমাণের জন্য তো তাঁর আলাদা বক্তব্যের প্রয়োজন। মুনকারুল হাদীস অভিমতের সপক্ষে তো তাঁর কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা রহ. সম্বন্ধে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. সর্বশেষ যে উক্তিটি পেশ করেছেন তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সুবিধার্থে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর সে নিজস্ব উক্তিটির আরবী পাঠ তুলে দিচ্ছি:

> قلت: زعم ابن عبد البر انه ابن أخي السائب بن يزيد وكان ثقة مأمونا
>
> অর্থ: আমি বলি, ইবনে আব্দুল বার রহ. দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা হলো সায়িব বিন ইয়াযীদ রাযি. এর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি সিকাহ এবং মামূন পর্যায়ের রাবী ছিলেন। –তাহযীবুত তাহযীব ৫/৪৮৬

বিষয়টি পরিষ্কার করার উদ্দেশে আরবী পারদর্শী পাঠকদের জন্য ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাহ সম্পর্কে জরাহ তা'দীল বিষয়ক ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর পূর্ণ বক্তব্যটি তুলে দিচ্ছি।

> قال الاثرم عن أحمد وأبو حاتم والنسائي ثقة وقال الآجري عن أبي داود قال أحمد منكر الحديث وقال ابن أبي مريم عن ابن معين ثقة حجة وقال ابن سعد كان عابدا ناسكا كثير الحديث ثبتا وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: زعم ابن عبد البر انه ابن أخي السائب بن يزيد وكان ثقة مأمونا. تهذيب التهذيب لأحمد العسقلاني- ٥/٤٨٦

এবার হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাহ সম্পর্কিত ইমাম আহমদ রহ. এর মুনকারুল হাদীস অভিমত সম্বন্ধে কি বলেন শুনুন। তিনি বলেন,

> ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে খুসাইফা আলকিন্দী। কখনো তাঁর পিতামহ এর সাথে সম্পৃক্ত করে ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাও বলা হয়। ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন রহ. বলেন, তিনি 'সিকাতুন হুজ্জাতুন'। আলআসরাম রহ. এর সূত্র মতে ইমাম আহমদ তেমনিভাবে ইমাম আবূ হাতিম রাযী, ইমাম নাসায়ী এবং ইবনে সা'দ রহ. তাঁকে 'তাউসীক' করেছেন। আবূ উবাইদ আলআজুররী রহ. ইমাম আবূ দাউদ রহ. সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা 'মুনকারুল হাদীস'। আমি বলি, ইমাম আহমদ রহ. এ শব্দটি এমন বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন যে তার সমসাময়িকদের কাছে দুর্লভ হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম মালেক রহ.সহ সমস্ত ইমামগণ ইবনে খুসাইফা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল উপস্থাপন করেছেন। -হাদয়ুস সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী ২/৩৯৪

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে প্রমাণিত হলো, ইমাম আহমদ রহ. এর মুনকারুল হাদীস শব্দ প্রয়োগ করা দ্বারা বর্ণনাকারীর বর্ণনায় খুঁত ধরা উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তিনি তার সমসাময়িক বর্ণনাকারীদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি এককভাবে এমন কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন যা তার সমসাময়িক বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী রহ. মীযানুল ই'তিদালে আলী ইবনুল মাদিনী এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

> সিকাহ এবং হাফিয পর্যায়ের বর্ণনাকারী যখন এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেন তখন সেটা তার উচ্চতর এবং পূর্ণতর

> মর্যাদার বার্তা বহন করে। সাথে সাথে হাদীসবেত্তাদের গোচরীভূত নিগূঢ় কিছু কারণে হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞানগভীরতা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সমসাময়িকদের তুলনায় বেশি মনোযোগের প্রমাণ বহন করে। তবে তাতে যদি কোনো বিভ্রান্তি বা বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হয় তবে সেটা সবার সামনে চলে আসবে। এরপর যাহাবী রহ. আরো বলেন, নবীন প্রবীণ সাহাবায়ে কেরামের প্রথম দিককার অবস্থার দিকে লক্ষ্য করুন। সেকালে প্রত্যেকেই এককভাবে এমন সুন্নাহ জানতেন যা অন্য কেউ জানত না। তবে কি বলা হবে যে, এ হাদীসটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বা তার অনুরূপ অন্য কোনো হাদীস নেই? তেমনিভাবে তাবিয়ীদের যুগে তাদের প্রত্যেকের কাছে এমন অনেক হাদীসের ইলম ছিল যা অন্যের কাছে ছিল না। -মীযানুল ই'তিদাল ২/৯৭

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর উপরোক্ত বক্তব্য জানার পরও কি এ কথা বলার সুযোগ আছে যে, ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা সম্পর্কিত ইমাম আহমদ রহ. এর নেতিবাচক বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন?

গ. লেখক মহোদয় বলেছেন, ইমাম যাহাবী রহ. নাকি ইমাম আহমদ রহ. এর নেতিবাচক উক্তিকে সমর্থন করেছেন।

এ ব্যাপারে আমরা কয়েকটি পয়েন্ট উল্লেখ করবো।

১। এ সমর্থনটা কি প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ? লেখক মহোদয় হয়তো বলবেন পরোক্ষ। কারণ ইমাম যাহাবী রহ. মীযানুল ই'তিদালে ইমামদের উক্তি উল্লেখ করার পর নিজস্ব কোনো বক্তব্য উল্লেখ করেননি। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো এ পরোক্ষ সমর্থনের নিদর্শনটা কি? কি উপায়ে উপলব্ধ হলো যে, ইমাম যাহাবী রহ. নেতিবাচক উক্তিটিকে সমর্থন করেছেন। তাহলে কি বলবেন নীরবতা সম্মতির লক্ষণ? এখানে এ নীতিবাক্য প্রয়োগের কোনোই সুযোগ নেই। কারণ ইমাম যাহাবী রহ. মীযানুল ই'তিদালে প্রথমে ইমাম আহমদ, আবূ হাতিম রাযী, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এবং নাসায়ী রহ. এর তাওসীক উল্লেখ করেছেন। তো তিনি ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। আর 'জরহ এবং তা'দীলের বিরোধ হলে জরহ প্রাধান্য পাবে' বলে যে নীতির প্রসিদ্ধি রয়েছে তা সর্বাত্মক কোনো নীতি নয়। এ নীতির জন্য আলাদা স্থান কাল রয়েছে। নতুবা কোনো রাবীকেই সিকাহ বলার সুযোগ থাকবে না। কারণ এমন কোনো বর্ণনাকারী পাওয়া দুষ্কর হবে যার

পক্ষে বিপক্ষে ইতিবাচক নেতিবাচক কোনো উক্তি নেই। আর 'সবশেষে যে উক্তি উল্লেখ করবেন সেটাই তার মত বা সমর্থনের প্রমাণ' একথা বলারও কোনো সুযোগ নেই। কারণ একথা প্রমাণের জন্য ইমাম যাহাবী রহ. এর নিজস্ব বক্তব্য বা অভিমত উপস্থাপন করতে হবে।

২। ইমাম যাহাবী রহ. মীযানুল ই'তিদাল ফী জুআফাইর রিজাল গ্রন্থে ইয়াযীদ বিন খুসাইফাকে এনেছেন বলেই তাকে পরিত্যাজ্য বলার কোনো সুযোগ নেই। কারণ মীযানুল ই'তিদালে স্থান পাওয়াটাই তার দুর্বলতার প্রমাণ বহন করে না। এবার এ ব্যাপারে স্বয়ং মীযানুল ই'তিদালের গ্রন্থকার ইমাম যাহাবী রহ. বক্তব্য শুনুন। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

> মীযানুল ই'তিদালের মৌলিক আলোচ্য বিষয় যয়ীফ রাবীদের সম্পর্কে আলোচনা। এ গ্রন্থে অনেক সিকাহ রাবীদের আলোচনা এসেছে। তাদের প্রতিরক্ষার জন্য আমি তাদের আলোচনা এখানে এনেছি। অথবা এ কারণে তাদের আলোচনা এখানে এনেছি যে, তাদের ব্যাপারে নেতিবাচক আলোচনা তাদের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করে না। –মীযানুল ই'তিদাল ৪/৬১৬
>
> যাহাবী রহ. আরো বলেন, এ গ্রন্থে এমন কিছু রাবীর আলোচনা এসেছে যারা সিকাহ এবং মহান হওয়া সত্ত্বেও সামান্য শিথিলতা এবং সামান্য জরহের কারণে তাদেরকে বিতর্কিত করা হয়েছে। যদি ইবনে আদী এবং অন্যান্য জারহ তা'দীলের ইমামগণ এ ধরনের রাবীদেরকে উল্লেখ না করতেন তাহলে আমি সিকাহ হওয়ার কারণে তাদের নাম উল্লেখ করতাম না। উপরোক্ত আয়িম্মায়ে কেরামের রিজাল গ্রন্থে যাদেরকে সামান্য শিথিলতার কারণে বিতর্কিত করা হয়েছে তাদের নাম আমি অনুল্লেখ করাকে যথোপযুক্ত মনে করিনি। কারণ এতে করে আমি সমালোচিত হওয়ার শঙ্কাবোধ করেছি। আমার নিকট যয়ীফ বা দুর্বল পর্যায়ের রাবী হওয়ার কারণে আমি তাদের নাম উল্লেখ করেছি–ব্যাপারটি এরকম নয়। তবে বুখারী, ইবনে আদীসহ অন্যান্য রিজালবিদদের গ্রন্থে যেসব সাহাবায়ে কেরামের নাম এসেছে তাদের মহত্ত্বের কারণে তাদের নাম আমি এ গ্রন্থে উল্লেখ করিনি। কারণ হাদীসে দুর্বলতা বা সমস্যা সৃষ্টি হয় সাহাবীদের নিচের বর্ণনাকারীদের কারণে; সাহাবীদের কারণে নয়। তেমনিভাবে আমি আমার এ গ্রন্থে

> দীনের শাখাগত বিষয়ে অনুসৃত ইমামদের মধ্য হতে কারো নাম উল্লেখ করবো না। কারণ ইসলামে তাদের মর্যাদা এবং মানুষের হৃদয়ে তাদের বড়ত্ব অনেক বেশি। যেমন আবূ হানীফা, শাফেয়ী এবং বুখারী রহ.। যদি এদের মধ্য হতে কারো নাম উল্লেখ করি তবে ন্যায়সঙ্গতভাবেই উল্লেখ করবো। এটা তাকে আল্লাহ এবং মানুষের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করবে না। মিথ্যা বলা, অধিক ভ্রান্তিতে অবিচল থাকা এবং অব্যাহতভাবে সত্য মিথ্যাকে লেজেগোবরে করে ফেলা ইত্যকার বিষয় মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কারণ এগুলো হলো বিশ্বাসঘাতকতা এবং মহা অপরাধ। একজন মুসলিম ব্যক্তি স্বভাবগতভাবে সব কিছুই করতে পারে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিথ্যায় লিপ্ত হতে পারে না। –মীযানুল ই'তিদাল ১/২

তাই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইমাম যাহাবী রহ. বিভিন্ন রাবীর নাম এনে তাদের পক্ষাবলম্বন করেছেন এবং যেসব ইমাম তাদেরকে বিতর্কিত করেছেন তাদেরকে অভিযুক্ত করেছেন। যথা:

১। সিকাহ পর্যায়ের রাবী জা'ফার ইবনে ইয়াস আলওয়াসিতী এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ইবনে আদী রহ. তাঁর আলকামিল গ্রন্থে এ রাবীর আলোচনা এনেছেন। এতে করে ইবনে আদী খুব খারাপ কাজ করেছেন।

২। হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান এর জীবন বৃত্তান্তে বলেন, ইবনে আদী যদি একে তার আলকামিল গ্রন্থে উল্লেখ না করতেন তবে আমি তার জীবনী এখানে উল্লেখ করতাম না।

৩। সাবিত আলবুনানী এর জীবনীতে বলেন, সাবিত তার নামের মতই একজন সাবিত (প্রতিষ্ঠিত) রাবী। ইবনে আদী তার নাম উল্লেখ না করলে আমি উল্লেখ করতাম না।

৪। হুমাইদ বিন হিলালের মত মহান রাবী সম্পর্কে বলেন, ইবনে আদী এর আলকামিলে তার আলোচনা এসেছে। এ জন্যই আমি তার নাম উল্লেখ করেছি। নতুবা এতো একজন হুজ্জাহ পর্যায়ের রাবী।

৫। উয়াইস আলকারানী এর জীবনী আলোচনায় বলেন, যদি বুখারী উয়াইস আলকারানীকে যয়ীফদের শ্রেণীভুক্ত না করতেন তবে আমি তার নাম আদৌ উল্লেখ করতাম না। কারণ তিনি তো আল্লাহর সৎকর্মশীল ওয়ালীদের মধ্যে অন্যতম।

৬। ইলমে হাদীসের খ্যাতিমান হাফিয আব্দুর রাহমান ইবনে আবূ হাতিম এর জীবনী আলোচনায় বলেন, আমি তার নাম উল্লেখ করতাম না যদি আবুল ফাজল আসসুলাইমানী তার নাম উল্লেখ না করতেন। তার নাম উল্লেখ করে তিনি কতই না নিকৃষ্ট কাজ করেছেন!

ইমাম যাহাবী রহ. এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির ভূমিকাতে তিনি বলেন,

> আমি আমার আলমিযান গ্রন্থে বিশাল সংখ্যক সিকাহ রাবীদের জীবন বৃত্তান্ত উল্লেখ করেছি, যাদের বর্ণিত হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের ইমামগণ প্রমাণ পেশ করেছেন। কারণ তাদের মধ্যে অনেকের নাম জরহ বিষয়ক গ্রন্থাদিতে সংকলিত হয়েছে। আমার নিকট তাদের মাঝে দুর্বলতা থাকার কারণে তাদের নাম আমি আলোচনা করিনি; বরং আমি তাদের নাম এনেছি তাদের মূল পরিচিতিটা তুলে ধরার জন্য। আমার সামনে এমন অনেক সিকাহ এবং হাদীসের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম এসেছে যাদের ব্যাপারে তীর্যক আলোচনা হয়েছে যার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

এরপর তিনি এমন অনেক রাবীদের নাম উল্লেখ করেন যাদের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সে সমালোচনা তাদের উপর কোনো ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না।

–ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আলআনসারী, তাসহীহু হাদীসি সালাতিত তারাবীহ ইশরীনা রাক'আতান ওয়ার রাদ্দু আলাল আলবানী ফী তাযঈফিহী ১৪-১৫, শাইখ আব্দুল মুহসিন আল আব্বাদ, আলইমাম আলবুখারী ওয়া কিতাবুহু আলজামিউস সহীহ ১/২২

এবার ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী রহ. এর নিজস্ব বক্তব্য লক্ষ্য করুন। তিনি বলেন,

> ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে খুসাইফাহ (কুতুবে সিত্তার প্রতিটিতে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে)। খুসাইফাহ হলো সায়িব ইবনে ইয়াযীদ ইবনে সাঈদ ইবনে উখতে নামার আলকিন্দী এর ভাই। সুতরাং তিনি হলেন সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রাযি. এর ভ্রাতুষ্পুত্রের ছেলে। তিনি মদীনার অধিবাসী একজন বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন। তিনি সায়িব ইবনে ইয়াযীদ, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, বাশার বিন সাঈদ,

> ইয়াযীদ ইবনে কুসাইত রাযি. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এবং ইমাম মালেক, সুফইয়ান সাওরী, সুলাইমান ইবনে বিলাল, ইসমাঈল ইবনে জা'ফার, সুফইয়ান ইবনে উয়াইনাহ এবং দারাওয়ারদীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. তাঁকে নির্ভরযোগ্য রাবী বলে অভিহিত করেছেন। ইবনে সা'দ রহ. বলেন, তিনি একজন সুপ্রতিষ্ঠিত সার্বক্ষণিক ইবাদত উপাসনায় মনোযোগী, বিপুল পরিমাণ হাদীসের ধারক ব্যক্তি। আমি বলি, তিনি একশত ত্রিশ হিজরী সনের পরবর্তী সময়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। –সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/১৫৭, তারীখুল ইসলাম ১৪/১৬৭

এখনো কি একথা বলা যাবে, ইমাম যাহাবী রহ. ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাহ এর মুনকারুল হাদীস হওয়ার ব্যাপারটিকে সমর্থন করেছেন?

৩। ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাহ রহ. যদি 'মুনকারুল হাদীস' এর সরল অর্থের বিবেচনায় একজন অগ্রহণযোগ্য এবং বিতর্কিত রাবী হয়ে থাকেন তাহলে সহীহ বুখারীকে আর সহীহ বুখারী বলার সুযোগ থাকছে না। কারণ আমাদের ঝটিকা জরিপ অনুযায়ী সহীহ বুখারীর ছয়টি হাদীস রয়েছে যা ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাহ থেকে বর্ণিত। তাহলে এখন শাইখ আলবানী রহ. এর মতো দায়িত্ব সচেতন(?) কোনো হাদীসের অনুসারী ব্যক্তি সহীহ বুখারীকে ডিভাইড করে সহীহুল বুখারী এবং যয়ীফুল বুখারী বানিয়ে দিলে বোধ হয় উম্মাহ বেশ উপকৃত হবে! এ ধারার উলামায়ে কেরামের প্রান্তিক এবং একরোখা বাচনভঙ্গি ও অধ্যয়ন দেখলে আমাদের প্রবল আশঙ্কা হয়, তারা অচিরেই সহীহ বুখারীকে ডিভাইড করে ফেলবেন। এবার সনদসহ ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফাহ বর্ণিত সহীহ বুখারীর হাদীসগুলো একবার দেখে আসা যাক। এখানে শুধু হাদীস নাম্বারগুলো প্রদান করা হলো। ৪৭০, ১০৭২, ২৩২৩, ৩৩২৫, ৬২৪৫, ৬৭৭৯।

লেখক মহোদয়ের খুঁত আবিষ্কার: ৩

মুহতারাম লেখক সংশ্লিষ্ট বিশ রাক'আত তারাবীহ এর বর্ণনার তৃতীয় দোষ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

তৃতীয়তঃ এটি কখনো 'মুযত্বরাব' পর্যায়ের। এই বর্ণনায় বিশ রাক'আতের বর্ণনা এসেছে। কিন্তু অন্য বর্ণনায় আবার ২১ রাক'আতের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই শাইখ আলবানী বলেন, এটি 'মুযত্বারাব' পর্যায়ের হওয়ায় পরিত্যাজ্য।

বাস্তবতা

ক. মুহতারাম লেখক বললেন, 'মুযত্বরাব'। মুযত্বরাব বস্তুটি মূলত কি? আরবী ভাষায় কিংবা হাদীস শাস্ত্রে অথবা অন্য কোনো শাস্ত্রে মুযত্বরাব বলে কোনো শব্দ আছে বলে আমাদের জানা নেই। বলতে পারেন এটা আমার অজ্ঞতা। আমি যতটুকু জানি তা হলো, মুযতারাব (আরবী المضطرب) এর মূল ক্রিয়া হলো, আলইযতিরাব (الاضطراب)। আর আরবী ভাষার এ ক্রিয়াটি الفعل اللازم তথা অকর্মক ক্রিয়া। আর আরবী ভাষার স্বতঃসিদ্ধ একটি নীতি হলো, অকর্মক ক্রিয়া থেকে কখনো الفعل المجهول তথা কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া ও الاسم المفعول তথা কর্মবাচ্য বিশেষ্য গঠিত হয় না। আর হাদীস শাস্ত্রে পারিভাষিক যে শব্দটি আছে তা হলো, আলহাদীসুল মুযতারিব। এরূপ ভ্রম আমাদের হলে না কিছুটা প্রবোধ দেয়া যায়!

খ. 'এটি কখনো 'মুযত্বরাব' পর্যায়ের।' এটা কেমন কথা। মুহতারাম লেখক এ কি কথা বললেন? এ কথার অর্থ কি? এও কি সম্ভব যে একটি হাদীস নির্দিষ্ট একটা সময়ে মুযতারিব হবে অন্য সময় মুযতারিব হবে না? কখনো মানে কি? কখনো মানে কোনো এক সময়। সবসময় নয়। তাহলে কি কাল বিবেচনায় হাদীসের মান নির্ণিত হয়। এক সময়ে যয়ীফ তো অন্য সময় সহীহ। একজন প্রাথমিক ছাত্রেরও তো এ কথাটি মানতে বেশ কষ্টকর হয়ে যাবে। না কি ব্যক্তি বিবেচনায় হাদীসের মান নির্ণিত হয়। আপনাদের কাছে হাদীসটি মুযতারিব আর আমাদের কাছে সহীহ। এ ব্যাখ্যা হলে এতো 'দীনী রেষারেষি' কেন?

মুযতারিব হাদীস বিষয়ক আলোচনা

বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতায় এখানে আমরা হাদীসে মুযতারিব সম্বন্ধে দু একটি কথা জেনে রাখতে চাই।

আলমুযতারিব (المضطرب) শব্দটি আলইযতিরাব (الاضطراب) মূল ক্রিয়া থেকে গঠিত কর্তাবিশেষ্য পদ। আলইযতিরাব শব্দটির মূল অর্থ হলো, ঢেউ খেলা, সমুদ্র তরঙ্গায়িত হওয়া, উত্তাল হওয়া। যখন সমুদ্র ঢেউ ফুসে উঠে এবং ঢেউয়ের উপর ঢেউ আছড়ে পড়ে তখন আরবী ভাষায় বলা হয় اضطرب الموج। অর্থাৎ সমুদ্রের ঢেউ ভীষণভাবে তরঙ্গায়িত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে কোনো

বিষয়ে মতভিন্নতা সৃষ্টি হওয়া, ব্যবস্থাপনা ভণ্ডুল হওয়া ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

পারিভাষিক অর্থে হাদীসে মুযতারিব বলা হয়, শক্তি ও দৃঢ়তার দিক দিয়ে সমমানের একাধিক সূত্রে বর্ণিত বিরোধপূর্ণ হাদীস কিংবা ভিন্ন ভিন্ন সূত্রধারায় বর্ণিত সমান দৃঢ়তাসম্পন্ন বিরোধপূর্ণ হাদীস। অর্থাৎ যেসব হাদীস পরস্পর বিরোধপূর্ণ শব্দে বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর মাঝে আদৌ সমন্বয় সম্ভব নয় এবং যে বর্ণনাগুলো সর্ব দিক দিয়ে সমান দৃঢ়তাসম্পন্ন সেসব হাদীসকে হাদীসে মুযতারিব বলা হয়।

হাদীস মুযতারিব হওয়ার জন্য দু'টি শর্তের উপস্থিতি আবশ্যক। ১. হাদীসের বর্ণনাগুলো এমন বিরোধপূর্ণ হওয়া যে এগুলোর মাঝে আদৌ সমন্বয় সম্ভব নয়। ২. বর্ণনাগুলো এমন সমান শক্তিসম্পন্ন হওয়া যে একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়া সম্ভব নয়। –আবূ সানাদ মুহাম্মাদ, মাউসুআতু হাল ইয়াসতাউইল্লাযীনা... ১/২৯

প্রশ্ন হলো, আমাদের আলোচিত হাদীসটিতে কি মুযতারিব হওয়ার দু'টি শর্তের কোনো একটি পাওয়া যাচ্ছে? সংশ্লিষ্ট হাদীসে শব্দের যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে সে ভিন্নতার মাঝে কি সমন্বয় অসম্ভব?

ইযতিরাব সাধারণত সনদের মাঝে হয়ে থাকে। কদাচিৎ হাদীসের মূল পাঠেও ইযতিরাব হয়ে থাকে। কিন্তু যেসব হাদীসের মূলে পাঠে শুধু ভিন্নতা রয়েছে; সনদে ভিন্নতা নেই সেসব হাদীসকে হাদীস শাস্ত্রবিদগণ সাধারণত মুযতারিব বলে অভিহিত করেন না। –ইবনে হাজার আসকালানী, নুযহাতুন নাযার ফী তাউযীহি নুখবাতিল ফিকার ১/২৪

যদি হাদীসের মূল পাঠে শাব্দিক বৈপরিত্য থাকে কিন্তু সূত্রধারা ভিন্ন হয় তবে সেটাকে মুখতালাফুল হাদীস বলে অভিহিত করা হয়। আর মুখতালাফুল হাদীস বলা হয়, গ্রহণযোগ্য এমন হাদীস যা দৃশ্যত তার অনুরূপ অন্য একটি হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ।

পক্ষান্তরে যদি হাদীসের সূত্রধারা অভিন্ন হয় এবং তার শাব্দিক বৈপরিত্য খুব বেশি না হয়; বরং শব্দগুলো কাছাকাছি পর্যায়ের হয় তখন ধরে নেয়া হয় যে, মূলত এখানে হাদীস একটিই। কোনো বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে হয়তো সামান্য এ ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত যদি এ ব্যাপারটি এমন পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয়ে থাকে যেখানে এ ধরনের ঘটনা একাধিক হওয়া সুদূর পরাহত সে ক্ষেত্রে তো এ জাতীয় হাদীসকে এক হাদীস বলেই গণ্য করতে হবে। তো যদি বাহ্যিক বিরোধপূর্ণ দু'টি হাদীসের মাঝে সমন্বয় সম্ভব হয় তবে সমন্বয় করবে। কারণ হাদীসের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যথাসম্ভব হাদীসের মাঝে সমন্বয় করবে।

বিরোধপূর্ণ অবস্থায় রেখে দিবে না। –আহমদ বিন উমর বিন সালিম বাযমুল, আলমুকতারিব ফী বয়ানিল মুযতারিব ১/১০৩, ১০৬, ১০৭, ড. মাহির ইয়াসীন ফাহল, শারহুত তাবসিরাহ ওয়াত তাযকিরাহ ১/২৪০, আল্লামা মুবারাকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৯১, ইবনে উসাইমিন, শারহুল মানজুমাতিল বাইকুনিয়্যাহ ১/১০৭, শাইখ আব্দুল্লাহ সা'দ, শারহুল মুকিযাহ ১/ ২২৩

হাফিয আলায়ী রহ. বলেন,

> মুযতারিব হাদীস হাদীসের যতগুলো শ্রেণীভাগ রয়েছে তন্মধ্য হতে সবচেয়ে বেশি দুর্বোধ্য এবং জটিল বিষয়। এ হাদীস সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করা একমাত্র ঐ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব যাকে আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্ম বোধশক্তি, বিস্তৃত নিরীক্ষা জ্ঞান, বর্ণনাকারীদের মান নির্ণয়বোধ এবং সমুজ্জ্বল প্রতিভা দান করেছেন। মুহাম্মাদ সানআনী, তাউযীহুল আফকার ২/৩৭

মুযতারিব হাদীস সংক্রান্ত এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার আলোকে কি সংশ্লিষ্ট হাদীসকে হাদীসে মুযতারিব বলে অভিহিত করা যায়?

আভিধানিক অর্থ বিবেচনায় যদিও মেনে নিই এতে ইযতিরাব রয়েছে তবে তা তো আপনারা যে বৃত্তে অবস্থান করেন সে বৃত্তে অবস্থানরত উলামায়ে কেরামের নিকট ইযতিরাব বলে গণ্য হওয়ার কথা নয়। কারণ আপনারা তো এক রাক'আত বিতর নামাযের প্রবক্তা। একুশ এবং বিশ রাক'আতের বর্ণনার মাঝে সমন্বয় সাধন করা আপনাদের নিকট খুব সহজেই সম্ভব। এরপরও যদি বলেন এ ধরনের ইযতিরাব দোষে হাদীস পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হবে তবে আমরা বলবো আপনাদের আট রাক'আত সংক্রান্ত হাদীসের বর্ণনায় আট, এগারো এবং তেরো রাক'আতের বর্ণনাও এসেছে। এমন কি সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রহ. থেকে যার সূত্রে আপনারা আট রাক'আতের পক্ষে হাদীস বর্ণনা করেন সে মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ থেকেও একুশ রাক'আতের বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং আপনাদের আট রক'আত সংক্রান্ত হাদীসগুলোও ইযতিরাব দোষে দুষ্ট হওয়ার কারণে পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হবে।

আমরা স্বীকার করি, ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা রাযি. সূত্রে বর্ণিত বর্ণনায় বিশ, একুশ এবং তেইশ রাক'আতের বর্ণনাও এসেছে। তো শাব্দিক এ ভিন্নতা সম্পর্কে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর বক্তব্য শোনা যাক। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

والاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلى الاختلاف في الوتر وكأنه كان تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث. فتح الباري - ابن حجر - (٤ / ٢٥٣)

অর্থ: বিশ রাক'আতের অতিরিক্ত রাক'আত সংখ্যার বর্ণনার মাঝে যে বৈপরীত্য বিদ্যমান তা বিতরের রাক'আত সংখ্যার বৈপরীত্যের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। কখনো তিনি এক রাক'আত বিতর পড়তেন আবার কখনো তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। –ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ৪/২৫৩

লেখকের আপত্তি ৩

মুহতারাম লেখক পুস্তিকাটির ২৯ পৃষ্ঠায় লিখেন,

> বিশেষ সতর্কতা: 'উমদাতুল ক্বারী' প্রণেতা আল্লামা আয়নী বায়হাক্বীর উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত জাল বর্ণনার শেষে সংযোজন করেছেন وعلى عهد عثمان وعلي مثله 'এবং ওছমান ও আলী রাযি.-এর সময়েও এরূপভাবে (২০ রাক'আত) পড়া হ'ত'। অথচর বায়হাক্বীর কোন গ্রন্থে উক্ত বাড়তি অংশ পাওয়া যায় না। যেমন আল্লামা নীমভী হানাফী তাঁর 'তা'লীকু আসারিস সুনান' গ্রন্থে বলেন, قول مدرج لا يوجد في تصانيف البيهقي '(আয়ইনীর (এভাবেই লেখা) উক্ত বক্তব্য নিজের পক্ষ থেকে সন্নিবেশিত; বায়হাক্বীর গ্রন্থসমূহে তা পাওয়া যায় না'। অতএব বলা যায় যেন চোরাই পথে মরা লাশের উন্নত চিকিৎসা।

পর্যালোনা

(ক) প্রথম কথা হলো, আল্লামা আইনী রহ. এর উক্ত সন্নিবেশিত বক্তব্যের মাঝে رضي الله تعالى عنهما (আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাক।) অংশটুকুও ছিল। উমদাতুল কারী ৮/৪৮৫। বিয়োজন না করে এ অংশটুকু উদ্ধৃত করলে সালাফ প্রেমের পূর্ণ পরিচয় ফুটে উঠত। মির'আতুল মাফাতীহ প্রণেতা আল্লামা উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী সংশ্লিষ্ট আলোচনায় উমদাতুলকারীর উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে ঠিক একই রকম অনাকাঙ্ক্ষিত বিয়োজনের এ কাজটি করেছেন। মির'আতুল মাফাতীহ ৭/৪৩। তেমনিভাবে আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রহ.ও আল্লামা নীমাভী রহ. এর বক্তব্য উদ্ধৃত করতে গিয়ে এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিয়োজনের কাজটি করেছেন। তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৬৭। সালাফ প্রেমের বিষয়টি থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে নিলেও উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম হলো ভুল হলেও তা হুবহু উদ্ধৃত করা। জানি না এক্ষেত্রে কে কার তাকলীদ করেছেন? এবং এ জাতীয় তাকলীদকে চাক্ষুষ তাকলীদ না অন্ধ তাকলীদে ভূষিত করা হবে তাও জানি না।

(খ) দ্বিতীয় কথা হলো, আমরা বলি, হ্যাঁ সংশ্লিষ্ট অংশটুকু আইনী রহ. এর নিজস্ব বক্তব্য। তিনি হাদীসের বক্তব্যকে নিজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকারগণ যেমনটি করে থাকেন। আল্লামা আইনী রহ. উক্ত অংশটুকু হাদীসের মূলভাষ্য হিসেবে উল্লেখ করেননি; ভাবভাষ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আইনী রহ. এর আরবী বক্তব্য লক্ষ্য করুন:

> رواه البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد الصحابي قال كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله تعالى عنه بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما مثله
>
> অর্থ: ...বাইহাকী রহ. সাহাবী সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রাযি. সূত্রে সহীহ সনদে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তারা উমর রাযি. এর যুগে বিশ রাক'আত তারাবী পড়ত। এবং উসমান রাযি. ও আলী রাযি. এর যুগেও এরকম পড়া হতো। –উমদাতুল কারী ৮/৪৮৫

শুধু আইনী রহ.ই নয়; আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণবী রহ.ও এভাবে হাদীসের ভাবার্থ ব্যক্ত করেছেন। লক্ষ্য করুন তাঁর আরবী বক্তব্য:

> وأخرج أيضا أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان وعلي مثله
>
> অর্থ: তিনি আরো সনদসহ বর্ণনা করেন, তারা উমর রাযি. এর যুগে বিশ রাক'আত তারাবী পড়ত। এবং উসমান রাযি. ও আলী রাযি. এর যুগেও এরকম পড়া হতো।

সারকথা, আমরাও বলি, উক্ত বক্তব্য আইনী রহ. এর নিজের পক্ষ থেকে সন্নিবেশিত বক্তব্য। কিন্তু এতে তাঁর ব্যাপারে আপত্তিমূলক মন্তব্য পেশ করার অবকাশ কতটুকু আছে তা ভেবে দেখার বিষয়। এরপর '...বায়হাক্বীর গ্রন্থসমূহে তা পাওয়া যায় না' এ কথার ব্যাখ্যা কি? শব্দে শব্দে হয়তো সংশ্লিষ্ট অংশটুকু নেই; তাই বলে কি এ কথার ভাব ভাষ্যও নেই? উসমান রাযি. এবং আলী রাযি. এর যুগে বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়া হতো এ কথা তো বাইহাকী রহ. এর গ্রন্থসমূহে রয়েছে। বর্ণনা দু'টি দেখুন:

> এক.
>
> عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً – قَالَ – وَكَانُوا يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينِ، وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَى عُصِيِّهِمْ فِى عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ
>
> অর্থ: তাঁরা (সাহাবা ও তাবিয়ীন) উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. এর যুগে রমাযান মাসে বিশ রাক'আত পড়তেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তারা নামাযে শতাধিক আয়াত বিশিষ্ট সূরাসমূহ পড়তেন এবং উসমান ইবনে আফফান রাযি. এর যুগে দীর্ঘ নামাযের কারণে তাঁদের (কেউ কেউ) লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। –আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী হাদীস ৪৮২৪
>
> দুই.
>
> عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا الْقُرَّاءَ فِى رَمَضَانَ، فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً. قَالَ: وَكَانَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُوتِرُ بِهِمْ.
>
> وَرُوِىَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِىٍّ
>
> অর্থ: আলী রাযি. রমাযানে কারীগণকে (হাফেয) ডাকলেন, এবং তাদের একজনকে আদেশ করলেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাক'আত পড়েন এবং আলী রাযি. তাদের নিয়ে বিতর পড়তেন। –আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী; হাদীস ৪৮০৪

এখন হয়তো বলবেন, এ আপত্তি তো আপনাদের শ্রেণীভুক্ত আলেম আল্লামা নিমাভী রহ. ই করেছেন। আমরা বলবো, আপত্তিটা যে বা যিনিই করুক আমাদের মতে সে আপত্তি যথাযথ হয়নি।

লেখকের আপত্তি ৪

মুহতারাম লেখক তার পুস্তিকার ২৯ নম্বর পৃষ্ঠায় সায়িব বিন ইয়াযীদ বর্ণিত বিশ রাকাত বিষয়ক হাদীসটি সম্বন্ধে লেখেন,

> উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনাকে আল্লামা নীমাভী হানাফী সহ কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য বলে দাবী করেছেন। কিন্তু তাদের উক্ত দাবী সঠিক নয়। কারণ এই জালকৃত বিকৃত হাদীছের কোন পরিচয়ই নেই। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছাহাবীদের আমলের বিরোধী আছারকে কিভাবে নির্ভরযোগ্য বলা যায় তা আমাদের বোধগম্য নয়। অতএব এরূপ উদ্ভট কথা প্রচার করা মুসলিম উম্মাহর সাথে প্রতারণার শামিল।

পর্যালোচনা

পাঠক! লেখকের মন্তব্যটুকু আবার পাঠ করুন। এসব মন্তব্যের জবাব লিখতে গিয়ে কলমের গতি স্বাভাবিক রাখা খুবই দুরূহ ব্যাপার। কি করে হাদীসটি জালকৃত বিকৃত হলো এবং প্রতারণাই বা কি করে হলো বুঝতে পারছি না।

লেখকের আপত্তি ৫

লেখক মহোদয় তাঁর পুস্তিকার ৩০ নম্বর পৃষ্ঠার শুরুতে যে হাদীসটি এনেছেন সূত্রসহ তার আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

> وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أَخْبَرَنَا أَبُو عثمان عَمْرو بن عَبد الله البصري، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبد الوهاب، أَخْبَرَنَا خالد بن مخلد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر، حدثني يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، قال: كنا نقوم في زمان عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه بعشرين ركعة والوتر
>
> অর্থ: সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রাযি. বলেন, আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. এর যুগে বিশ রাক'আত নামায আদায় করতাম এবং বিতর পড়তাম। –সুনানে সুগরা, ইমাম বাইহাকী; হাদীস ৮৩৩, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার, ইমাম বাইহাকী; হাদীস ১৪৪৩

হাদীসটির অনুবাদান্তে লেখক মহোদয় বলেন, 'বর্ণনাটি শুধু ইমাম বাইহাক্বীর 'আলমা'রেফাহ' নামক গ্রন্থে এসেছে।'

লেখক মহোদয় এরপর তাঁর তাহক্বীক্বী আলোচনায় বলেন,

> তাহক্বীক্ব: পূর্বের আছারটির ন্যায় এটিও ত্রুটিপূর্ণ এবং মুনকার বা যঈফ। যদিও আল্লামা সুবকী সহীহ বলে দাবী করেছেন। কিন্তু তিনি কিসের ভিত্তিতে এই দাবী করেছেন তা অস্পষ্ট। কারণ এর সনদে দু'জন অপরিচিত রাবী আছে। আবূ ওছমান আলবাছরী যার আসল নাম আমর ইবনে আব্দুল্লাহ। অপরজন আবূ তাহের। আবূ ওছমান আলবাছরী সম্পর্কে আল্লামা নীমাভী হানাফী বলেন, 'কেউ তার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বলে আমি অবগত নই'। শায়খ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন,
>
> لم أقف أنا أيضا على ترجمته مع التفحص الكثير
>
> অর্থ: আমিও দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়ে তার জীবনী সম্পর্কে কিছু উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছি'। অন্য রাবী 'আবূ তাহের' সম্পর্কেও তিনি একই মন্তব্য করেন। তাছাড়া একই রাবী কর্তৃক যে বর্ণনা ছহীহ সনদে এসেছে (প্রথম অধ্যায় ৬নং)

> তার প্রকাশ্য বিরোধী। যেখানে ৮ রাক'আত তারাবীহর কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এই বর্ণনা অবশ্যই দুর্বল।

পর্যালোচনা

(ক) প্রথম কথা হলো, গ্রন্থটির নাম 'আলমা'রেফাহ' নয়। মূল নাম হলো, 'মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার'। অনেকে সংক্ষেপণের উদ্দেশে 'মুযাফ ইলাইহ' (যে পদের সাথে বিশেষ্যের সম্বন্ধ করা হয়) কে উহ্য করে তার বিপরীতে 'আলমু'আররফ বিললাম' ব্যবহার করে থাকেন। তবে সেটাকে 'নাম গ্রন্থ' হিসেবে পরিচিতি দেয়া যায় না।

(খ) দ্বিতীয়ত 'বর্ণনাটি শুধু ইমাম বাইহাক্বীর 'আলমা'রেফাহ' নামক গ্রন্থে এসেছে।' মন্তব্যটি যথার্থ নয়; বরং প্রমাদপূর্ণ। কারণ হাদীসটি তার সুনানে সুগরা গ্রন্থেও এসেছে। যার সূত্র আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

লেখক মহোদয়ের নিকট হাদীসটি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার মূল কারণ হলো দু'জন রাবী। তারা হলেন আবূ উসমান এবং আবূ তাহের। এবার তাহলে উক্ত রাবী দু'জন সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

সংশ্লিষ্ট বর্ণনার রাবী আবূ উসমান

আল্লামা জহীর আহসান নীমাভী রহ. আবূ উসমান আমর ইবনে আব্দুল্লাহ আলবাসারী সম্পর্কে সামান্য পরিচিতি উল্লেখ করে বলেন, ولم اقف من ترجم له কেউ তার জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন বলে আমার জানা নেই। আসারুস সুনান মা'আত তা'লীকিল হাসান ওয়া তা'লীকিত তা'লীক ২৫২। আল্লামা মুবারকপুরী রহ. নীমাভী রহ. এর উপরোক্ত উক্তি উল্লেখ করে বলেন, قلت لم أقف أنا أيضا على ترجمته مع التفحص الكثير অর্থাৎ আমিও বহু অনুসন্ধান সত্ত্বেও তার জীবনী সম্বন্ধে অবগতি লাভ করতে পারিনি। –তুহাফাতুল আহওয়াযী ৭/৬৫

আল্লামা উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরীও আল্লামা নীমাভী এবং তাঁর শায়খ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রহ. এর উপরোক্ত উক্তিদ্বয় উল্লেখ করে সহমত পোষণ করেছেন। –মির'আতুল মাফাতীহ ৭/৪২

এবার শুনুন আবূ উসমান আমর ইবনে আব্দুল্লাহ আলবাসারী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী রহ. কি বলেন। তিনি বলেন,

> আমর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে দিরহাম: আবূ উসমান আন-নাইসাবুরী, আলমুত্তাবিয়ী একজন খোদাভীরু এবং সাধক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তবে তিনি বাসারী সম্বন্ধ নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ফাররা ও আহমদ বিন মু'আজ রহ. থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তাঁর থেকে হাফেয আবূ আলী, আবূ

> ইসহাক মুযাক্কী, আবূ আব্দুল্লাহ ইবনে মান্দাহ, হাসান ইবনে আলী ইবনে মু'আম্মাল, মুহাম্মাদ ইবনে মাহমিশ প্রমুখ হাদীস শ্রবণ করেন। হাকেম রহ. বলেন, আমি তাঁর থেকে হাদীস শোনার সুযোগ লাভ করিনি। তবে তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমি তার সাথে প্রফুল্ল চিত্তে কথা বলতাম। আমার পিতা বলেন, রিবাতে ফুরাওয়া পর্যন্ত আমি তাঁর সংস্রবে ছিলাম। ঘরে বাহিরে তার মতো খোদাভীরু মানুষ আর কাউকে দেখিনি। তিনি শা'বান মাসে ইন্তেকাল করেন। তিনি আশি বছরের চেয়ে বেশি বয়স পেয়েছিলেন। –তারীখুল ইসলাম ৩৭/৬৪

যাহাবী রহ. আরো বলেন, তিন শত চৌত্রিশ হিজরীতে নাইসাবুরের মুসনিদ (সনদসহ হাদীস বর্ণনাকারী) আবূ উসমান আমর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে দিরহাম আলমুত্তাভিয়ী ইন্তেকাল করেন। –তাযকিরাতুল হুফফায ৩/৭৩

তিনি আরো বলেন,

> আলবাসারীঃ মহান ইমাম, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, খোদাভীরু, সৎকর্মশীল আবূ উসমান আমর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে দিরহাম নাইসাবুরী মুত্তাভিয়ী গাযী উরফে বাসারী। তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ফাররা ও আহমদ বিন মু'আজ রহ. প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তাঁর থেকে হাফেয আবূ আলী, আবূ ইসহাক মুযাক্কী, আবূ আব্দুল্লাহ ইবনে মান্দাহ, হাসান ইবনে আলী ইবনে মু'আম্মাল, আবূ তাহের ইবনে মাহমিশ এবং আলাভী প্রমুখ হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি তিন শত চৌত্রিশ হিজরীর শা'বান মাসে ইন্তেকাল করেন। তিনি আশি বছরের অধিক বয়স পেয়ে ছিলেন। হাকেম বলেন, আমি তাঁর থেকে হাদীস শোনার সুযোগ লাভ করিনি। তবে তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমি তার সাথে প্রফুল্ল চিত্তে কথা বলতাম। আমার পিতা বলেন, রিবাতে ফুরাওয়া (কিতাবুল আনসাব (ফারাওয়া, মু'জামুল বুলদান) পর্যন্ত আমি তাঁর সংস্রবে ছিলাম। ঘরে বাহিরে তার মতো খোদাভীরুতা আর কারো মাঝে দেখিনি। –সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৫/৩৬৪

ইমাম যাহাবী রহ. এর দৃষ্টিতে এ হলো, আবূ উসমান আমর ইবনে আব্দুল্লাহ আলবাসারী।

সংশ্লিষ্ট বর্ণনার রাবী আবূ তাহের

এবার 'অপরজন আবূ তাহের' সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক।

১। ইবনে নুকতা রহ. বলেন, আবূ বকর আলআসবাহানী আবূ আব্দুল্লাহ কাসেম ইবনে ফাযাল আস-সাকাফী থেকে আবূ তাহের মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমিশ এর শ্রুতি লেখনের তিনটি মজলিস শ্রবণ করেছেন। –ইবনে নুকতাহ, আততাকয়ীদ লিমা'রিফাতি রুওয়াতিস সুনানি ওয়াল আসানীদ ১/২০৩

২। ইমাম নববী রহ. বলেন, খুরাসান অধিবাসী আবূ তাহের যিয়াদী আমাদের মতাদর্শের বিশিষ্ট এক ব্যক্তিত্ব। 'আর-রওযাহ' তে অসংখ্যবার তাঁর আলোচনা এসেছে। তাঁর মূল নাম মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমিশ ইবনে আলী ইবনে দাউদ ইবনে আইউব ইবনে মুহাম্মাদ যিয়াদী। তিনি আবূ বকর কাত্তান, আবূ তাহের মুহাম্মাদ আবাযী, আবূ আব্দুল্লাহ সাফফার, আবূ হামিদ ইবনে বিলাল প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে আবুল কাসেম বিন উলাইক, হাকেম আবূ আব্দুল্লাহ, আবূ বকর বাইহাকী, আহমদ ইবনে খালফ প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে হাকেম তাঁর ইন্তেকালের পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। হাকেম তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, 'আবূ তাহের যিয়াদী শুরুতী একজন বিশিষ্ট ফকীহ এবং সাহিত্যিক ছিলেন'। তিনি ৩১৭ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ৩২৫ হিজরী থেকেই তিনি হাদীস শ্রবণ শুরু করেন। আর ৩২৮ হিজরী সন থেকে তিনি ফিকহের পাঠ গ্রহণ শুরু করেন। তিনি ৪০০ হিজরীর পরে ইন্তেকাল করেন। তাঁর পিতা একজন বিশিষ্ট ওয়ালী পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর দু'আ প্রার্থনার মাধ্যমে সুভাশীষ গ্রহণ করা হতো। –ইমাম নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ১/৮২৯

৩। ইমাম মিযযী রহ. ইমাম মুসলিম রহ. কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটিকে নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন। তাতে আবূ তাহের মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মাহমিশ রয়েছেন।

وَحَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ – يَعْنِى ابْنَ طَهْمَانَ – عَنِ الْحَجَّاجِ – وَهُوَ ابْنُ حَجَّاجٍ – عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ « وَقْتُ صَلاَةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

–সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৪২০

ইমাম মিযযী রহ. এর নিজস্ব সনদে বর্ণিত হাদীসটি হলো,

أخبرنا أبو الخطاب عُمَر بن مُحَمَّد بن أَبِي سعد بن أَبِي عصرون التميمي، قال أنبأنا المؤيد بن مُحَمَّد بن علي الطوسي، قال: أخبرنا عبد الجبار بن مُحَمَّد الخواري، قال: أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، قال: أخبرنا أبو طاهر مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بن محمش الفقيه، قال: أخبرنا أبو بكر مُحَمَّد بن الحسين القطان، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حَدَّثَنَا عُمَر ابن عَبد الله بن رزين، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج ابن أرطاة، عن قتادة، عَن أبي أيوب، عن عَبد الله بن عَمْرو قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، فقال: "وقت صلاة الفجر مالم يطلع قرن الشمس الاول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء مالم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس ويسقط قرنها الاول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس مالم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل.

–ইমাম ইউসুফ মিযযী, তাহযীবুল কামাল ২১/৪১১

৪। আবূ আব্দুল্লাহ হামিদ ইবনে আহমদ বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমিশ ইবনে আলী ইবনে দাউদ আবূ তাহের যিয়াদী একজন বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন। তিনি নাইসাবুরের যিয়াদ ইবনে আব্দুর রাহমান এর প্রান্তরে বসবাস করতেন। এজন্য তাঁকে যিয়াদী নামে অভিহিত করা হয়। তিনি আবূ হামিদ বিন বিলাল, মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন কাত্তান, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়া'কুব ইবনে কিরমানী, আব্বাস বিন কুহিয়ার, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান মুহাম্মাদাবাযী, আবূ উসমান আমর ইবনে আব্দুল্লাহ বাসারী, আবূ আলী মাইদানী, হাজিব ইবনে আহমদ তুসী, আলী ইবনে হামশায (আলআনসাব (হিম্মিশায, মিরআতুল জিনান), মুহাম্মাদ ইবনে ইয়া'কুব আসাম্ম, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাফফার থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে হাকেম আবূ আব্দুল্লাহ–তাঁর থেকে অগ্রগামী হওয়া সত্ত্বেও–, আবূ বকর বাইহাকী, আবুল কাসেম কুশাইরী, আব্দুল জাব্বার ইবনে বারযাহ, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ শামাতী, কাসেম বিন ফযল সাকাফী, আবূ সা'দ ইবনে রামিশ, উসমান বিন মুহাম্মাদ মাহমী, আবূ বকর ইবনে ইয়াহইয়া মুযাক্কী, আলী ইবনে আহমদ ওয়াহিদী, আহমদ বিন খালাফ, আবূ সালেহ মুয়াজ্জিন হাদীস বর্ণনা করেছেন। আব্দুল গাফির বলেন, তিনি সর্বসম্মতিক্রমে খুরাসানের হাদীস বিশারদদের অবিসংবাদিত ইমাম, ফকীহ এবং মুফতী ছিলেন।

ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, তিনি একজন সাহিত্যিক এবং শাফী মাসলাকের ফকীহ। আবূ তাহের ৩১৭ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি খুরাসানের হাদীস বিশারদদের অবিসংবাদিত ইমাম, ফকীহ এবং মুফতী ছিলেন। তিনি শুরুত বিদ্যায় (আদালতের রায় লিপিবদ্ধ করণ সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞানকে ইলমুশ শুরুত বলা হয়-হাজী খলীফা, কাশফুজ জুনূন ২/১০৪৬) গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি গ্রন্থও রচনা করেন। আরবী

ভাষা জ্ঞানে তাঁর ঈর্ষণীয় দক্ষতা ছিল। আব্দুল গাফির ইবনে ইসমাঈল বলেন, যদি তিনি অভাবগ্রস্থ না হতেন তবে তাঁর সমকালীন কেউ তাঁর অগ্রগামী হতে পারতো না। তিনি ৪১০ হিজরী সনের শা'বান মাসে ইহধাম ত্যাগ করেন। শুয়ূখুল বাইহাকী ফিস সুনানিল কুবরা ১/৬০

৫। খাইরুদ্দীন যিরিকলী বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমিশ আবূ তাহের যিয়াদী তাঁর সময়ে নাইসাবুরে বিশিষ্ট ফকীহ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। শুরুত বিদ্যায় তাঁর গ্রন্থও রয়েছে। আলআ'লাম ৭/২১

৬। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমিশ আবূ তাহের যিয়াদী শাফিয়ী মাসলাকের একজন বিশিষ্ট ফকীহ, নাইসাবুরের বিশিষ্ট আলেম এবং সনদসহ হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি ৩১৭ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩২৫ হিজরীতে আবূ হামিদ ইবনে বিলাল, মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন কাত্তান, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়া'কুব কিরমানী প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি হাদীস লেখান এবং পাঠদান করেন। তিনি অল্পেতুষ্ট এবং সচ্চরিত্র ছিলেন। শুরুতবিদ্যায় তাঁর রচনা রয়েছে। তিনি শা'বান মাসে ইন্তেকাল করেন। হাকেম জৈষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। আলইবার ফী আখবারি মান গাবার ১/১৮৩

৭। ইমাম যাহাবী রহ. আরো বলেন, নাইসাবুরের মুসনিদ আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমিশ আবূ তাহের যিয়াদী ৪১০ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। তাযকিরাতুল হুফফাজ ৩/১০৫১

৮। মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমিশ আবূ তাহের যিয়াদীকে মুহাদ্দিসীনে কেরামের শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ যাহাবী, আলমুঈন ফী তাবাকাতিল মুহাদ্দিসীন ১/৩২

৯। ইবনে নাসিরুদ্দীন দিমাশকী বলেন, ইবনে মাহমিশ যিয়াদী হলো, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমিশ আবূ তাহের যিয়াদী। তিনি আবূ হামিদ আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে বিলাল, আবূ মুহাম্মাদ আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হিশাম বালাযুরী প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এবং তাঁর থেকে আবূ সালেহ আহমদ ইবনে আব্দুল মালেক মুয়াজ্জিন, আবুল কাসেম কুশাইরী এবং আবুল হাসান ওয়াহিদী প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন। তাওযীহুল মুশতাবিহ ফী যাবতি আসমাইর রুওয়াতি ওয়া আনসাবিহীম ওয়া আলকাবিহিম ওয়া কুনাহুম ৪/১৮৬

১০। ইমাম সুবকী রহ. বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমিশ আবূ তাহের যিয়াদী তাঁর সময়ে নাইসাবুরে ফকীহ এবং মুহাদ্দীসদের ইমাম ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক ছিলেন এবং আরবী ভাষা জ্ঞানে গভীর পণ্ডিত ছিলেন। নাইসাবুর শহরে ফুকাহায়ে কেরাম তাঁর কাছে ফতওয়া

পেশ করতেন। শুরুত বিদ্যায় তাঁর সবিশেষ দক্ষতা ছিল। এ বিষয়ে তিনি গ্রন্থও রচনা করেছেন। এতদ সত্ত্বেও তিনি নিম্নবিত্ত ছিলেন। তিনি একাধারে তিন বছর শ্রুতি লেখানোর মজলিস করেন। তিনি ৩১৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৩২৫ হিজরী সনে হাদীস শ্রবণ শুরু করেন এবং ৩২৮ হিজরী সনে ফিকহ শিক্ষা শুরু করেন। তিনি আবূ হামিদ বিন বিলাল, মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন কাত্তান, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়া'কুব ইবনে কিরমানী, আব্বাস বিন কুহিয়ার, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান মুহাম্মাদাবাযী, আবূ উসমান আমর ইবনে আব্দুল্লাহ বাসারী, আবূ আলী মাইদানী, হাজিব ইবনে আহমদ তুসী, আলী ইবনে হামশায (আলআনসাব (হিম্মিশায, মিরআতুল জিনান), আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনে ইয়া'কুব আসাম্ম, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাফফার থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে হাকেম আবূ আব্দুল্লাহ হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাঁর তারিখ গ্রন্থে তাঁর আলোচনা করেন এবং তিনি তাঁর আগেই ইন্তেকাল করেন। তাছাড়া আবূ বকর বাইহাকী, আবূ সালেহ মুয়াজ্জিন, উস্তাদ আবুল কাসেম কুশাইরী, আব্দুল জাব্বার ইবনে বারযাহ, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ সামানী, আলী ইবনে আহমদ ওয়াহিদী, আবূ সা'দ বিন রামিশ, আবূ বকর ইবনে ইয়াহইয়া মুযাক্কী, কাসেম বিন ফযল সাকাফীও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আরো অনেকে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাদের তালিকা বেশ দীর্ঘ। তিনি ফিকহ শিখেছেন আবুল ওয়ালীদ এবং আবূ সাহল থেকে। এবং তাঁর থেকে ফিকহ শিখেছেন আসিম ইবাদী প্রমুখ।...তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আলকুবরা ৪/১০৪

১১। ইমাম যাহাবী রহ. আরো বলেন, আবূ তাহের মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমিশ ইবনে আলী ইবনে দাউদ একজন বিশিষ্ট ফকীহ, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, আল্লামা, খুরাসানের শায়খ এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি মায়দানে যিয়াদ ইবনে আব্দুর রহমান মহল্লায় থাকতেন। এজন্য তাঁকে যিয়াদী সম্বন্ধ নামে সম্বধোন করা হয়। তাঁর পিতা আবেদ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আবূ তাহের ৩১৭ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তাঁকে ৩২৫ হিজরী সনে হাদীস শোনান। তিনি আবূ হামিদ বিন বিলাল, মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন কাত্তান, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়া'কুব ইবনে কিরমানী, আব্বাস ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে কুহিয়ার, আবূ উসমান আমর ইবনে আব্দুল্লাহ বাসারী, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান মুহাম্মাদাবাযী, মুহাম্মাদ ইবনে উমার ইবনে হাফস জুরজিরী, আব্দূস ইবনে হুসাইন, আবুল আব্বাস আসাম্ম, আবূ আলী মাইদানী, হাজিব ইবনে আহমদ তুসী, আলী ইবনে হামশায (আলআনসাব (হিম্মিশায, মিরআতুল জিনান), মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাফফার প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি মাজহাবের ইমাম ছিলেন। এবং শুরুত

বিদ্যায় গভীর পাণ্ডিত্বের অধিকারী ছিলেন। (আদালতের রায় লিপিবদ্ধ করণ সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞানকে ইলমুশ শুরুত বলা হয়-হাজী খলীফা, কাশফুজ জুনূন ২/১০৪৬) এ বিষয়ে তাঁর রচনাও রয়েছে। তিনি আরবী ভাষা জ্ঞানে সুদক্ষ ছিলেন। তিনি হাদীস বেত্তা, সনদসহ হাদীস বর্ণনাকারী এবং মুফতীদের ইমাম ছিলেন। আব্দুল গাফির ইবনে ইসমাঈল বলেন, প্রায় তিন বছর যাবত তিনি শ্রুতি লিখনের পাঠ দান করেন। যদি তিনি অভাবগ্রস্থ না হতেন এবং অনুলিপি তৈরির পেশা গ্রহণ না করতেন তবে তাঁর সমকালীন কেউ তাঁর অগ্রগামী হতে পারতো না।

তাঁর থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমাম জাদ্দী (আমার দাদা), আবূ সা'দ বিন রামিশ, উসমান বিন মুহাম্মাদ মাহমী, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া মুযাক্কী, আবূ সালেহ মুয়াজ্জিন, আবূ বকর ইবনে খালাফ, মুফাসসির আলী ইবনে আহমদ ওয়াহিদী। আমি বলি, এবং আবূ বকর বাইহাকী, আব্দুল জাব্বার ইবনে বুরযাহ (তাবসীরুল মুনতাবিহ ১/৭৪), মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ শামাতী (আলআনসাব), কাসেম বিন ফযল সাকাফীও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর সমসাময়িকদের থেকে (আবূ আব্দুল্লাহ) হাকেম ইবনুল বাইয়ি' (নাইসাবুরী) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৪১০ হিজরী সনের শা'বান মাসে ইন্তেকাল করেন। রাহিমাহুল্লাহু (আল্লাহ তাঁর উপর অনুগ্রহ করুন)। –সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৭/২৭৬/১৬৯

এছাড়াও আলআনসাব, আলওয়াফী বিল ওয়াফাইয়াত, তাবাকাতুশ শাফিইয়াহ লিল ইসনাভী, তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ লিইবনে কাযী শাহবাহ, তাবসিরাতুল মুনতাবিহসহ অন্যান্য জীবনী গ্রন্থেও আবূ তাহের মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমিশ ইবনে আলী ইবনে দাউদ রহ. এর জীবনী আলোচিত হয়েছে।

এখন সচেতন এবং বহুমুখী অধ্যয়নপ্রবণ উলামায়ে কেরাম এ জাজমেন্টের ফয়সালা দিন, আলোচিত দু'জন রাবী কি করে অপরিচিত হয়? এবং কি কারণে হাদীসটি দুর্বল হয়ে যায়? হাদীস শাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম যাহাবীর মত প্রতিভাধর ব্যক্তি সত্তা যখন তাঁর তাজকিরাতুল হুফফাজ এবং সিয়ারু আ'লামিন নুবালা এর মতো জগতখ্যাত গ্রন্থদ্বয়ে রাবীদ্বয়কে স্থান দিলেন এবং তাদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন তখন তারা কি করে অপরিচিত থেকে যান তা অনুধাবন করতে বড় কষ্ট হয়।

লেখকের আপত্তি ৬

লেখক মহোদয় ৩০ নম্বর পৃষ্ঠায় চতুর্থ যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন সূত্রসহ সে হাদীসটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

> عبد الرزاق عن داود بن قيس وغيره عن مُحَّمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر.
>
> অর্থ: সাইব ইবনে ইয়াযীদ রাযি. থেকে বর্ণিত, উমর রাযি. উবাই বিন কা'ব এবং তামীম দারী রাযি. এর পেছনে লোকদিগকে একুশ রাক'আত নামায পড়ার জন্য একত্রিত করেছিলেন। তাঁরা শত আয়াত বিশিষ্ট সূরা পাঠ করতেন এবং সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার সময় মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতেন। –মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক; হাদীস ৭৭৩০

হাদীসটি সম্বন্ধে 'তাহক্বীক্ব' শিরোনামে লেখকের মন্তব্য হলো,

> তাহক্বীক্ব: এই বর্ণনাটি শুধু মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকে বর্ণিত হয়েছে। এটি মুনকার হিসাবে যঈফ। আব্দুর রাযযাক (১২৬-২১১ হিঃ) এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। এই শব্দে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। ছহীহ শব্দ হবে **১১** রাক'আত। –শায়খ আব্দুর রহমান মুবারাকপুরী বলেন,
>
> قد انفرد هو بإخراج هذا الأثر بهذا اللفظ ولم يخرجه به أحد غيره فيما أعلم .تحفة الأحوذي لمحمد المباركفوري – ٦٠/٧
>
> 'আছারটি তিনি এই শব্দে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। অন্য কেউ এভাবে বর্ণনা করেননি'। এর কারণ হ'ল, তিনি শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্ণনাগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে। যেমন উবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, 'তিনি শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে বর্ণনাগুলো মিশ্রিত হয়ে গেছে। এছাড়া এর সম্পূর্ণ সনদ নেই, মাঝে রাবী বাদ পড়ে গেছে। সর্বোপরি এটি ছহীহ সনদে বর্ণিত (প্রথম অধ্যায়ে ৫ নং) হাদীছের সম্পূর্ণ বিরোধী। যেখানে **১১** রাক'আতের কথা বলা হয়েছে। অতএব দলীল হিসাবে এই ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা পেশ করা উচিত নয়।'

পর্যালোচনা

লেখক মহোদয় বলেছেন 'এটি মুনকার হিসাবে যঈফ।' কথাগুলোকে 'কপি' করা বলে মনে হয়। হাদীস শাস্ত্র বেশ জটিলতাপূর্ণ একটি শাস্ত্র। এখানে যে যত বেশি দ্রুততার পরিচয় দিয়েছে সে তত বেশি পদস্খলনের শিকার হয়েছে। ইমাম সান'আনী হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন বলে হাদীসটি মুনকার হয়ে গেল? মুনকার হওয়া কি এত সহজ? হাদীস শাস্ত্র মতে কেউ এককভাবে হাদীস বর্ণনা করলেই কি তা মুনকার হয়ে যায়? সহীহ বুখারীর সব হাদীসই কি একাধিক সূত্রে বর্ণিত? তবে কি হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য একাধিক সূত্রবদ্ধ হওয়া আবশ্যক? মুনকার এর সংজ্ঞা এবং এর প্রকারভেদ নিয়ে আমরা পেছনে আলোচনা করেছি। তাতে কি এ হাদীসটি মুনকারের আওতায় পড়ে? আপনাদের আট রাক'আত সমৃদ্ধ দলীলগুলোর দিকে একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। সেখানে কোনোটিতে আট রাক'আতের কথা, কোনোটিতে এগারো রাক'আতের কথা আবার কোনোটিতে তের রাক'আতের কথা এসেছে। তো সবগুলো বর্ণনারই কি একাধিক সূত্র রয়েছে? না থাকলে সেগুলোও কি আপনার থিউরী মতে 'মুনকার হিসেবে যঈফ' হয়ে যাবে না? এ জাতীয় আরো অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর মাথায় রেখে কোনো হাদীসকে 'মুনকার' বলা খুবই জরুরী। নতুবা বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী।

এরপর লেখক আল্লামা মুবারকপুরী রহ. এর একটি উক্তি উল্লেখ করে হাদীসটি যঈফ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, 'এর কারণ হ'ল, তিনি শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্ণনাগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে।'

আরবীতে একটি প্রবাদ আছে حفظت شيئا وغابت عنك الاشياء। সামান্য কিছু আত্মস্থ করেছো। কিন্তু অনেক কিছুই তোমার অগোচরে রয়ে গেছে। আমার মনে হয় এখানে আরবী এ প্রবচনটির প্রকৃষ্ট প্রয়োগ হয়েছে। ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সানআনী শেষ জীবনে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলে ছিলেন এটা ইতিহাস স্বীকৃত কথা। কিন্তু তাঁর অন্ধত্বের কারণে তাঁর কোন বর্ণনাগুলো গৃহীত হবে আর কোনগুলো গৃহীত হবে না তার তো সীমা রেখা রয়েছে। এক্ষেত্রে যদি কোনো সীমা রেখাকে স্বীকার করা না হয় তবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ 'কুতুবে সিত্তাহ' এর অসংখ্য হাদীস পরিত্যাক্ত বলে সাব্যস্ত হবে। শুধু সহীহ বুখারীতেই ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম সূত্রে ১২০টির মতো হাদীস রয়েছে। এ হাদীসগুলোর কি অবস্থা হবে যদি সীমা রেখা না মানা হয়। এটা রিজাল শাস্ত্রের স্বীকৃত বাস্তবতা যে, তিনি দুই শতাব্দির পর যেসব হাদীস তাঁর রচিত হাদীস গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করেন নি সেসব হাদীস অনিরাপদ রয়ে গেছে। এসব হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু যেসব হাদীস তিনি তাঁর কিতাব থেকে বর্ণনা করেছেন কিংবা দুই শতাব্দির

পূর্বে বর্ণনা করেছেন সে সব হাদীসে কোনো ধরনের বিকৃতি সাধিত হয়নি। এবার এ সম্বন্ধে হাদীস শাস্ত্রবিদদের কিছু উক্তি লক্ষ্য করুন:

১। ইমাম বুখারী রহ. বলেন,

> আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম দুই শত এগার শতকে ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি তাঁর কিতাব থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তা অত্যধিক বিশুদ্ধ পর্যায়ের হাদীস। –ইমাম বুখারী, আত্তারীখুল কাবীর ৬/১৩০, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/৫৭১

২। ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. বলেন,

> আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম নিজ স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করে যখন হাদীস বর্ণনা করেছেন তখন ভুল করেছেন। –ইমাম ইবনে হিব্বান, আসসিকাত ৮/৪১২

৩। ইমাম নাসায়ী রহ. বলেন,

> যেসব বর্ণনাকারী আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম এর শেষ জীবনে তাঁর থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের হাদীসে সমস্যা রয়েছে। –ইমাম নাসায়ী, কিতাবুয যুআফা ওয়াল মাতরুকীন ১/২০৯, ইবনুল কাইয়াল, আলকাওয়াকিবুন নাইয়িরাত ফী মা'রিফাতিম মিনার রুওয়াতিস সিকাত ১/৫১

৪। আহমদ বিন শাব্বুইয়াহ রহ. বলেন,

> এসব বর্ণনাকারীগণ আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম রহ. এর দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার পর তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁকে হাদীস বর্ণনা করতে বলা হতো। আর তিনি হাদীস বর্ণনা করতে থাকতেন। অথচ সেসব হাদীস তাঁর রচিত গ্রন্থে বিদ্যমান ছিল না। তারা অনেক হাদীস তাঁর থেকে সূত্রসহ বর্ণনা করেছেন যেগুলো তাঁর কিতাবে ছিল না। ইমাম আহমদ রহ. থেকেও বর্ণিত আছে, যারা তাঁর দৃষ্টি শক্তি লোপ পাওয়ার পর তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে তারা দুর্বল শ্রবণ শক্তির অধিকারী। –ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল ১৮/৫৭, ইবনুল কাইয়াল, আলকাওয়াকিবুন নাইয়িরাত ফী মা'রিফাতিম মিনার রুওয়াতিস সিকাত ১/২৬৯

৫। ইমাম সাফাদী রহ. বলেন,

> যে ব্যক্তি আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম থেকে তাঁর সূত্রে শুনে লিপিবদ্ধ করে নি তার হাদীসের মাঝে সমস্যা আছে। আর যে ব্যক্তি তাঁর শেষ জীবনে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি তাঁর সূত্রে অনেক 'মুনকার' হাদীস বর্ণনা করেছেন। –ইমাম সাফাদী, আলওয়াফী বিল ওয়াফাইয়াত ৬/১৫০

৬। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. বলেন,

> যে ব্যক্তি আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম সূত্রে তাঁর গ্রন্থসমূহ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছে সেগুলো সবচাইতে বিশুদ্ধতম হাদীস। তিনি বলেন, আমরা আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম রহ. এর কাছে এসেছি দুই শতাব্দির পূর্বে। আর তখন তাঁর দৃষ্টি শক্তি ভাল ছিল। –ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল ১৮/৫৮

৭। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

> আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম দুই শতাব্দি পর হাদীস বর্ণনা করতে বলা হলে হাদীস বর্ণনা করতেন। সুতরাং যে ব্যক্তি দুই শতাব্দি পর তার থেকে হাদীস শ্রবণ করেছে সেগুলো কোনো হাদীসই নয়। –ইমাম যাহাবী, মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়া হুয়া মুয়াস্‌সাকুন আউ সালিহুল হাদীস ১/২৩০

৮। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন,

> আমি আব্দুর রাজ্জাক সূত্রে একমাত্র তাঁর কিতাব থেকেই হাদীস বর্ণনা করেছি। শুধু এতটুকুই নয়; আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি একমাত্র তাঁর কিতাব থেকেই হাদীস বর্ণনা করেছি। –ইবনে রজব হাম্বলী, শারহু ইলালিত তিরমিযী ২/১৯৬

৯। ইবনে হানী সূত্রে বর্ণিত, আহমদ রহ. বলেন,

> আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মামের দৃষ্টি শক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ভাল থাকা অবস্থায় ইবনে শাকীক তাঁর থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন। তাই অন্যদের তুলনায় ইবনে শাকীক বর্ণিত হাদীস বেশি বিশুদ্ধ। ইবনে রাজাব হাম্বলী, শারহু ইলালিত তিরমিযী ২/১৯৬

আর সংশ্লিষ্ট হাদীসটি আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম রহ. এর কিতাবেরই হাদীস। সুতরাং তাঁর অন্ধত্বের কারণে এ হাদীস ক্রটিযুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এবং এ হাদীস 'এলোমেলো' হয়ে যাওয়ারও কোনো সুযোগ নেই।

লেখকের আপত্তি ৭

লেখক মহোদয় ৩১ নম্বর পৃষ্ঠার ৩১ নম্বর টিকায় ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর নিম্নোক্ত আরবী পাঠ উল্লেখ করেছেন

عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع .تقريب التهذيب لأحمد العسقلاني – ٩٧/٢

আর মূল লেখায় আরবী পাঠের অর্থ করেছেন, 'তিনি শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে বর্ণনাগুলো মিশ্রিত হয়ে গেছে'।

পর্যালোচনা

আমাদের বুঝতে কষ্ট হচ্ছে, তিনি কি পূর্ণ আরবী পাঠের অনুবাদ করেছেন না আংশিক পাঠের অনুবাদ করেছেন? যদি আংশিক আরবী পাঠের অনুবাদ করে থাকেন তাহলে অনুবাদ না করা আরবী পাঠটুকুর উদ্ধৃতি কেন দিলেন? আর যদি পূর্ণ আরবী পাঠের অনুবাদ করে থাকেন ('মিশ্রিত হয়ে গেছে' অনুবাদ দেখে আমার প্রবল ধারণা হচ্ছে, তিনি পূর্ণ আরবী পাঠেরই অনুবাদ করেছেন।) তাহলে তো লেখকের আরবী ভাষা জ্ঞান এবং ইতিহাস জ্ঞানের ব্যাপারে তুমুল সংশয় সৃষ্টি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

লেখকের আপত্তি ৮

লেখক মহোদয় তার পুস্তিকার ৩১ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেন, 'এছাড়া এর সম্পূর্ণ সনদ নেই, মাঝে রাবী বাদ পড়ে গেছে।'

পর্যালোচনা

আমরা বলি, কি করে অসম্পূর্ণ সনদ হলো? আর কোন রাবী বাদ পড়ে গেছে? এরকম অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট কথা বললে কেমনে হবে? লেখক মহোদয়ের তো উচিৎ ছিল দীনের স্বার্থে কোন জায়গায় রাবী বাদ পড়েছে এবং কিভাবে রাবী বাদ পড়েছে ইত্যকার বিষয়গুলো উল্লেখ করা।

এবার রিজাল শাস্ত্রের আলোকে দেখতে চেষ্টা করি সংশ্লিষ্ট হাদীসের সনদটি অসম্পূর্ণ কি না এবং মাঝ থেকে কোনো রাবী বাদ পড়েছে কি না? সংশ্লিষ্ট সনদে উমর রাযি.সহ মোট পাঁচ জন রাবী রয়েছে:

(১) আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম।

(২) দাউদ ইবনে কাইস।

(৩) মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ।

(৪) সাঈব ইবনে ইয়াযীদ।

(৫) হযরত উমর রাযি.।

১। সাঈব ইবনে ইয়াযীদ রাযি. উমর রাযি. থেকে হাদীস শুনে বর্ণনা করেছেন। তাদের সূত্রে বর্ণিত হাদীস সহীহ বুখারী এবং সুনানে নাসায়ীতে রয়েছে। তিনি আশি-নব্বই দশক হিজরীর দিকে ইন্তেকাল করেন। আর উমর রাযি. ২৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। –ইমাম যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৩/৪৩, ইবনে হাজার আসকালানী, আলইসাবা ফী তামইযীস সাহাবাহ ৩/২৭, ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল ১০/১৯৪

২। মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সাঈব ইবনে ইয়াযীদ থেকে হাদীস শুনে বর্ণনা করেছেন। তাদের সূত্রে বর্ণিত হাদীস সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং সুনানে নাসায়ীতে রয়েছে। –ইমাম ইবনে হিব্বান, আসসিকাত ৭/৪৩৩, ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল ২৭/৪৯

৩। দাউদ ইবনে কাইস মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ থেকে হাদীস শুনে বর্ণনা করেছেন। তিনি খলীফা মানসূরের রাজত্ব কালে (১৩৬-১৫৮ হি.) ইন্তেকাল করেন। –ইমাম ইবনে হিব্বান, আসসিকাত ৬/২৮৮,৭/১৭৪, ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল ২৭/৪৯, ৮/৪৩৯, আলফাখরী ফিল আদাবিস সুলতানিয়্যাহ ১/৫৮,৬৫

৪। আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম দাউদ ইবনে কাইস থেকে হাদীস শুনে বর্ণনা করেছেন। –ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল ১৮/৫২

সংশ্লিষ্ট সনদের সব রাবী একজন আরেক জন থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাহলে মাঝ থেকে কোন রাবী বাদ পড়ল?

লেখক সংশ্লিষ্ট হাদীসের তাহকীকী আলোচনা শেষে বলেন, 'অতএব দলীল হিসাবে এই ক্রটিপূর্ণ বর্ণনা পেশ করা উচিৎ নয়।'

লেখকের এ কথাটিতে আমি ব্যক্তিগতভাবে বেশ পুলক অনুভব করছি। এখন আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, লেখকের সুন্দর একটি ভারসাম্যপূর্ণ হৃদয় আছে। যদিও তাঁর এতক্ষণের আলোচনায় বিষয়টি উপলব্ধি করতে কষ্ট হচ্ছিল। এতক্ষণ লেখক সম্বন্ধে বিষম রকমের বিরূপ ধারণায় আক্রান্ত ছিলাম। মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। কিন্তু ভাষার ব্যবহার কিংবা উপস্থাপনা শৈলীতে এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত সীমাবদ্ধতা থাকা উচিৎ নয়। ভাষা মার্জিত হওয়া এবং শালীন হওয়া নববী আদর্শও বটে। এখন আমরা যদি নববী আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে সেই আদর্শই বিসর্জন দিয়ে ফেলি তাহলে তো ভূত তাড়ানোর সর্ষেতেই ভূত রয়ে গেল। আল্লাহ আমাদেরকে শালীন এবং মার্জিত ভাষা ব্যবহার করার সুমতি দান করুন। এখানে লেখক সংশ্লিষ্ট হাদীসটিকে 'দলীল হিসেবে ক্রটিপূর্ণ' বললেও আদৌ তা ক্রটিপূর্ণ কি না বা তাঁর 'ক্রটিপূর্ণ' কথাটিই ক্রটিপূর্ণ কি না তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

লেখকের আপত্তি ৯

লেখক মহোদয় তাঁর পুস্তিকার ৩১ নম্বর পৃষ্ঠায় পঞ্চম নম্বরে যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তার আরবী পাঠ নিম্নরূপঃ

> عبد الرزاق عن الأسلمي عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن السائب بن يزيد قال كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر وكان القيام على عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة
>
> অর্থঃ সাঈব ইবনে ইয়াযীদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা উমর রাযি. এর যুগে নামায থেকে ফিরে আসতাম যখন সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসতো। আর উমর রাযি. এর যুগে নামায ছিল ২৩ রাক'আত।

লেখক সংশ্লিষ্ট হাদীসটি সম্বন্ধে 'তাহকীক্ব' শিরোনামে বলেন,

> তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি শুধু আবদুর রাযযাক এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আছারটি যঈফ ও মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য। উক্ত আছারে আবূ যুবাব নামে একজন মুনকার রাবী আছে। আবূ হাতেম তাঁর 'আলজারহু ওয়াত তা'দীল' গ্রন্থে এর সম্পর্কে বলেন, 'দারাওয়ারদী তার থেকে প্রচুর মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন; তার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল ছিল। ইবনে হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ/৯৯৪-১০৬৩ খৃঃ) বলেন, 'সে যঈফ রাবী'। ইমাম মালেক (রহঃ) তার থেকে কোন হাদীছ গ্রহণ করেননি। এজন্য শায়খ আলবানী বলেন, 'এর সনদ যঈফ। কারণ ইবনে আবূ যুবাবের মধ্যে দুর্বলতা আছে'। তাছাড়া প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত (৪নং) ছহীহ হাদীছের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং ১১ রাক'আতের সকল ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী।'

পর্যালোচনা

(ক) লেখক বলেছেন, 'বর্ণনাটি শুধু আব্দুর রাযযাক এককভাবে বর্ণনা করেছেন।' প্রশ্ন হলো, আব্দুর রাজ্জাক এককভাবে হাদীস বর্ণনা করলে কি তা সমস্যাপূর্ণ হয়ে যাবে? কোন ধরনের একক বর্ণনা সমস্যাপূর্ণ হবে এবং কোন ধরনের রাবীর একক বর্ণনা সমস্যাপূর্ণ হবে তা নির্ণয়ে কি কোনো নীতিমালা নেই? ঢালাও এবং একচেটিয়াভাবে সব রকমের একক বর্ণনাকে সমস্যাপূর্ণ কিংবা যঈফ মনে করা তো নিতান্তই একরৈখিক অধ্যয়নের চূড়ান্ত পরিণতি। তাছাড়া হাদীসটি একক বর্ণনা কি করে হয়? ইবনে আবূ শাইবা তো অন্য একটি সূত্রে তেইশ রাক'আত তারাবীহর কথা বর্ণনা করেছেন। দেখুন বর্ণনাটিঃ

> حدثنا بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال أدركت الناس وهم يصلون ثلاثة وعشرين ركعة بالوتر.
>
> অর্থঃ আতা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মানুষকে দেখতে পেয়েছি, তারা বিতরসহ তেইশ রাক'আত নামায পড়ে। –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ৭৬৮৮

(খ) লেখক বলেছেন, 'আছারটি যঈফ ও মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য। উক্ত আছারে আবূ যুবাব নামে একজন মুনকার রাবী আছে।'

প্রশ্ন হলো, হাদীসটির সূত্রের মাঝে কি আবূ যুবাব নামে কোনো রাবী আছে? রাবীর নাম তো হারিস ইবনে আব্দুর রাহমান ইবনে আবূ যুবাব। তো সেখানে প্রশিদ্ধি হিসেবে ইবনে আবূ যুবাব বলা যেতে পারে। কিন্তু তা না করে শুধু আবূ যুবাব বললে তো চরম পর্যায়ের প্রমাদ হয়ে যায়। রিজাল শাস্ত্রে এ জাতীয় ভুলকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু লেখক পরবর্তীতে শায়খ আলবানী রহ. এর উক্তি উল্লেখ করতে গিয়ে ঠিকই ইবনে আবূ যুবাব উল্লেখ করেছেন। পূর্বেই বলেছি, এজাতীয় বিচ্যুতি ধরে লেখককে তুচ্ছ জ্ঞান করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। লেখকের ভাষাগত উপস্থাপনা এতটা আপত্তিকর যে এধরনের ভুল ধরে দিয়ে লেখককে বিনীত স্বরে অবগত করতে চাই যে, হযরত! নিজের ভিতর ইতিহাসগত, শাস্ত্রগত এত খাদ রেখে এমন অমার্জিত ভাষায় কথা বলা বা লেখালেখি করা উচিৎ নয়। দীনী সেবার তাগিদে খানিকটা হলেও ভারসাম্য রক্ষা করা খুবই প্রয়োজন।

(গ) লেখক বলেন, 'আবূ হাতেম তাঁর 'আলজারহু ওয়াত তা'দীল' গ্রন্থে এর সম্পর্কে বলেন, 'দারাওয়ারদী তার থেকে প্রচুর মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন; তার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল ছিল।'

প্রশ্ন হলো 'আলজারহু ওয়াত তা'দীল' গ্রন্থটি কার? এর রচয়িতা কে? আবূ হাতেম রাযী, না তাঁর ছেলে আব্দুর রহমান ইবনে আবূ হাতেম? আমরা তো জানি, রিজাল শাস্ত্রের এ গ্রন্থের লেখকের নাম আব্দুর রহমান ইবনে আবূ হাতেম। তাছাড়া লেখক মহোদয় গ্রন্থটি থেকে ইবনে আবি যুবাব সম্পর্কিত খণ্ডিত মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। নিম্নে আমরা ইবনে আবূ যুবাব সম্বন্ধে আয়িম্মায়ে কেরামের মন্তব্য তুলে ধরবো। সাথে ইবনে আবূ হাতেম রহ. এর পূর্ণ মন্তব্য বক্তব্যটিও তুলে ধরবো। যাতে গ্রন্থটির মূল লেখক কে এবং সংশ্লিষ্ট রাবী সম্পর্কে সেখানে কি মন্তব্য করা হয়েছে এতদ বিষয়ক একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভ করা যায়।

১। 'আব্দুর রাহমান ইবনে আবি হাতেম বলেন, আমার পিতা ইসহাক বিন মানসূর সূত্রে ইয়াইয়া ইবনে মাঈন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (ইয়াহইয়া

ইবনে মাঈন) বলেন, হারেস ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবূ যুবাব একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব।
আব্দুর রহমান ইবনে আবূ হাতেম আরো বলেন, আমি আমার পিতাকে হারেস ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবূ যুবাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তাঁর সূত্রে দারাওয়ারদী প্রচুর 'মুনকার' হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ততোটা শক্তিশালী নয়। তবে তাঁর হাদীস লেখা বা বর্ণনা করা যাবে। আব্দুর রহমান ইবনে আবূ হাতেম আরো বলেন, আবূ যুরআকে হারিস ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবূ যুবাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন, তিনি মদীনার অধিবাসী। তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণে কোনো সমস্যা নেই। –আব্দুর রহমান ইবনে আবূ হাতেম, আলজারহু ওয়াত তা'দীল ৩/৭৯
২। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, 'আবূ হাতেম হারেস বিন আব্দুর রহমান ইবনে আবূ যুবাব সম্বন্ধে বলেছেন, শক্তিশালী নয়। তাঁর সূত্রে সহীহ মুসলিম, সুনানে নাসায়ী, সুনানে তিরমিযী এবং সুনানে ইবনে মাজাহতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।' অন্যদিকে ইমাম যাহাবী রহ. ইবনে আবূ যুবাবকে তাঁর 'মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়া হুয়া মুওয়াসসাকুন (যেসব রাবীদের ব্যাপারে আপত্তি তোলা হয়েছে অথচ তাঁরা নির্ভরযোগ্য)' গ্রন্থে এনেছেন। –ইমাম যাহাবী, আলকাশিফ ১/৫৯, মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়া হুয়া মুওয়াসসাকুন ১/৬১। অর্থাৎ ইমাম যাহাবী রহ. এর নিকট ইবনে আবূ যুবাব সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য।
৩। ইমাম বুখারী রহ. ইবনে আবূ যুবাব সূত্রে দু'টি হাদীস বর্ণনা করে বলেন, والأول أصح অর্থাৎ প্রথম হাদীসটি বেশি বিশুদ্ধ। –ইমাম বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ২/২৭১
৪। ইমাম হাকেম নাইসাবুরী ইবনে আবূ যুবাব সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন, 'হাদীসটি মুসলিমের শর্ত মতে সহীহ। কারণ তিনি হারিস ইবনে আবূ যুবাব এর মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করেন।' ইমাম যাহাবী রহ. আত-তালখীসে বলেন, 'হাদীসটির ক্ষেত্রে মুসলিমের শর্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে।' –আলমুস্তাদরাক লিলহাকেম মা'আ তা'লীকাতিয যাহাবী ফিত-তালখীস ১/৮৮
আমাদের জানা মতে সহীহ মুসলিমে ইবনে আবূ যুবাব সূত্রে বর্ণিত চারটি হাদীস রয়েছে। হাদীসগুলোর নাম্বার যথাক্রমে ২৩৩৩, ৫৯২৩, ৬৯১৪, ৬৯৮। তন্মধ্য হতে সূত্রসহ একটি হাদীসের আরবী পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ الأَقِطِ وَالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ. صحيح مسلم للنيسابوري– ٦٩/٣

৫। সুনানে ইবনে মাজাহ'তে ইবনে আবূ যুবাব সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে শায়খ আলবানী রহ. সহীহ বলেছেন। –নাসিরুদ্দীন আলবানী, সহীহ ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩৪১৮
শায়খ আলবানী রহ. ইবনে মাজাহতে ইবনে আবূ যুবাব সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি তাঁর 'আসসিলসিলাতুস সহীহাহ'তে উল্লেখ করে বলেন, 'হাদীসটি ইবনে মাজাহ এবং হাকেম হারেস ইবনে আবূ যুবাব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেন, হাদীসটি সহীহ সনদ সম্বলিত। যাহাবী রহ. তাঁর মন্তব্য সমর্থন করেছেন। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীতে হাদীসটির ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন (১০/৮১)। আমার নিকট হাদীসটির সনদ হাসান। কারণ হারেস, সে হলো আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবূ যুবাব। এঁর হাদীস গ্রহণে কোনো সমস্যা নেই। যেমনটি আবূ যুরআহ বলেছেন। –নাসিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ ১/৩৮৫/৩৮৬ (১/৬৭০)
উল্লেখ্য, ইবনে হাজার আসকালানী হাদীসটির ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করলেও হাদীসটি তাঁর মতে হাসান কিংবা সহীহ। কারণ তিনি ফাতহুল বারীর ভূমিকা গ্রন্থ 'হাদইউস সারী'তে স্পষ্ট করে বলেছেন, তিনি এ ব্যাখ্যা গ্রন্থে হাসান পর্যায়ের নিচের হাদীস আনবেন না। যদিও দু এক জায়গায় ব্যতিক্রম হয়েছে।
তেমনিভাবে শায়খ আলবানী রহ. ইবনে আবূ যুবাব সূত্রে বর্ণিত সুনানে তিরমিযীর একটি হাদীসকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। –নাসিরুদ্দীন আলবানী, সহীহু ওয়া যয়ীফু সুনানিত তিরমিযী; হাদীস ৬৩৯
কিন্তু শায়খ আলবানী রহ. তারাবীহ সংক্রান্ত আমাদের আলোচিত এ হাদীসটিকে একমাত্র ইবনে আবূ যুবাবের কারণে যঈফ বলে ফেললেন। কারণ হলো, তাঁর মাঝে স্মৃতিশক্তিগত দুর্বলতা আছে! এটা কি স্ববিরোধিতা? না অন্য কিছু? আহলে হাদীস ভাইয়েরা আমাদের সহযোগিতা করতে পারেন। তবে শায়খ আলবানী রহ. এর শেষ মন্তব্যে প্রমাণিত হয়, তিনি হাদীসটির সূত্রগত দুর্বলতায় সন্তুষ্ট কিংবা পরিতৃপ্ত নন। তিনি আলোচনার শেষ দিকে বলেন,

على أننا لا ندري إذا كان السند بذلك إليه صحيحا فليس كتاب ابن عبد البر في متناول يدنا لنرجع إليه فننظر في سائر سنده إن كان ساقه.

অর্থ: তবে আমি জানি না, ইবনে আবূ যুবাব সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির সনদ সহীহ হলেও যেহেতু ইবনে আব্দুর বার এর কিতাবটি আমাদের হাতের নাগালে নেই তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

> দেয়া যাচ্ছে না। যদি কিতাবটি হাতের নাগালে থাকতো এবং তিনি হাদীসটির সম্পূর্ণ সনদ উল্লেখ করে থাকেন তাহলে সম্পূর্ণ সনদ নিয়ে পর্যালোচনা করে একটি সিদ্ধান্ত দেয়া যেত। –শায়খ মুহাম্মাদ আলবানী, সালাতুত তারাবীহ ১/৬০

শায়খ আলবানী রহ. এর উপরোক্ত মন্তব্যে প্রমাণিত হয়, হাদীসটির মূল সূত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি অবগত ছিলেন না। এবং ইবনে আব্দুল বারর এর 'আত-তামহীদ' গ্রন্থটিও তাঁর হাতের নাগালে ছিল না।

(ঘ) লেখক মহোদয় ৩২ পৃষ্ঠায় মীযানুল ই'তিদালের উদ্ধৃতিতে ইবনে আবূ যুবাব সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ইবনে আবূ যুবাব সম্পর্কিত সবগুলো মন্তব্য উল্লেখ করেননি। এবার দেখুন মীযানুল ই'তিদালের বক্তব্য।

> হারিস ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবূ যুবাবঃ (সহীহ মুসলিম, সুনানে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, সুনানে ইবনে মাজাহতে তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীস রয়েছে।) মাকবুরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে আবূ যুবাব সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য। আবূ হাতেম বলেন, শক্তিশালী নয়। তাঁর সূত্রে দারাওয়ারদী অনেক 'মুনকার' হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাযম বলেন, যঈফ। আবূ যুরআ বলেন, এর ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই। –ইমাম যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল, ১/২৯০

ইবনে আবূ যুবাব সম্বন্ধে ইমাম যাহাবী রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গি কি তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া এখানে ইমাম যাহাবী রহ. শুরুতে এবং শেষে ইবনে আবূ যুবাবের নির্ভরযোগ্য হওয়ার উক্তি এনেছেন। মাঝে দু'জন ইমামের বিরূপ মন্তব্য এনেছেন। এতেও ইবনে আবূ যুবাব সম্বন্ধে ইমাম যাহাবী রহ. এর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি অনুমিত হয়।

আমরা স্বীকার করি, ইমাম আবূ হাতেম রাযী এবং ইমাম ইবনে হাযম রহ. ইবনে আবূ যুবাব সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তবে প্রশ্ন হলো, হাদীস এবং রিজাল শাস্ত্রে যত রাবী রয়েছে তাদের মধ্য হতে কত পার্সেন্ট রাবী 'জারহ-তা'দীল' এর ইমামদের নিকট সার্বিক দিক থেকে ত্রুটিমুক্ত? আল্লাহ এ অধমকে কিছু দিনের জন্য হলেও এ বিষয়ের কিছু কিতাব নেড়ে চেড়ে দেখার সুযোগ দিয়েছিলেন। যদিও সামান্য সে সময়টুকুতে কিছুই আহরণ করতে পারিনি। তবুও সীমিত অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, সাহাবী বাদে সামগ্রিকভাবে সমস্ত ইমামদের বিবেচনায় যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত রাবীদের পার্সেন্টিস নিতান্তই সামান্য। সকল ইমামের সব ত্রুটি যদি গৃহীত হয় তাহলে

সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমকে ডিভাইড করে সহীহুল বুখারী এবং যঈফুল বুখারী, সহীহু মুসলিম এবং যঈফু মসলিম করে দিতে হবে। তখন 'আসাহহুল কুতুব বা'দা কিতাবিল্লাহ' বলে কোনো বাক্যের স্বার্থকতা এবং স্বীকৃতি অবশিষ্ট থাকবে না।

তাছাড়া ইমাম ইবনে হাযম রহ. ইবনে আবূ যুবাবের দুর্বলতার ব্যাপারে কতটা সুনিশ্চিত তাও স্পষ্ট নয়। কারণ, তিনি ইবনে আবূ যুবাবের দুর্বলতার ব্যাপারটি উল্লেখ করেই 'যদি সে সহীহ হতো কিংবা তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীস সহীহ হতো তাহলে এমনটি হতো...' জাতীয় বাক্য জুড়ে দিয়েছেন। দেখুন, আবূ মুহাম্মাদ ইবনে হাযম আন্দালুসী, আলমুহাল্লা বিল আসার ৩/৮২৯, ৪/৬৩০।

(ঙ) লেখক বলেছেন, 'ইমাম মালেক (রহঃ) তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করেননি।' আমরা বলি, ইমাম মালেক রহ. কর্তৃক কারো থেকে হাদীস গ্রহণ না করাটাই কি জারহ বা ত্রুটি? ইমাম মালেক রহ. যাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেন নি তারা সবাই কি মাজরুহ বা ত্রুটিযুক্ত। হাদীস গ্রহণ না করা বা না করতে পারার কি একটিই মাত্র কারণ? আর সেটা যঈফ বা দুর্বল হওয়া?

লেখকের আপত্তি ১০

লেখক মহোদয় পুস্তিকাটির ৩২ নম্বর পৃষ্ঠায় 'অন্যান্যদের নামে উদ্ধৃত ২০ রাক'আতের বর্ণনা:' নামের একটি শিরোনাম তৈরি করেছেন। এ শিরোনামের অধীনে তিনি তারাবীহ সংক্রান্ত চৌদ্দটি আসারে সাহাবা ও তাবিয়ী এনেছেন। এবং সবগুলোকে অপাঙক্তেয় করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। আসারগুলো বিষয়ে লেখক মহোদয়ের তাহকীক এবং বিশ্লেষণকে আমরা আরেকটু বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করবো। লেখক প্রথম যে আসারটি এনেছেন তার সনদসহ আরবী পাঠ ও অর্থানুবাদ নিম্নরূপ:

> حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة
>
> অর্থ: ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী রাযি. সূত্রে বর্ণিত, উমর রাযি. জনৈক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে বিশ রাক'আত নামায আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। –মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা; হাদীস ৭৬৮২

আসারটির তাহকীক শিরোনামে লেখক মহোদয় বলেন,

> তাহক্বীক: বর্ণনাটি শুধু ইবনে আবী শায়বাহ তার 'মুছান্নাফে' এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আছারটি যঈফ ও মুনকার।

আল্লামা নীমাভী হানাফী বলেন, 'ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ওমর রাযি.-এর যুগ পায়নি'। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, 'সে আনাস রাযি. ছাড়া অন্য কোন ছাহাবী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন বলে আমি অবগত নই। শায়খ আলবানী বলেন, 'এর সনদ বিচ্ছিন্ন। ছাহেবে তুহফাহ বলেন, 'এই আছারটির সনদ বিচ্ছিন্ন, ফলে দলীলযোগ্য নয়'। এছাড়াও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী।

পর্যালোচনা

(ক) শুধু একক বর্ণনা বা আলহাদীসুল গারীব হওয়া আসার বা হাদীসের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি নয়। সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ কুতুবে সিত্তায় একক বর্ণনার অসংখ্য হাদীস রয়েছে। সেসব হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে একক বর্ণনা কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। কোনো বর্ণনাকারী যদি এককভাবে হাদীস বর্ণনা করে গ্রহণযোগ্যতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে তবে এক্ষেত্রে নিছক তার একাকিত্ব হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রভাব ফেলতে পারবে না। দেখুন, হাদীস শাস্ত্রের আলহাদীসুল গারীব সংশ্লিষ্ট আলোচনা।

(খ) লেখক বলেছেন 'আছারটি যঈফ ও মুনকার।' যঈফের বহু শ্রেণীভাগ রয়েছে। আর মুনকার শব্দটিও হাদীস শাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ। কোনো কোনো ইমামের পরিভাষায় শব্দটি কোনো আপত্তিকর শব্দ নয়। তারা কোনো কোনো সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রেও মুনকার শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। শ্রদ্ধেয় লেখক কোন ধরনের যঈফ এবং কোন ধরনের মুনকার উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা সুস্পষ্ট না হলেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রতীয়মান হয় তিনি এর দ্বারা পরিত্যাজ্য এবং অপাঙক্তেয় পর্যায়ের যঈফ এবং মুনকার উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কারণ তিনি এবং তাঁর বৃত্তভুক্ত লোকজন যঈফ মুনকারের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ব্যবধানে বিশ্বাসী নন। হাদীস শাস্ত্রের এ জায়গাটিতে এসে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদিতায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এক্ষেত্রে তারা সংখ্যাগুরুদের পথ ছেড়ে সংখ্যালঘুদের শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কিসের ভিত্তিতে তিনি আছারটিকে পরিত্যাজ্য যঈফ এবং মুনকার বলে দিলেন? আমরা স্বীকার করি, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী উমর রাযি. এর যুগ পাননি। কিন্তু ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী এবং উমর রাযি. এর মধ্যকার সূত্রের অনুল্লেখই কি যঈফ এবং মুনকার হওয়ার কারণ? হাদীস শাস্ত্রের সাধারণ পারিভাষিক সংজ্ঞায় দুর্বল পর্যায়ের বর্ণনাকারী গ্রহণযোগ্য হাদীসের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ যে হাদীস বর্ণনা করেন তাই হলো মুনকার হাদীস। –মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম হালাবী, কাফউল আসার ফী মা'রিফাতি উলূমিল আসার ১০,

মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ; পৃষ্ঠা ৪৬, ড. মাহির ফাহল, বুহুসুন ফিল মুসতালাহ; পৃষ্ঠা ৭৭

দেখা যাচ্ছে মুনকার হাদীসের দু'টি আবশ্যিক শর্ত রয়েছে:

(১) বর্ণনাকারী যঈফ বা দুর্বল হবেন।

(২) বর্ণনাটি সহীহ হাদীসের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ হবে।

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী সূত্রে বর্ণিত আলোচিত হাদীসটিতে এ দু'টি শর্তের উপস্থিতি লক্ষ্যগোচর হয় কি না? আসারটির বর্ণনাকারীদের কাউকে কি যু'ফ বা দৌর্বল্য অভিযোগে অভিযুক্ত করার সুযোগ আছে? রিজাল শাস্ত্র সম্বন্ধে সামান্য ধারণা থাকলে আসারটির কোনো রাবী সম্বন্ধে কোনোরূপ অভিযোগ করার দুঃসাহস দেখানোর সুযোগ কারো থাকবে না। অন্যদিকে আসারটিকে সহীহ হাদীসের বিপরীতে দাঁড় করানোরও কোনো সুযোগ নেই। যারা আসারটিকে সহীহ হাদীসের বিপরীতে দাঁড় করাতে চান তাদের সম্পর্কে আমরা বলব, তারা একরৈখিক এবং অগভীর অধ্যয়নের কারণেই এ জাতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। যদি তর্কের খাতিরে সাময়িকের জন্য স্বীকার করে নিই, আসারটি সহীহ হাদীসের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ তবে তো এতে মুনকার হাদীসের আবশ্যিক দু'টি শর্তের একটি পাওয়া গেল; অন্যটি তো পাওয়া গেল না। তো কি করে আসারটিকে মুনকার বলে দেয়া হলো? এমন ঢালাউ সিদ্ধান্ত প্রদান কি ইলমী আমানতের পর্যায়ে পড়ে?

আসারটির ভিতরে যে ব্যাপারটি ঘটেছে সেটা হলো, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী রাযি. কর্তৃক সূত্রের উল্লেখ না করা। যেসব বর্ণনার ক্ষেত্রে এ জাতীয় ব্যাপার ঘটে সেসব বর্ণনাকে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় মুরসাল নামে অভিহিত করা হয়। এবার দেখা যাক মুরসালের ব্যাপারে হাদীস শাস্ত্রবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি কি।

মুরসাল হাদীস বিষয়ক আলোচনা

১। মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম হালাবী রহ. বলেন,

> সাহাবীদের মুরসাল বর্ণনা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। আর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীর মনীষী তথা তাবিয়ী এবং তাবে' তাবিয়ীদের মুরসাল বর্ণনা হানাফী এবং মালিকী মাসলাকমতে গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতানুসারে পাঁচটি শর্তের কোনো একটি শর্ত পাওয়া গেলে তাবিয়ী এবং তাবে' তাবিয়ীদের মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে। শর্তগুলো নিম্নরূপ:
>
> (১) অন্য কোনো বর্ণনাকারী অবিচ্ছিন্ন সূত্রপরম্পরায় হাদীসটি বর্ণনা করেছে।

(২) অন্য কোনো বর্ণনাকারী হাদীসটিকে ইরসালের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছে। এবং উভয়ের শিক্ষক ভিন্ন।

(৩) সাহাবীর উক্তি মুরসাল বর্ণনার সমর্থন করে।

(৪) সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের উক্তি এ বর্ণনার সমর্থন করে।

(৫) মুরসাল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করার ব্যাপারে পরিচিত। –মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম হালাবী, কাফউল আসার ফী মা'রিফাতি উলূমিল আসার; পৃষ্ঠা ১২

২। ইমাম আবূ দাউদ রহ. বলেন,

অতীতে সুফইয়ান সাউরী, মালেক বিন আনাস এবং ইমাম আউযায়ী রহ. এর মত উলামায়ে কেরাম মুরসাল বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করতেন। ইমাম শাফিয়ী রহ. এসে মুরসাল বর্ণনার ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। ইমাম আহমদসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করেন। মুরসাল বর্ণনার বিপরীতে যদি মুসনাদ বর্ণনা বিদ্যমান না থাকে কিংবা না পাওয়া যায় তবে মুরসাল বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা যাবে। তবে মান এবং শক্তিমত্তার দিক থেকে মুরসাল বর্ণনা মুত্তাসিল বর্ণনার সমপর্যায়ের নয়। –রিসালাতু আবি দাউদ ইলা আহলি মাক্কাহ ১/২

৩। তাহের জাযায়েরী রহ. বলেন,

মুরসাল বর্ণনার উপর আমল করা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক এবং প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে ইমাম আহমদ রহ. এর অভিমত। ইমাম নববী, ইবনুল কাইয়্যিম এবং ইবনে কাসীরসহ অনেক মুহাদ্দিস এমনটি বর্ণনা করেছেন। –যফর আহমদ উসমানী, কাওয়াইদ ফী উলূমিল হাদীস, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. কৃত টিকা; পৃষ্ঠা ১৩৪

৪। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত অধিকাংশ হাদীস মুরসাল; মুসনাদ নয়। এ কারণেই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন, তিনটি শাস্ত্রের কোনো সনদ বা সূত্র নেই। অন্য শব্দে এগুলোর কোনো মূলভিত্তি নেই:

(১) তাফসীর শাস্ত্র।

(২) যুদ্ধবিদ্যা।

(৩) কেচ্ছা-কাহিনী।

অর্থাৎ এসব বিষয়ের হাদীস মুরসাল। মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়া এবং পরিত্যাজ্য হওয়ার ব্যাপারে মানুষ প্রচণ্ড রকমের বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ উক্তি হলো, কিছু মুরসাল গ্রহণযোগ্য, কিছু মুরসাল পরিত্যাজ্য এবং কিছু মুরসাল স্থগিত। বর্ণনাকারী সম্বন্ধে যদি জানা যায়, তিনি একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত আর কারো থেকে ইরসাল করেন না তবে তার মুরসাল গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি বর্ণনাকারী সম্বন্ধে জানা যায়, তিনি গ্রহণযোগ্য অগ্রহণযোগ্য সব ধরনের মানুষ থেকে ইরসাল করেন তাহলে তার ইরসাল করা মানে এমন ব্যক্তি থেকে ইরসাল করা যার অবস্থা পরিষ্কার নয়। সুতরাং এ জাতীয় মুরসাল স্থগিত হবে। আর যেসব মুরসাল গ্রহণযোগ্যদের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক হবে তা পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হবে। আর যদি মুরসাল বর্ণনাটি দু'জন বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হয় এবং প্রত্যেকেই অন্যজনের শিক্ষক থেকে জ্ঞানার্জন করে থাকে তবে এটা মুরসাল বর্ণনার সত্যতার প্রমাণ বহন করে। কারণ এ জাতীয় বিষয়ে সাধারণত স্বেচ্ছা মিথ্যা এবং সাদৃশ্যপূর্ণ ভ্রান্তির কল্পনা করা যায় না। কারণ এ ধরনের বিষয়াদি সত্য বলেই পরিগণিত হয়।... –ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ ৪/১১৭ (৯৪/৪৩২), যফর আহমদ উসমানী, কাওয়াইদ ফী উলূমিল হাদীস, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. কৃত টিকা ১৪১

৫। ইমাম যাহেদ কাউসারী রহ. বলেন,

যারা মুরসাল বর্ণনাকে সর্বৈব প্রত্যাখান করেন তারা সুন্নাহর বড় একটি অংশকে প্রত্যাখান করেন। হাফেয আবূ সাঈদ আলায়ী তাঁর জামিউত তাহসীল লি আহকামিল মারাসীল গ্রন্থে মুদাল্লিস রাবীদের বড় একটি তালিকা পেশ করার পর বলেন, 'এসব রাবীদের সবাই সমপর্যায়ের নয় যে তাদের যে কোনো একজন 'থেকে' যোগে যাই বলবে সে ব্যাপারেই স্থগিত নীতি পালন করতে হবে। বরং তাদের মাঝে

শ্রেণীভাগ রয়েছে। তন্মধ্য হতে প্রথম শ্রেণীর বর্ণনাকারী হলো, যারা সামান্য দু একবার ব্যতীরেকে সাধারণত 'তাদলীস' অভিধার সাথে সম্পৃক্ত নন। এ শ্রেণীর রাবীদেরকে 'মুদাল্লিস'দের পর্যায়ভুক্ত করা সমীচীন নয়। যেমন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী, হিশাম ইবনে উরওয়া, মুসা ইবনে উকবাহ। দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনাকারী হলো যাদের 'তাদলীস'কে হাদীসের ইমামগণ সহনীয় দৃষ্টিতে দেখেন এবং তাদের সেসব হাদীসকে তাঁরা তাঁদের 'সহীহ' শিরোনামের হাদীস গ্রন্থে আনয়ন করেন। কারণ তাঁরা- (১) ইমাম পর্যায়ের।

(২) সূত্রসম্পন্ন অন্যান্য বর্ণনার তুলনায় তাঁদের তাদলীস বর্ণনা খুবই কম।

(৩) একমাত্র নির্ভরযোগ্য পর্যায়ের বর্ণনাকারী থেকেই তারা তাদলীস বর্ণনা করে থাকেন।

যথাঃ ইমাম যুহরী, সুলাইমান আ'মাশ, ইবরাহীম নাখায়ী, ইসমাঈল ইবনে আবূ খালেদ, সুলাইমান তাইমী, হুমাইদ তাবীল, হাকাম ইবনে উতবাহ, ইয়াহইয়া ইবনে আবূ কাসীর, ইবনে জুরাইজ, সুফইয়ান সাউরী, সুফইয়ান ইবনে উয়াইনাহ, শারীক, হুশাইম (রিজওয়ানুল্লাহি আলাইহিম) প্রমুখ। সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এসব মনীষী রাবীদের অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অথচ সেখানে স্পষ্টভাবে শ্রবণের বিষয়টি উল্লেখ নেই।' যেমনঃ (ক) মুসা ইবনে উকবাকে ইবনে হিব্বান এবং ইসমাঈলী মুদাল্লিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইসমাঈলী বলেন, কথিত আছে, মুসা ইবনে উকবা যুহরী রহ. থেকে কোনো হাদীস শ্রবণ করেনি। অথচ যুহরী রহ. সূত্রে মুসা ইবনে উকবার বর্ণনা সহীহ বুখারীতে রয়েছে।

(খ) আবান ইবনে উসমানের বর্ণনা তাঁর পিতার সূত্রে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, আবান তাঁর পিতা উসমান থেকে হাদীস শ্রবণ করেনি।

(গ) আবূ তুওয়ালা সূত্রে আবূ ইসহাকের বর্ণনা সহীহ বুখারীতে রয়েছে। ইবনে মারদুইয়া বলেন, আবূ ইসহাক আবূ তুওয়ালা থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি।

(ঘ) ইবনে উমর সূত্রে যুহরা বিন মা'বাদের বর্ণনা সহীহ বুখারীতে রয়েছে। কিন্তু ইবনে আবূ হাতেম রাযী ইবনে উমর সূত্রে যুহরা বিন মা'বাদের বর্ণনার ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করেছেন।

(ঙ) ইমাম আবূ হাতেম বলেন, সুলাইম বিন আমের মিকদাদ বিন আসওয়াদের সাক্ষাৎ লাভ করেননি। অথচ মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ সূত্রে সুলাইম বিন আমেরের বর্ণনা সহীহ মুসলিমে রয়েছে।

(চ) আমের শা'বী আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন বলে ইমাম আহমদ রহ. স্বীকার করেননি। অথচ আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে আমের শা'বীর বর্ণনা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে।

(ছ) আবূ উবায়দা তাঁর পিতা ইবনে মাসউদ থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। অথচ ইবনে মাসউদ সূত্রে আবূ উবায়দার বর্ণনা 'সহীহ' শিরোনামের গ্রন্থগুলোতে রয়েছে।

এ জাতীয় আরো বহু উদাহরণ উপরোল্লিখিত গ্রন্থগুলোসহ অন্যান্য গ্রন্থে তুমি পাবে। তো সূত্রগত বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও উপরোল্লিখিত কারণেই হাদীসগুলো গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। –ইমাম হাযিমী, শুরুতুল আইম্মাতিল খামসাহ ৪১-৫২, যফর আহমদ উসমানী, কাওয়াইদ ফী উলূমিল হাদীস, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. কৃত টিকা; পৃষ্ঠা ১৪২-৪৫

ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, আহমদ ইজলী রহ. বলেছেন শা'বীর মুরসাল সহীহ। তিনি সাধারণত সহীহ বর্ণনা ব্যতিরেকে অন্য বর্ণনার ইরসাল করেন না। –১/৬৩

৬। শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. বলেন,

আমাদের শায়খ কাউসারী রহ. 'ফিকহু আহলিল ইরাক ওয়া হাদীসুহুম' (পৃষ্ঠা৪৭) পুস্তিকায় বলেন, রিজাল শাস্ত্রবিদরা ইবরাহীম নাখায়ী রহ. এর মুরসাল বর্ণনাকে সহীহ বলে গণ্য

করেছেন। বরং ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর মুরসাল বর্ণনাকে তাঁর মুসনাদ বর্ণনার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমনটি ইবনে আব্দুল বার রহ. 'আত-তামহীদ' (১/৩৮) গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেছেন।' তেমনিভাবে ইমাম তাহাবী রহ. 'শারহু মা'আনিল আসারিল মুখতালিফাতিল মা'সূরা' তে (১/১৩৩) এবং ইমাম দারাকুতনী রহ. তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে ইবরাহীম নাখায়ী রহ. এর মুরসাল সহীহ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেছেন। ইমাম ইবনে কাইয়িমিল জাউযিয়া রহ. 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে (৪/৩৯৭) ইবরাহীম নাখায়ী রহ. এর মুরসাল সহীহ হওয়ার ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। –যফর আহমদ উসমানী, কাওয়াইদ ফী উলূমিল হাদীস, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. কৃত টিকা; পৃষ্ঠা ১৫০

৭। ইমাম দারাকুতনী রহ. একটি মুরসাল বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন,

এ বর্ণনাটির মাঝে যদিও 'ইরসাল' রয়েছে কিন্তু ইবরাহীম নাখায়ী রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর সিদ্ধান্ত এবং ফতওয়া সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর এ সব বর্ণনাগুলো তিনি আলকামা, আসওয়াদ এবং আব্দুর রাহমানের মত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর বিশিষ্ট শিষ্যদের থেকে গ্রহণ করেছেন। ইবরাহীম নাখায়ী রহ. বলেন, আমি যদি তোমাদের বলি, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন তবে মনে করবে আমি তাঁর বহু সংখ্যক শিষ্যদের থেকে শুনে বলছি। আর যদি আমি তাঁর একজন শিষ্য থেকে শুনে থাকি তবে তোমাদের সামনে আমি তার নাম উল্লেখ করি। –সুনানে দারাকুতনী ৩/৩২৬

৮। ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী রহ. উমর রাযি. থেকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন, উমর রাযি. বলেন,...। বর্ণিত এ হাদীসটিকে প্রত্যাখান করা হয় এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. উমর রাযি. থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ রহ. বলেন, উমর রাযি. থেকে যদি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবের হাদীস গ্রহণ না করা হয় তবে কার হাদীস গ্রহণ করা হবে?! ইসলামী শরীয়তের বিশিষ্ট ইমামগণ সাঈদ

ইবনুল মুসাইয়িবের উক্তি 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন' দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। তবে উমর রাযি. থেকে তাঁর বর্ণনা দ্বারা কেন প্রমাণ পেশ করা যাবে না? আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবের কাছে লোক পাঠাতেন উমর রাযি. এর ফয়সালা জানার জন্য। এরপর তিনি সে ব্যাপারে ফতওয়া দিতেন। তাঁর সমকালীন বা পরবর্তী যুগের এমন কেউ এ ব্যাপারে অভিযোগ করেনি, উমর রাযি. থেকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রাযি. এর বর্ণনার ব্যাপারে যাদের কথা গ্রহণযোগ্য। সুতরাং অন্যদের কথা এক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়। –ইবনু কাইয়িমিল জাউযিয়া, যাদুল মা'আদ ৫/১৬৫

৯। ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন,

যেসব রাবীদের ব্যাপারে জানা আছে, তারা একমাত্র নির্ভরযোগ্য ছাড়া অন্য কারো থেকে হাদীস গ্রহণ করেন না তাদের মুরসাল এবং মুদাল্লাস বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। –আত-তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ ১/৩০

১০। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন,

দু'টি মুরসাল ব্যতীত ইবরাহীম নাখায়ী রহ. এর সব মুরসাল সহীহ। –ইবনে আদী, আলকামিল ফী যু'আফাইর রিজাল ৪/১৭০

১১। ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেন,

হাদীসে মুনকাতি' বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে। যে তাবিয়ী সাহাবীদের সাক্ষাৎ লাভ করেছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুনকাতি' হাদীস (সূত্রবিচ্ছিন্ন) বর্ণনা করেছে তাঁর এ হাদীসের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় লক্ষ্যনীয়:

১। নির্ভরযোগ্য অন্যান্য হাফিজে হাদীসগণ হাদীসটির মূলপাঠ বা ভাবার্থ অবিচ্ছিন্নভাবে সূত্রপরম্পরায় বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে হাদীসটি সহীহ বলেই গণ্য হবে।

২। হাদীসটি যদি অন্য সূত্রে অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত না হয় তাহলে দেখতে হবে অন্য কোনো সূত্রে হাদীসটি মুরসাল বর্ণিত হয়েছে কি না। যদি অন্য কোনো সূত্রে হাদীসটি মুরসাল বর্ণিত হয়ে থাকে তাহলে হাদীসটির শুদ্ধতা এবং

শক্তিময়তা আছে বলে পরিগণিত হবে। তবে মুরসালের এ প্রকারটি প্রথম প্রকার থেকে তুলনামূলক দুর্বল। –তাউজীহুন নযর ইলা উসূলিল আসার ২/৫৬৪

১২। শায়খ আলবানী রহ. একটি মুরসাল বর্ণনার ব্যাপারে বলেন,

এ মুরসাল বর্ণনার সূত্র সহীহ। আর এ জাতীয় মুরসাল সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণযোগ্য। হানাফী মাসলাক মতে তো এ ব্যাপারটি পরিষ্কার। আর অন্যান্যদের নিকট প্রমাণযোগ্য। কারণ ইবনে আব্বাস এবং আবূ হুরাইরা রাযি. সূত্রে বর্ণিত মারফূ হাদীস এ হাদীসের সমর্থন করে। –ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবীল ৮/৩০৬

১৩। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. আলহাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ এর এক মুরসাল বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন,

এটি একটি মুরসাল বর্ণনা। আর এ মুরসালের বর্ণনা নীতি অনুসারে তাবৎ উলামায়ে কেরাম আমল করে থাকেন। মুরসাল বর্ণনা উলামায়ে কেরামের এক অভিমত অনুসারে প্রমাণযোগ্য। যেমন আবূ হানীফা, মালেক এবং এক বর্ণনামতে আহমদ রহ. এর মাসলাক। উলামায়ে কেরামের অন্য অভিমত অনুসারে মুরসাল বর্ণনাটি যদি তাবৎ উলামায়ে কেরামের উক্তি এবং কুরআনের মূলপাঠের সমর্থন লাভ করে অথবা অন্য কোনো সূত্রে এটি মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়ে থাকে তবে তা প্রমাণযোগ্য হিসেবে পরিগণিত হবে। আর এটাই ইমাম শাফিয়ী রহ. এর অভিমত। সুতরাং এ জাতীয় মুরসাল বর্ণনা উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণযোগ্য। –মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ৮/৩০৮, শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, আররদ্দুল মুফহিম আলা মান খালাফাল উলামাআ ওয়া তাশাদ্দাদা ওয়া তা'আস সাবা ১/৯৮

ইবনে তাইমিয়া রহ. আরো বলেন,

মুরসাল বর্ণনার সূত্র যদি একাধিক হয় এবং তা সমঝোতামুক্ত হয় এবং কাকতালীয়ভাবে বর্ণনার মূলপাঠ এক হয় তাহলে এ বর্ণনা নিশ্চিত সহীহ বলে গণ্য হবে। কারণ বর্ণনাটি হয়তো সত্য হবে এবং হাদীসের অনুকূলে হবে নয়তো স্বেচ্ছা মিথ্যা বা ভুল হবে। যদি বর্ণনাটি ঐচ্ছিক

মিথ্যা এবং ভুল থেকে নিরাপদ হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে সত্য বলে পরিগণিত হবে। –ইমাম ইবনে তাইমিয়া মুকাদ্দামতুন ফী উসূলিত তাফসীর ২/২০, শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, আররদ্দুল মুফহিম আলা মান খালাফাল উলামা আ ওয়া তাশাদ্দাদা ওয়া তা'আস সাবা ১/৯৮

১৪। শায়খ আলবানী রহ. বলেন,

...আমি বলি, এ হাদীসের বাস্তবতা সম্বন্ধে ওই সকল শায়খ এবং তাদের অনুসারীরা না জানার ভান করে। ফলে তারা এ ব্যাপারে হাদীসের ভাষ্য দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বসূরী এবং পরবর্তী মনীষী উলামায়ে কেরামের কথা ও কাজের বিভিন্ন শাখা বের করে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে। অন্যদিকে তারা হাদীস শাস্ত্রবিদদের বিধিবদ্ধ নীতিরও বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে। আর সেটা হলো সাক্ষ্য এবং বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে হাদীসের শক্তি সঞ্চয়। কারণ এটা হাদীস শাস্ত্রবিদদের এমন একটি নীতি যার মাধ্যমে এমন অনেক হাদীসের শক্তি সঞ্চিত হয় যেগুলোর প্রমাণযোগ্য সহীহ কোনো সনদ নেই। যারা এ নীতি, হাদীসের বিভিন্ন সূত্র এবং সাক্ষ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ তারা ওই ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে যে ভ্রান্তিতে ওই সকল লোক সহীহ হাদীসকে যঈফ বানিয়ে নিপতিত হয়েছে। –শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. মাজমুউল ফাতাওয়ায় (১৮/২৫-২৬) বলেন, হাদীসবেত্তাদের নিকট যঈফ হাদীস দুই প্রকার:

১। এমন যঈফ হাদীস যার উপর আমল করতে বারণ করা যাবে না। তিরমিযী রহ. এর পরিভাষায় এ জাতীয় যঈফ হাদীস হাসান হাদীসের মত।

২। এমন যঈফ হাদীস যেগুলো পরিত্যাগ করা আবশ্যক। আর তা হলো ভিত্তিহীন হাদীস।

হাদীসবেত্তাদের নিকট কখনো একজন রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে অধিক ভুল করার কারণে যঈফ বলে গণ্য হয়। অথচ তাঁর শুদ্ধ বর্ণনার সংখ্যাই বেশি। এক্ষেত্রে হাদীসবেত্তারা অন্য হাদীসের সমর্থন ও গণ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। কারণ সূত্রের আধিক্য এবং প্রবৃদ্ধি

শক্তি সঞ্চয় করে। ফলে কখনো তা নিশ্চয়তার পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়। যদিও বর্ণনাকারীগণ পাপাচারী বলে গণ্য হন। তবে যদি হাদীসের মাঝে অধিক ভ্রান্তি হওয়া সত্ত্বেও বর্ণনাকারীগণ ন্যায়পরায়ন বিজ্ঞজন বলে পরিচিত হন তখন তাদের হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কি বিধান হবে তা বলাই বাহুল্য। আব্দুল্লাহ ইবনে লাহি'আর কথাই ধরুন। তিনি মুসলিম মনীষীদের মহান ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি মিশরের বিচারপতি ছিলেন। তিনি বহু হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর হাদীসের গ্রন্থসমগ্র আগুনে পুড়ে যায়। ফলে সে আপন স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে হাদীস বর্ণনা করতেন। ফলে তাঁর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রচুর ভুল হয়ে যেত। তবে তিনি শুদ্ধ হাদীসই বেশি বর্ণনা করতেন। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, আমি কিছু মানুষের হাদীস লিপিবদ্ধ করি শক্তি এবং সমর্থন লাভের জন্য। যেমন ইবনে লাহি'আ। সূত্রাধিক্যের মাধ্যমে যঈফ হাদীসের শক্তি সঞ্চয়ের কারণ এবং এর শর্ত ও এ নীতি গ্রহণের আবশ্যকীয়তা সম্বন্ধে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বেশ পরিষ্কার ভাষায় আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন (১৩/৩৪৭), মুরসাল বর্ণনার সূত্র যদি একাধিক হয় এবং তা সমঝোতামুক্ত হয় এবং কাকতালীয়ভাবে বর্ণনার মূলপাঠ এক হয় তাহলে এ বর্ণনা নিশ্চিত সহীহ বলে গণ্য হবে। কারণ বর্ণনাটি হয়তো সত্য হবে এবং হাদীসের অনুকূলে হবে নয়তো স্বেচ্ছা মিথ্যা বা ভুল হবে। যদি বর্ণনাটি ঐচ্ছিক মিথ্যা এবং ভুল থেকে নিরাপদ হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে সত্য বলে পরিগণিত হবে। হাদীসটি যদি দুই বা ততধিক সূত্রে বর্ণিত হয় (আমি বলি, যেমন এ হাদীসটি (আলবানী রহ.) এবং এ বিষয়টিও জানা যায়, দু'জন বর্ণনাকারী হাদীসের সূত্র একাধিক করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমঝোতায় উপনীত হয় নি, সাথে সাথে এ বিষয়টিও জানা যায়, এ জাতীয় বিষয়ে পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতিরেকে অকস্মিকভাবে ঐকমত্য হয় না তবে বুঝে নিতে হবে হাদীসটি সহীহ। যেমন জনৈক ব্যক্তি ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার বিবরণ দিল। এবং সে ঘটনার আদ্যোপান্ত সুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করল। এরপর অন্য এক ব্যক্তি আসল। এ

ব্যক্তির ব্যাপারে জানা আছে, সে প্রথম ব্যক্তির সাথে কোনোরূপ সমঝোতা করেনি। সে প্রথম ব্যক্তি যে ঘটনা বর্ণনা করেছে কর্মোক্তির যাবতীয় বিবরণসহ হুবহু বর্ণনা করল। তাহলে বুঝতে হবে এ ঘটনার আদ্যোপান্ত নির্ঘাত সত্য। কারণ ঘটনার বর্ণনাকারী উভয়ই যদি মিথ্যা বিবরণ দিত কিংবা ভুল বলত তাহলে স্বাভাবিক নিয়মে এমনটি হতো না যে, উভয়ই ঘটনার হুবহু সুপুঙ্খ বর্ণনা প্রদান করবে। পারস্পারিক পূর্ব পরিকল্পনা ও সমঝোতা ব্যতিরেকে ঘটনার বিবরণে দু'জন বা ততধিক ব্যক্তির ঐকমত্য হয়ে যাওয়া স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়। তিনি বলেন, এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ওই সমস্ত বর্ণনার সত্যতা জানা যায় যেগুলো বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যদিও ওই গুলোর একটি সূত্র সত্যতার জন্য যথেষ্ট হতো না বর্ণনাকারীর দুবলতা কিংবা বর্ণনাটি মুরসাল হওয়ার কারণে। তিনি আরো বলেন, এ মূলনীতিটি জেনে রাখা উচিৎ। কারণ এ নীতিটি হাদীস, তাফসীর, মাগাযী, মানুষের কথা এবং কাজের বহু বিবরণের ব্যাপারে নিশ্চিত ধারণা লাভের ক্ষেত্রে বেশ উপকারী।' এ কারণেই যদি দু'টি সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণিত হয় এবং এ কথা জানা থাকে, একজন অন্যজন থেকে গ্রহণ করে নি তবে নিশ্চিত হতে হবে এটা সত্য। বিশেষত যখন জানা যাবে এর বর্ণনাকারীগণ আদৌ স্বেচ্ছা মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না। তবে কোনো একজনের ব্যাপারে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকতে পারে। হাফেয আলায়ী রহ. তার জামিউত তাহসীলে (পৃষ্ঠা ৩৮) ইবনে তাইমিয়া রহ. এর শেষ বাক্যাংশ সদৃশ বাক্য এনেছেন। তবে তিনি সাথে সংযোজন করে বলেছেন, 'দু'টি সনদের সামগ্রিক দিক লক্ষ্য করলে হাদীসটি হাসান পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায়। কারণ তখন বর্ণনাকারীদের বিস্মৃতির আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে যায়। এবং একটি অন্যটির মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে। মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ এবং ইবনে কাসীর রহ. কৃত এর সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাতেও এমনটি আলোচিত হয়েছে। এরপর ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, (পৃষ্ঠা ৩৫২) এ ধরনের জায়গাগুলোতে মাজহুল (অজ্ঞাত), সাইয়িউল হিফযদের

(দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী) বর্ণনা এবং মুরসাল বর্ণনা প্রভৃতি দ্বারা সহায়তা গ্রহণ করা যায়। এ কারণেই উলামায়ে কেরাম এ জাতীয় হাদীস লিপিবদ্ধ করে থাকেন। তারা বলেন, সাক্ষ্য এবং সমর্থনের উদ্দেশ্যে এমন হাদীস গ্রহণ করার অবকাশ আছে যা অন্য কোনো উদ্দেশে গ্রহণ করার সুযোগ নেই। এরপর তিনি আহমদ রহ. এর উক্তি 'আমি সমর্থনের উদ্দেশে কিছু মানুষের হাদীস লিপিবদ্ধ করি' উল্লেখ করেন। এ ব্যাপারে তিনি ইবনে লাহিয়ার উদাহরণ টানেন। যেমনটি তার পূর্বোক্ত বাক্যে উল্লিখিত হয়েছে (পৃষ্ঠা ৯৬)। এরপর শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. একটি মুরসালের উদাহরণ দেন যা যুগপরম্পরায় ধারাবাহিক আমলের মাধ্যমে শক্তিময় হয়ে উঠেছে। আর সেটা হলো, আলহাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা রহ. এর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজর এলাকার অগ্নিপূজকদের নিকট পত্র মারেফতে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। এবং লিখলেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে। আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে তার উপর জিযইয়া কর আরোপ করা হবে। তাদের জবাই কৃত পশু আহার করা হবে না এবং তাদের নারীদের বিবাহ করা হবে না। আব্দুর রাজ্জাক, ইবনে আবী শাইবা, তাহাবী ('আলমুশকিল' ২/৪১৫-৪১৬) এবং বাইহাকী (৭/১৯২, ২৮৪-২৮৫) হাদীসটি সনদসহ উল্লেখ করেছেন। এটি একটি মুরসাল বর্ণনা। মুসলিমদের ঐকমত্য এ হাদীসের সমর্থন করে। ইবনে তাইমিয়া রহ. আরো বলেন, (৩২/১৮৮-১৮৯) এ মুরসালের বর্ণনা নীতি অনুসারে তাবৎ উলামায়ে কেরাম আমল করে থাকেন। মুরসাল বর্ণনা উলামায়ে কেরামের এক অভিমত অনুসারে প্রমাণযোগ্য। যেমন আবূ হানীফা, মালেক এবং এক বর্ণনামতে আহমদ রহ. এর মাসলাক। উলামায়ে কেরামের অন্য অভিমত অনুসারে মুরসাল বর্ণনাটি যদি তাবৎ উলামায়ে কেরামের উক্তি এবং কুরআনের মূলপাঠের সমর্থন লাভ করে অথবা অন্য কোনো সূত্রে এটি মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়ে থাকে তবে তা প্রমাণযোগ্য হিসেবে পরিগণিত হবে। আর এটাই

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর অভিমত। সুতরাং এ জাতীয় মুরসাল বর্ণনা উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণযোগ্য। আমি বলি, কাতাদার এ মুরসাল বর্ণনাটিতে- যে বর্ণনাটির শুদ্ধতা নিয়ে আমরা পর্যালোচনা করছি- এ সকল শর্ত পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান; বরং এর শুদ্ধতার সপক্ষে অতিরিক্ত কিছু উপকরণও রয়েছে। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং বর্ণনাটি সর্বসম্মতিক্রমে শুদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাতে সামান্যতম সংশয় নেই। যদি মাজহাবগত গোড়ামি ও প্রান্তিকতা, ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি এবং শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, উলামায়ে হাদীস, হুফফাজে হাদীস কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত এ মূলনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা না থাকে। যে মূলনীতির আলোকে তারা শত শত একক সূত্র বিবেচনায় যঈফ হাদীসকে দুর্বলতামুক্ত করেছেন। তন্মধ্য হতে অন্যতম হলো, সালাতুত তাসবীহ এর হাদীস। হাদীসটির বিভিন্ন সূত্র অনুসন্ধানে প্রতীয়মান হয়, এর সুপ্রমাণিত কোনো সনদ নেই। কিন্তু সনদগুলোর সামগ্রিক দিক বিবেচনায় হাদীসটি সহীহ। আজুররী, ইবনে মান্দাহ, খতীব, আবূ বকর সাম'আনী, মুনযিরী, ইবনুস সালাহ, নববী, সুবকী প্রমুখ হাফেযে হাদীসগণ হাদীসটিকে সহীহ- ন্যূনপক্ষে হাসান -বলেছেন। বাইহাকী রহ. 'শু'আবুল ঈমান' এ (১/২৪৭) যঈফ সনদে আবূ রাফে' থেকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এমনটি করেছেন। এবং সৎপন্থী মনীষীগণ যুগপরম্পরায় পরস্পর থেকে এ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন। তার পূর্বে হাকেম এ ব্যাপারে কথা বলেছেন। তিনি মুস্তাদরাকে বলেন, (১/৩১৯) তাবে তাবিয়ীনের যুগ থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত ইমামগণ কর্তৃক এ হাদীসের অনুকরণ, নিরবচ্ছিন্নভাবে তাদের এ কর্মপন্থা গ্রহণ এবং জনসাধারণকে এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রদান প্রক্রিয়াই এর সত্যতার প্রমাণ বহন করে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক। এরপর তিনি ইবনুল মুবারক পর্যন্ত সূত্র বর্ণনা করেন। এবং বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক এর সূত্রের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। ইবনে মুবারকের ব্যাপারে এ অভিযোগ উত্থাপনের কোনো সুযোগ নেই, তিনি তার মতে

যে হাদীস সহীহ নয় তা মানুষকে শেখাবেন। ইমাম যাহাবী রহ. তার সমর্থন করেছেন। আমি বলি, 'বিভিন্ন সূত্র এবং সাক্ষের মাধ্যমে হাদীসের শক্তি সঞ্চয় করণ' এর মত মহান নীতির প্রামাণিকতায় মনীষী আয়িম্মায়ে কেরামের বক্তব্য এবং উপরোল্লিখিত দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ করণ সংশ্লিষ্ট হাদীসটিকে যঈফ হিসেবে আখ্যাদানকারী ওই সকল লোকদের অজ্ঞতার উপর বড় ধরনের একটি প্রমাণ হিসেবে গৃহীত। হাদীসবেত্তাদের নিকট হাসান এবং সহীহ লিগাইরিহী কাকে বলা হয় সে সম্পর্কে যেন তাদের কোনো ধারণাই নেই। জনৈক ব্যক্তির উক্তি মতে তাদের দৃষ্টান্ত হলো, এক বিচারকের নিকট মামলা দায়ের করা হলো। এ মামলা পরিচালনার জন্য একজন পুরুষ অথবা দু'জন মহিলার সাক্ষ্য প্রয়োজন। তো এক মহিলা এসে সাক্ষ্য প্রদান করল। কিন্তু বিচারক তার সাক্ষ্যকে বাজেয়াপ্ত করে দিল। তার যুক্তি হলো, মহিলার সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষের অর্ধেক। এরপর অন্য এক মহিলা এসে প্রথম মহিলার মত সাক্ষ্য প্রদান করে। এবারও বিচারক একই যুক্তিতে তার সাক্ষ্যকে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে দেয়। ওই সকল লোকদের দৃষ্টান্ত ঠিক এরকমই। এটা অধিকাংশ ওই সকল লেখকদের ক্ষেত্রে মহামারি আকার ধারণ করেছে যারা হাদীস শাস্ত্র নতুন শিখতে আরম্ভ করেছে। ফলে তারা হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি ও ব্যকরণ সম্বন্ধে ধারণা লাভ না করেই হাদীস সহীহ যঈফ বলতে শুরু করেছে। তাদের একজনকে দেখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 'এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয় না।' এ হাদীসটিকে তার চারটি সূত্র দেখে যঈফ বলে দিয়েছে। অথচ সে জানে হাফেয ইবনে হাজারসহ অন্যান্য হাফেযে হাদীস হাদীসটি শক্তিমান বলে অভিহিত করেছেন। এবং এটাও জানে যে, খুলাফায়ে রাশিদীনের কার্যক্রম এ হাদীসের ভাষ্যমতেই পরিচালিত হতো। এসব ব্যাপারে সে কোনো ভ্রুক্ষেপই করেনি। উপরন্তু হাদীসটির একটি সহীহ সূত্রও রয়েছে। সেটা সে উল্লেখ করেনি। আমি আলইরওয়াতে (৩/২৫৪/৭৬৭) হাদীসের 'তাখরীজে' হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছি। হাদীসটি সহীহ আবূ

দাউদে (১৪০৩) রয়েছে। তার হাদীসের এ সূত্রটির অনুসন্ধান করা আবশ্যক ছিল। নতুবা বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের নিকট এর পর্যালোচনা ও অনুসন্ধানের ব্যাপারটি সমর্পন করা প্রয়োজন ছিল। –শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, আররদ্দুল মুফহিম আলা মান খালাফাল উলামাআ ওয়া তাশাদ্দাদা ওয়া তা'আস সাবা ১/৯৫-১০১

১৫। শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. একটি যঈফ হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন,

যদি এ হাদীসটির সাথে পূর্বের মুরসাল হাদীসটি সংযুক্ত করা হয় তাহলে আল্লাহ চাহে তো সামগ্রিকভাবে হাদীসটি হাসানের পর্যায়ে উন্নীত হবে। –আসসিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা ৫/৬

১৬। শায়খ আলবানী রহ. এর সাথে মুরসাল বিষয়ক একটি সংলাপ:

প্রশ্নকারী: কতক মুহাদ্দীস থেকে জানা যায়, যদি কোনো হাদীস সহীহ সূত্রে মুরসাল প্রক্রিয়ায় এবং দুর্বল সূত্রে মুত্তাসিল প্রক্রিয়ায় বর্ণিত হয় তাহলে দু'টির সমন্বয়ে দুর্বলতার ক্ষতি পূরণ হবে। এতে করে হাদীসটি হাসান পর্যায়ে উন্নীত হবে। কোনো কোনো ভাই এ নীতিকে অস্বীকার করে। এ ব্যাপারে আপনার (আলবানী রহ. এর) অভিমত কি? অর্থাৎ কিছু ভাই এ মূলনীতিকে স্বীকার করে না। তারা বলে, এ নীতিটি সর্বস্বীকৃত নয়।

শায়খ (আলবানী): তাদের প্রমাণ কি?

প্রশ্নকারী: তাদের কোনো দলীল নেই। কারণ কোনো কোনো উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, কতক 'আহলে হাদীস' (হাদীস শাস্ত্রবিদ) এ মূলনীতি অনুসারে আমল করেন না।

শায়খ: কোনো সমস্যা নেই। কতক 'আহলে হাদীস' এ মূলনীতির উপর আমল করেন। কতক আমল করেন না।

প্রশ্নকারী: তারা প্রশ্ন করে, এ মূলনীতির শুদ্ধতার সপক্ষে প্রমাণভিত্তি কি?

উত্তর: প্রমাণ ১। কুরআনের আয়াত سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ অর্থ: আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করব। সূরা কাসাস ৩৫। প্রমাণ ২। দু'জন নারীর সাক্ষ্য

এক পুরুষের সাক্ষ্যের সমতুল্য। এ কারণেই কবি বলেন, তুমি তোমার নেতৃযুগল দ্বারা আমার হৃদয়ের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না। কারণ দু'জন দুর্বল ব্যক্তি একজন শক্তিমান ব্যক্তির উপর বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়।

প্রশ্নকারীঃ তারা বলে, মুরসাল বলা হয় যার থেকে একজন রাবী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যে হাদীসের ক্ষতিপূরণ হয় সেটা তো মুত্তাসিল তথা অবিচ্ছিন্ন সূত্রের হাদীস। মুত্তাসিল হাদীস সূত্রবিচ্ছিন্ন হাদীসকে কিভাবে শক্তিশালী করবে?

শায়খঃ এরা ওই শ্রেণীর লোক যাদের জন্য ইজতিহাদ করা বিধিসম্মত নয়। তাদের জন্য হাদীসের সহীহ যঈফের বিধান প্রয়োগ করা আইনসঙ্গত নয়। যদি সূত্র ভিন্ন হয় তাহলে হাদীস শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। প্রথমত এ যুক্তির নিরিখে অনেক উলামায়ে কেরাম এককভাবে মুরসালকে সহীহ বলেছেন। আমার ধারণা, তোমাদের এ বিষয়টি জানা আছে। সুতরাং ইমাম মালেক, আবূ হানীফা এবং এক বর্ণনামতে আহমদ রহ. এককভাবে মুরসাল হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকেন। সেখানে মুত্তাসিল হাদীস দ্বারা শক্তি সঞ্চয়ের কোনো বালাই নেই। যদিও আমরা এটিকে মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করি না।.....তবে হাদীসটি যদি মুরসাল সূত্র ব্যতিরেকে অন্য কোনো সূত্রে বর্ণিত হয় এবং সে সূত্রটি এককভাবে যঈফ হয় তাহলে দুই যঈফ মিলে শক্তিশালী হয়ে যাবে। এটি একটি প্রত্যক্ষ এবং চাক্ষুষ বিষয়। যেমন জনৈক জ্ঞানবৃদ্ধের অন্তিম বাণী সম্বন্ধে তোমরা শুনে থাকবে যে, মৃত্যুকালে সে তার পুত্রদের কাছে তার জীবনের শেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করতে চাইল। তার দশজন পুত্র ছিল। সে প্রত্যেক পুত্রকে বলল, তোমরা প্রত্যেকে একটি করে লাঠি নিয়ে আসো। যখন অনেকগুলো লাঠি একত্রিত হলো তখন সে লাঠিগুলো দ্বারা আঁটি তৈরি করতে বলা হলো। এরপর তিনি প্রত্যেক ছেলেকে আঁটিটি ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। তাদের কেউ আঁটিটি ভাঙতে সক্ষম হলো না। এরপর তিনি উদাহরণ দিয়ে বললেন, এভাবে যদি তোমরা সবাই একতাবদ্ধ থাকো তাহলে কেউ তোমাদের উপর অত্যাচার

করার সাহস পাবে না। এখানে লাঠিগুলো যদি আলাদা থাকতো তবে লাঠিগুলোকে ভাঙ্গা সম্ভব হতো। একটি লাঠি ভাঙ্গা সহজ। কিন্তু তার সাথে যদি আরো একটি লাঠি জড়ো করা হয় তাহলে তাতে শক্তি সঞ্চয় হয়। তেমনিভাবে যদি তার সাথে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম লাঠিটি যুক্ত করা হয় তবে শক্তির পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে। আমরা এ ইলম শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করি, তোমরা কি বিশ্বাস করো যঈফ হাদীস সূত্রাধিক্যের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে? তাদের বক্তব্য সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? বা তুমি কি জানো?

প্রশ্নকারীঃ তারা বলে, কোনো রাবীর মাঝে যদি দুর্বলতা থাকে এবং এ জাতীয় সূত্র একাধিক হয় তাহলে হাদীস সহীহ হবে।

শায়খঃ এটা কিভাবে?

প্রশ্নকারীঃ যদি সনদের মাঝে একজন দুর্বল রাবী থাকে এবং এজাতীয় সূত্র একাধিক হয় তখন এ নীতি প্রয়োগ হবে। কিন্তু যে বর্ণনায় বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তার মাধ্যমে কি করে শক্তি বা সমর্থন অর্জন করা যায়?

শায়খঃ তারা কি এ কথার প্রবক্তা যে, সূত্রাধিক্যের কারণে যঈফ হাদীস শক্তি সঞ্চয় করে?

প্রশ্নকারীঃ হ্যাঁ, তারা এ কথার প্রবক্তা।

শায়খঃ তারা এ কথা বলে কিজন্য?

প্রশ্নকারীঃ তারা বলে, আমাদের মুহাদ্দিস পূর্বসূরীগণ এ কথা বলেন।

শায়খঃ তোমার এ বন্ধুদের এ পরিতৃপ্তি কোত্থেকে এলো?

প্রশ্নকারীঃ পারস্পারিক সহায়তা ও শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে।

শায়খঃ অর্থাৎ তারা এক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয়ের অর্থকে লক্ষ করেছে। তবে এখানে দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আর তা হলো, একটি হাদীস অবিচ্ছিন্ন দু'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দু'টি সূত্রই যঈফ। এক্ষেত্রে সূত্র দু'টি কি পরস্পর থেকে শক্তি সঞ্চয় করবে নাকি তৃতীয় কিংবা চতুর্থ সূত্রের প্রয়োজন পড়বে?

প্রশ্নকারী: শক্তি সঞ্চয় করবে।

শায়খ: তারা যে অর্থটিকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছে যারা মুত্তাসিল হাদীসের মাধ্যমে মুরসাল হাদীসকে শক্তিশালী করে তারা ঠিক সে একই অর্থকে লক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছে। কারণ ইরসালের দুর্বলতা এবং বিস্মৃতির দুর্বলতা উভয় সমপর্যায়ের দুর্বলতা। তারা কেন বলে যে, স্মৃতিশক্তিগত দুর্বল দু'টি সনদ একটি আরেকটি থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে? তারা কেন এ কথা বলে না যে, মুরসাল বর্ণনাটি ঐ সূত্রের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে যে সূত্রের মাধ্যমে অন্য একটি যঈফ হাদীস শক্তি সঞ্চয় করতে পারে?

প্রশ্নকারী: কারণ তারা বলে, এখানে সূত্রটির সমস্যা তথা রাবীর দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পেরেছি। এ দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ সম্ভব। আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আমরা তাবিয়ী সম্বন্ধে কোনো ধারণা রাখি না। কখনো তাবিয়ীর মাঝে প্রচণ্ডরকমের দুর্বলতা থাকে যার মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয়ের বৈধতা থাকে না। সুতরাং তারা উদাহরণত বলে, সাহাবী এবং তাবিয়ীর মাঝে প্রচণ্ডরকমের দুর্বল রাবী থাকলে এ সূত্র দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ হয় না। সুতরাং অজ্ঞাত এবং অপরিচিত একজন ব্যক্তি দ্বারা কি করে আপনারা ক্ষতিপূরণ করে থাকেন।

শায়খ: আমরা যে যঈফের মাধ্যমে অন্য যঈফকে শক্তিশালী করছি হতে পারে সে অনুমান বা কল্পনাপ্রসূত এমন ভুল করেছে যা শক্তিশালী প্রমাণিত হয় না। অস্বীকৃতির অধ্যায় তো বেশ প্রশস্ত। কিন্তু জ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বা গবেষণার বক্তব্য হলো, মানুষ প্রবল ধারণার বিষয়টিকেই গ্রহণ করবে। এ পর্যায়ে আমরা ওই সকল উলামায়ে কেরামের প্রতি মনোনিবেশ করবো যারা মুরসাল হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল?

প্রশ্নকারী: তাদের শর্তসমূহ।

শায়খ: না, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যদি তাদের -অর্থাৎ যেসব উলামায়ে কেরাম মুরসালকে সহীহ বলেছেন- প্রবল

ধারণা হতো যে মুরসাল বর্ণনাকারী প্রচণ্ডরকমের দুর্বল রাবী থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তাহলে তারা এ হাদীসকে সহীহ বলতেন না। কিন্তু তাদের প্রবল ধারণা মতে যদি বিচ্ছিন্ন এ সূত্রটি তীব্র পর্যায়ের দুর্বল হতো তাহলে তারা কখনো হাদীসটিকে বর্ণনা করতেন না এবং সেটাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে সম্বন্ধ করতেন না। এ অবস্থায় যেটা মনে হয়েছে তা এই। তবে একথাও স্বীকার্য্য, বিচ্ছিন্ন বর্ণনাকারীর প্রচণ্ডরকমের দুর্বল হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এখানে তার বিপরীত অন্য একটি সম্ভাবনাও রয়েছে। সেটা হলো, প্রচণ্ডরকমের দুর্বল না হওয়া। আর এটাই হৃদয়ের অধিক তৃপ্তিদায়ক। এ জন্যই তারা মুরসালকে সহীহ বলেছেন। আমরা ন্যূনপক্ষে এটাকে সাক্ষ্য এবং সমর্থন হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। সরাসরি এর মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করি না। দুরুসুন লিশ শায়খ আলবানী ৭/৩২

১৭। শায়খ ইবনে বায রহ. ইস্তেস্কার নামাযে চাদর উল্টিয়ে পড়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন আবূ জা'ফর বাকেরের একটি মুরসাল বর্ণনার মাধ্যমে। –ফাতাওয়া শায়খ ইবনে বায ৪/২৬

এ হলো, মুরসাল বর্ণনা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি।

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ. এর ব্যাপারে ইমামদের বক্তব্য

১। জারীর বিন আব্দুল হামীদ বলেন,

> আমি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী রহ. কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যেসব সাহাবী এবং তাবিয়ীদের সাক্ষাত লাভ করেছেন আবূ বকর, উমর, উসমান এবং আলী রাযি. এর ব্যাপারে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল? তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যেসব সাহাবী এবং তাবিয়ীদের সাক্ষাত লাভ করেছি তাঁরা আবূ বকর এবং উমর রাযি. এর ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেননি। তবে উসমান এবং আলী রাযি. এর ব্যাপারে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল। আমি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ এর মত মহৎ জ্ঞানবৃদ্ধ আর কাউকে দেখিনি। –ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল ৩১/৩৫২

২। লাইস ইবনে সা'দ রহ. বলেন,

আমি রবী'আ রহ. এর কাছে ছিলাম। ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হে আবূ উসমান! আমি আফ্রিকার একজন অধিবাসী। লোকজন আমাকে আপনার কাছে, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ এবং আবুয যিনাদ এর কাছে জিজ্ঞেস করতে বলল। তিনি বললেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ এর কাছে জিজ্ঞেস করো। কারণ সে উমর রাযি. এর দরজা থেকে বেরিয়ে এসেছে। সুতরাং তাঁর কাছেই যাও। আর তাঁর নিচের পর্যায়ের কারো কাছে জিজ্ঞেস করতে হলে যে কারো কাছ থেকে জিজ্ঞেস করতে পারো। –প্রাগুক্ত ৩১/৩৫৩

৩। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ইমাম, আল্লামা, মদীনার আলেমদের শায়খ, প্রসিদ্ধ ফকীহ সপ্তক এর শিষ্য ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর যুগে হিজরী সত্তর দশকের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম যাহাবী রহ., সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/৪৬৮

লেখক মহোদয় আল্লামা নীমাবী রহ. এর একটি উক্তি-ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ উমর রাযি. এর যুগ পাননি- উল্লেখ করেছেন। তাও মির'আতুল মাফাতীহ এর সৌজন্যে। কিন্তু হাদীসটি সম্পর্কে নিমাভী রহ. এর অভিমতটি উল্লেখ করেননি। অথচ তিনি গ্রন্থের মূলপাঠে বলেছেন, হাদীসটির ইসনাদ (সূত্র) শক্তিশালী মুরসাল। –আসারুস সুনান ২৪৭/৭৭৯

লেখকের আপত্তি ১১

লেখক মহোদয় তাঁর পুস্তিকার ৩৩ নম্বর পৃষ্ঠায় বিশ রাক'আত তারাবীহ সংক্রান্ত সপ্তম বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাটির সূত্রসহ আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِى زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى رَمَضَانَ بِثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً. وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ، ثُمَّ كَانُوا يَقُومُونَ بِعِشْرِينَ وَيُوتِرُونَ بِثَلاَثٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

অর্থ: ইয়াযীদ ইবনে রূমান রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. এর যুগে রমাযান মাসে মানুষ তেইশ রাক'আত নামায আদায় করত। (বাইহাকী রহ. বলেন) দু'টি বর্ণনার (২১, ২৩) মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব। কারণ তারা প্রথমে এগারো রাক'আত পড়ত। এরপর তারা বিশ রাক'আত পড়ত এবং তিন রাক'আত বিতর পড়ত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। –সুনানে বাইহাকী কুবরা; হাদীস ৪৮০২, মুয়াত্তা ইমাম মালেক; হাদীস ২৫২

লেখক মহোদয় এরপর তাহক্বীক্ব শিরোনামে বলেন, 'আছারটি নিতান্তই যঈফ ও মুনকার।'

পর্যালোচনা

প্রশ্ন হলো এ বর্ণনাটি যঈফ জিদ্দান তথা নিতান্তই যঈফ হলো কি করে? পূর্বের বর্ণনার মত এটিও তো একটি মুরসাল বর্ণনা। লেখকের ভাষায় পূর্বের বর্ণাটি কিন্তু 'নিতান্তই যঈফ' ছিল না; সাধারণ যঈফ ছিল। এ ব্যাবধানের কারণ কিন্তু এখানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হাদীস শাস্ত্রবিদদের নিকট যঈফ এবং যঈফ জিদ্দান দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা। একটির ক্ষেত্রে সহনীয়তার অবকাশ আছে। অন্যটির ক্ষেত্রে সহনীয়তার অবকাশ রাখা হয়নি। অবশ্য লেখকদের মতে তো যঈফ এবং মউযু সেম ভ্যালু পর্যায়ের। সেখানে যঈফ এবং যঈফ জিদ্দানের ব্যাবধান তো তাদের কাছে হাস্যকর মনে হবে। আমরা জানি, মুরসাল বর্ণনাকে কোনো কোনো হাদীসবিদ যঈফ হাদীসের শ্রেণীভুক্ত করেছেন। কিন্তু কেউ তো মুরসাল বর্ণনাকে যঈফ জিদ্দান পর্যায়ের হাদীসের শ্রেণীভুক্ত করেননি। কিন্তু লেখক মহোদয় হাদীস শাস্ত্রবিদদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে তাদেরকে ওভারটেক করে মুরসাল বর্ণনাকে যঈফ জিদ্দান তথা নিতান্তই যঈফ হাদীসের শ্রেণীভুক্ত করে ফেললেন। এরপর লেখক মহোদয় হাদীসটির সূত্রবিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে ইমাম বাইহাকী, যাইলায়ী, আইনী এবং নববী রহ. এর উক্তি উল্লেখ করেছেন। সাথে শায়খ আলবানী রহ. এর কিছু উক্তিও উল্লেখ করেছেন। শেষে আল্লামা মুবারকপুরী রহ. এর উক্তির মাধ্যমে হাদীস সংক্রান্ত তাঁর 'তাহক্বীক্ব' এর ইতি টানেন।

লেখক মহোদয় ৩৩ নম্বর পৃষ্ঠায় আইনী রহ. এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "আল্লামা আয়নী হানাফী 'উমদাতুল ক্বারী'র মধ্যে বলেন, 'এর সনদ বিছিন্ন (এভাবেই লেখা)' অর্থাৎ যঈফ।" ৪৬ নম্বর টিকায় আইনী রহ. আরবী মন্তব্যটুকু তুলে দিয়েছেন। আর তা হলো سنده منقطع। প্রথম প্রশ্ন হলো, আইনী রহ. কি উক্ত আরবী বাক্যে মন্তব্য করেছেন? না কি তাঁর বাক্যটি অন্যরকম? লেখক কি উমদাতুল কারী খুলে দেখেছেন? সেখানে কোন শব্দে

আইনী রহ. মন্তব্যটি করেছেন? আমরা উমদাতুলকারী খুলে দেখেছি। সেখানে আইনী রহ. এর মন্তব্য ভাষ্য হলো, ففيه انقطاع (সুতরাং এতে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে)। উমদাতুল কারী ৮/৪৮৫। এতে কি প্রমাণিত হয় না লেখক উমদাতুল কারীর পাতা উল্টে দেখেন নি? বস্তুত এখানে লেখক আলবানী রহ. এর অনুসরণ করেছেন। আলবানী রহ. হুবহু এ বাক্যটিই আইনী রহ. এর নামে ব্যবহার করেছেন। সালাতুত তারাবীহ ১/৪৩। এ তাকলীদের নাম কি দেয়া যেতে পারে? চাক্ষুষ তাকলীদ না অন্ধ তাকলীদ? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো, লেখক আইনী রহ. এর 'সনদ বিচ্ছিন্ন' এর ব্যাখ্যা করেছেন যঈফ বলে। লেখক এটা কোন ধরনের ব্যাখ্যা করলেন? কোনো বক্তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে হলে তো বক্তার মতাদর্শের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যাখ্যা করতে হয়। এটা একটি সর্বসম্মত মূলনীতি। আপনি একটি কথা বলে একটি বিষয় বুঝাবেন আর শ্রোতারা আপনার সে কথার ভিন্ন ব্যাখ্যা করে প্রচার করবে। এতে আপনি তো তেলে বাগুনে জ্বলে উঠবেন।

সংশ্লিষ্ট হাদীসটি একটি মুরসাল বর্ণনা। আর মুরসাল বর্ণনা সম্বন্ধে হানাফী মাসলাকের অনুসারীরা সহনীয় দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। তারা এ জাতীয় বর্ণনাকে যঈফ হাদীসের শ্রেণীভুক্ত মনে করেন না। এটি একটি সর্বস্বীকৃত বিষয়। আর আইনী রহ. হানাফী মাসলাকের ইমাম পর্যায়ের একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি মুরসাল বর্ণনার ক্ষেত্রে হানাফী মাসলাকের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেন বলে তো আমাদের জানা নেই। তিনি তো মুরসাল বর্ণনাকে সহীহ বলেই জ্ঞান করে থাকেন। ব্যাখ্যা তো নিজের মন মতো করার বিষয় নয়। ব্যাখ্যা করার আগে তো সনদ বিচ্ছিন্ন মুরসাল বর্ণনার ক্ষেত্রে আইনী রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গি কি সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নেয়া প্রয়োজন ছিল। আলবানী রহ. এ ব্যাপারে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, 'তেমনিভাবে আইনীও উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারীতে (৫/৩৫৭) সনদ বিচ্ছিন্ন বলে হাদীসটিকে যঈফ বলে অভিহিত করেছেন। সালাতুত তারাবীহ ১/৪৩। অথচ মুরসাল বর্ণনার ব্যাপারে আইনী রহ. এর মন্তব্য দেখুন। তিনি বলেন, আর বাইযাবী রহ. এর বক্তব্য– 'এটি সূত্রবিচ্ছিন্ন হাদীস' আমাদের নিকট কোনো সমস্যাপূর্ণ নয়। কারণ মুরসাল বর্ণনা আমাদের নিকট প্রমাণযোগ্য। –উমদাতুল কারী ৩/৩০৪। আল্লামা নীমাভী রহ. হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, এর ইসনাদ শক্তিশালী মুরসাল। –আসারুস সুনান ২৪৭/৭৭৮

লেখকের আপত্তি ১২

লেখক মহোদয় ৩৪ পৃষ্ঠায় বলেন,

> অতএব ওমর রাযি. ২০ রাক'আত তারাবীহর নির্দেশ দিয়েছিলেন বা তাঁর আমলে ২০ রাক'আত চালু ছিল মর্মে যে বর্ণনাগুলো এসেছে তার সবগুলোই যঈফ, জাল ও মুনকার।

পর্যালোচনা

লেখকের বক্তব্য বেশ স্পষ্ট। তিনি বলতে চাচ্ছেন বিশ রাক'আত তারাবীহ সংক্রান্ত যাবতীয় বর্ণনা জাল এবং যঈফ। লেখকের মতে জাল তথা মউযু হাদীস এবং যঈফ হাদীস একই জিনিস। এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। যদি ব্যাপারটি এমনি হয় তাহলে আমরা বলব দু'টি সনদের মউযু হাদীস হাসান হাদীসের পর্যায়ে উন্নীত হবে। আর একই জাল হাদীসের একাধিক সূত্র রচনাকারী মিথ্যুকদের সংখ্যাও হাদীসের ইতিহাসে অনেক রয়েছে। কারণ হাদীসবেত্তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, যঈফ হাদীসের সূত্র একাধিক হলে তা হাসান পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায়। আর লেখক মহোদয়দের নিকট যঈফ আর মউজু বা জাল হাদীস একই জিনিস। মউজু যেমন পরিত্যাজ্য যঈফও তেমন পরিত্যাজ্য। সুতরাং যঈফ যদি কোনো প্রক্রিয়ায় গৃহীত হয় তবে সে একই প্রক্রিয়ায় মউযু হাদীসও গৃহীত হবে। এটা হলো, যঈফ এবং মউযু হাদীসকে সার্বিকভাবে এক গণ্য করার আবশ্যিক পরিণতি ফল। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো মুহাদ্দীস কি এরকম ফলাফল বের করেছেন বা গ্রহণ করেছেন? কোনো মুহাদ্দিস কি লেখকদের মতো ঢালাউভাবে যঈফ মউযুকে একাকার করেছেন? আমরা স্বীকার করি বিশ রাক'আত তারাবীহ বিষয়ে পরিত্যাজ্য হাদীসও রয়েছে। তাই বলে সবগুলো বর্ণনাই যে পরিত্যাজ্য সেরকম কোনো পরিস্থিতি তো আমরা দেখি না। সারকথা এটি একটি মুরসাল বর্ণনা। ইতিপূর্বে মুরসালসহ কয়েকটি মুত্তাসিল বর্ণনাও উল্লিখিত হয়েছে। সবগুলো সূত্রকে যঈফ গণ্য করা হলেও সূত্রাধিক্যের কারণে তা হাসান পর্যায়ে উন্নীত হয়ে গেছে। আর মুত্তাসিল বর্ণনাগুলো যঈফ না সহীহ সে সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় আলোচনা পেছনে করা হয়েছে। সাথে মুরসাল বর্ণনা সম্বন্ধে হাদীস শাস্ত্রবিদদের বিস্তারিত আলোচনা পেছনে তুলে ধরা হয়েছে।

লেখকের আপত্তি ১৩

মুহতারাম লেখক পুস্তিকার ৩৫ নম্বর পৃষ্ঠায় আট নম্বরে একটি হাদীস উল্লেখ করেন। হাদীসের আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

> حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن أبي الحسناء أن عليا أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة
>
> أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ فَنْجُوَيْهِ الدِّينَوَرِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السُّنِّىُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مَرْوَانَ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِى سَعْدٍ الْبَقَّالِ عَنْ أَبِى الْحَسْنَاءِ: أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً

অর্থ: আবুল হাসনা হতে বর্ণিত, আলী রাযি. জনৈক ব্যক্তিকে রমাযান মাসে লোকদের নিয়ে বিশ রাক'আত নামায পড়াতে নির্দেশ দিলেন। –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১৫/৪২৯, সুনানে কুবরা বাইহাকী; হাদীস ৪৮০৫
এরপর লেখক 'তাহক্বীক্ব' শিরোনামে বলেন,

> বর্ণনাটি যঈফ অথবা জাল। এর সনদে আবূ সা'দুল বাকাল ও আবুল হাসানা দু'জন ত্রুটিযুক্ত রাবী রয়েছে।' এরপর লেখক হাদীসটির একটি সনদ সম্বন্ধে ইমাম বাইহাকী রহ. এবং আবূ সা'দ বাক্কাল সম্বন্ধে ইমাম আলাউদ্দীন ইবনুত তুরকুমানী রহ. এর মন্তব্য উল্লেখ করেন। এরপর লেখক বলেন, 'ইমাম যাহাবী তাকে অপরিচিত বলেছেন। ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেন, 'সে অজ্ঞাত রাবী'। তাছাড়া আবুল হাসানা ও আলী রাযি.-এর মাঝে আরো দু'জন রাবী রয়েছে, যা সনদে উল্লেখ নেই। এরপরেও তা ছহীহ হাদীছ সমূহের সরাসরি বিরোধী হওয়ায় মুনকার। অতএর আছারটিকে ভিত্তিহীন বলাই শ্রেয়।

পর্যালোচনা

লেখকের উক্ত বক্তব্যের মাঝে বেশ কিছু আপত্তিকর অসঙ্গতি রয়েছে। আমরা সেগুলোকে সংখ্যা অনুপাতে উল্লেখ করছি।

১। লেখক আরবী এবং বাংলায় বর্ণনাকারীর নাম 'আবুল হাসানা' লিখেছেন। এটা কিন্তু নামটির শুদ্ধ বানান নয়। শুদ্ধ বানান হলো, 'আবুল হাসনা'। এর জন্য রেফারেন্সের প্রয়োজন বোধ করলাম না। আরবী ব্যাকরণ পারদর্শী উলামা মহলে বিষয়টি নিতান্তই পরিষ্কার একটি বিষয়। তবু প্রয়োজনে দেখা যেতে পারে লিসানুল আরব ১৩/১১৪।

২। হুবহু এ হাদীসটির স্বতন্ত্র দু'টি বর্ণনা সূত্র রয়েছে। একটি ইমাম ইবনে আবী শাইবা রহ. এর। অপরটি ইমাম বাইহাকী রহ. এর। সনদ দু'টির সম্পূর্ণ আরবী পাঠ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তো ইবনে আবী শাইবার বর্ণনাসূত্রটিতে লেখকের 'ত্রুটিযুক্ত' রাবী শুধু আবুল হাসনা রয়েছে। পক্ষান্তরে বাইহাকী রহ. এর বর্ণনাসূত্রটিতে লেখকের 'ত্রুটিযুক্ত রাবী' উভয়ই রয়েছে। কিন্তু লেখকের উপস্থাপনায় ফুটে উঠে, হাদীসটির একটিমাত্র সূত্র রয়েছে। এবং তাতে দু'জন ত্রুটিযুক্ত রাবী রয়েছে। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা, কোনো বর্ণনাসূত্রে দু'জন দুর্বল রাবী বা বর্ণনাকারী থাকলে তাতে দুর্বলতার ব্যপ্তি বেড়ে যায়। তো শাস্ত্রীয় দিক থেকে এটি একটি আপত্তিকর অসঙ্গতি।

৩। লেখক বলেছেন 'আবূ সা'দুল বাকাল'। শব্দটি 'বাকাল' নয়; বাক্কাল। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি অমার্জিত ত্রুটি। ব্যবহারিক আরবী পরিভাষায় শব্দটি বেশ পরিচিত। এজন্য প্রমাণ উদ্ধৃতির তেমন প্রয়োজন বোধ

করছি না। তবুও আত্মপরিতুষ্টি লাভের জন্য দেখা যেতে পারে আলআনসাব লিস সাম'আনী ১/৩৭৮।

৪। লেখক মহোদয় আবূ সা'দ বাক্কাল সম্বন্ধে আলাউদ্দীন ইবনুত তুরকুমানী রহ. এর আরবী মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। আর তা হলো, الاظهر ان ضعفه من جهة ابی سعد سعيد بن مرزبان البقال فانه متكلم فيه فان كان كذلك فقد تابعه عليه غيره। এরপর তিনি আরবী উদ্ধৃতির অনুবাদ করেছেন এভাবে, 'স্পষ্ট যে, আবূ সা'দ সাঈদ ইবনে মারযুবানের কারণেই হাদীসটি যঈফ। কারণ সে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত। <u>সে যদি এমনটিই হয় তাহলে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও এ কথারই অনুসরণ করেছেন।</u>' فان كان كذلك فقد تابعه عليه غيره লেখক মহোদয় আরবী এ বাক্যটির অর্থ করেছেন 'সে যদি এমনটিই হয় তাহলে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও এ কথারই অনুসরণ করেছেন।' আমাদের বুঝে আসছে না লেখক মহোদয় এ কি অর্থ করলেন? تابعه عليه غيره বাক্যটি হাদীস শাস্ত্রের একটি পারিভাষিক পর্যায়ের বাক্য। হাদীসবেত্তাদের লিখনীতে এ বাক্যটি বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এ বাক্যটির মর্মার্থ সম্বন্ধে হাদীস শাস্ত্রের সামান্য একজন শিক্ষানবীসও অবগত থাকে। কিন্তু 'আহলে হাদীস' মহলের একজন সুপরিচিত আলেমের কলম থেকে এ বাক্যের এমন কীম্ভূতকীমাকার অর্থ তো কল্পনা করা যায় না। আরবী বাক্যটির সঠিক অর্থ হলো, আবূ সা'দ বাক্কাল অভিযুক্ত রাবী হলেও তৎকর্তৃক বর্ণিত বিশ রাক'আত তারাবীহের ব্যাপারে অন্যান্য রাবীগণ তাকে অনুসরণ করেছেন। এ অর্থেই এ বাক্যটির ব্যবহার হাদীস এবং রিজালবিদদের মাঝে সিদ্ধ। উপরন্তু লেখক মহোদয় যে অর্থ করেছেন সে অর্থ শুদ্ধ হওয়ার কোনো সুযোগ আমরা দেখি না। কারণ বাক্যটির মাঝে তিনটি সর্বনাম রয়েছে:

(১) تابعه (২) عليه (৩) غيره। লেখক মহোদয়ের অনুবাদে দ্বিতীয় সর্বনামের অর্থ এসেছে। কিন্তু তা চরম পর্যায়ের ত্রুটিপূর্ণ। কারণ অন্যান্য 'মুহাদ্দিসগণ' নয়; রাবীগণ 'কথার' অনুসরণ করেননি; অভিযুক্ত রাবীর অনুরসরণ করেছেন বিশ রাক'আত তারাবীহ এর বর্ণনার ক্ষেত্রে। তৃতীয় সর্বনামের অর্থ এসেছে। কিন্তু তাতেও চরম পর্যায়ের অর্থ বিভ্রাট ঘটেছে। কারণ তিনি তৃতীয় সর্বনামযুক্ত শব্দটির ভাবার্থ করেছেন 'অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ'। কিন্তু এখানে অর্থ হবে 'আবূ সা'দ বাক্কাল ব্যতীত অন্যান্য রাবী'। ভাবার্থ হিসেবে 'অন্যান্য রাবী'ও ব্যবহৃত হতে পারে। আর প্রথম সর্বনামের অর্থই প্রকাশিত হয়নি লেখক মহোদয়ের অনুবাদে। অথচ অনুবাদের ক্ষেত্রে এ সর্বনামটির দিকে লক্ষ্য করা হলে হয়তো এত বড় বিচ্যুতি ঘটত না।

৫। লেখক বলেছেন, 'ইমাম যাহাবী তাকে...'। এ 'তাকে' কাকে? ইতিপূর্বে লেখক দু'জন ত্রুটিপূর্ণ রাবীর উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি আবূ সা'দ

বাক্কাল সম্বন্ধে ইমাম আলাউদ্দীন ইবনুত তুরকুমানী রহ. এর মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। তো লেখকের উপস্থাপনাগত ধারাক্রমে এ 'তাকে' দ্বারা আবূ সা'দ বাক্কাল উদ্দীষ্ট হবে। কিন্তু এ 'তাকে' দ্বারা লেখকের উদ্দীষ্ট পুরুষ তো ভিন্নজন। আর সে হলো আবুল হাসনা। কিন্তু লেখকের সুপ্ত এ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে তো পাঠকের অন্তহীন গলদঘর্ম হতে হবে। ফুটনোটের উদ্ধৃতিগ্রন্থ ঘেটে তারপর পাঠককে উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে হবে। এটা কি অসাবধানী দৃষ্টিভঙ্গির ফসল না কি অন্য কিছু? বুঝতে পারছি না।

৬। লেখক বলেছেন 'আবুল হাসানা (হাসনা হবে) ও আলী রাযি.-এর মাঝে আরো দু'জন রাবী রয়েছে, যা সনদে উল্লেখ নেই।' প্রশ্ন হলো, এ দু'জন রাবী কে? তাদের পরিচয়টা কি?

৭। লেখক শেষে বলেছেন, 'অতএব আছারটিকে ভিত্তিহীন বলাই শ্রেয়।' এর অর্থ কি এই নয়, আসারটিকে ভিত্তিহীন না বললেও কোনো সমস্যা নেই? শুরুতে আসারটি সম্বন্ধে লেখক ডাইরেক্ট যঈফ-জাল বলে দিলেন আর শেষে এসে এতটা নমনীয় হয়ে গেলেন কেন ব্যাপারটি বোধগম্য হচ্ছে না।

অভিযুক্ত রাবী বিষয়ক আলোচনা

এবার আমরা অভিযুক্ত দু'জন রাবী সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়াস পাবো। আবূ সা'দ বাক্কাল সম্বন্ধে আপাতত আমরা লেখক মহোদয়ের সাথে একমত পোষণ করছি। রাবী আবুল হাসনা সম্বন্ধে এবার হাদীসবেত্তাদের বক্তব্য লক্ষ্য করুন।

১। আবুল হাসনা সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস সম্বন্ধে ইমাম হাকেম নাইসাবুরী রহ. বলেন,

> হাদীসটির ইসনাদ সহীহ। বুখারী এবং মুসলিম রহ. হাদীসটি তাঁদের গ্রন্থদ্বয়ে আনেননি। আর রাবী আবুল হাসনা এ হলো, আলহাসান বিন হাকাম নাখায়ী। তালখীসুল মুস্তাদরাকে ইমাম যাহাবী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। –আলমুস্তাদরাক লিলহাকেম ৬/২৩০/৭৫৫৬

২। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

> আলহাসান বিন হাকাম নাখায়ী সম্বন্ধে আবূ হাতেম রাযী বলেন, সে 'সালেহ' তথা উপযুক্ত বা গৃহীত হওয়ার মত রাবী। –আলকাশেফ ১/৭০

৩। ইমাম ইবনে শাহীন রহ. বলেন,

> আলহাসান বিন হাকাম কুফী একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। এমনটিই ইয়াহইয়া বলেছেন। আহমদ আলহাসান বিন হাকাম সম্বন্ধে বলেন, সে নাখায়ী এবং সিকা বা নির্ভরযোগ্য। –ইবনে শাহীন, তারীখু আসমাইস সিকাত ১/১০/১৯৫

৪। ইবনে আবূ হাতেম বলেন,

> আমি আমার আব্বাকে আলহাসান ইবনুল হাকাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি আনাস বিন মালেক রাযি. এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন? তিনি বললেন, সে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেননি। তিনি তাবিয়ীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। –জামিউত তাহসীল ফী আহকামিল মারাসীল ১/১৪/১৩৩

৫। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,

> আমি এ হাদীসটি (من بدا جفا) সম্পর্কে মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এই আলহাসান ইবনুল হাকাম 'আদী বিন সাবেত, আবূ হাযেম, আবূ হুরাইরা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'– এ সূত্রপরম্পরায় হাদীস বর্ণনা করেন। –ইলালুত তিরমিযী আলকাবীর ১/১০৫/৬০৯

৬। ইমাম বুখারী রহ. বলেন,

> আলহাসান ইবনুল হাকাম নাখায়ী কুফী শা'বী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছে। এবং তার থেকে আবূ উসামা হাদীস শ্রবণ করেছে। –আততারীখুল কাবীর ২/১২/২৫০৬

৭। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

> আলহাসান ইবনুল হাকাম আবূ বুরদাহ প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছে। ইবনে হিব্বান রহ. এর ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তবে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এবং আবূ হাতেম রাযী রহ. তাকে নির্ভরযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। –আলমুগনী ফিযযু'আফা ১/১৫৪/১৩৯৫

৮। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. আলহাসান ইবনুল হাকাম নাখায়ী আবুল হাসান কুফী এর ছয়জন শিক্ষক এবং সাত জন ছাত্রের কথা উল্লেখ করার পর বলেন,

> ইয়াইয়া ইবনে মাঈন বলেন নির্ভরযোগ্য। আবূ হাতেম রাযী রহ. বলেন, হাদীস গ্রহণের উপযোগী। আমি বলি, ইবনে আবি হাতেম এবং হাকেম এর উপনাম বলেছেন আবুল হাকাম। এবং এটিই সঠিক। –তাহযীবুত তাহযীব ১/১৭৯

৯। ইমাম মিযযী রহ. বলেন,

> আবুল হাসনা কুফী। তার নাম হলো, আলহাসান। হাকাম ইবনে উতাইবাহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এবং তার থেকে শারীক ইবনে আব্দুল্লাহ নাখায়ী হাদীস বর্ণনা করেন। –তাহযীবুল কামাল ৩৩/২৪৮/৭৩১৭

১০। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

> আলহাসান ইবনুল হাকাম নাখায়ী আবুল হাকাম কুফী 'সদূক' পর্যায়ের রাবী। এবং ষষ্ঠ স্তরের রাবী। তাকরীবুত তাহযীব ১/২০০

১১। আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,

> আমার পিতাকে আলহাসান ইবুনল হাকাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, নির্ভরযোগ্য। –মাউসু'আতু আকওয়ালিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ৪/২২৭

১২। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

> আবুল হাসনা কুফী হাকাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে। এবং তার থেকে শারীক হাদীস বর্ণনা করেছে। সুনানে আবূ দাউদ এবং সুনানে তিরমিযীতে তদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস রয়েছে। –আলকাশেফ ২/২১৬/৬৫৮৩

শায়খ আলবানী রহ. আলী রাযি. কর্তৃক দু'টি মেষ কুরবানী সংক্রান্ত আবুল হাসনা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে বিভিন্ন উপায়ে যঈফ হিসেবে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। অথচ তিনি অন্যত্র এ হাদীস সম্বন্ধে স্ববিরোধী মন্তব্য করেছেন। ফলে দেখা যাচ্ছে, হুবহু এ হাদীসটিকে সহীহুত তিরমিযী খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮৮ এর ১২০৯ নাম্বারে এনেছেন। –শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ, তাম্বীহুল কারী আলা তাকবিয়াতি মা যা'আফাহুল আলবানী ১/১৬৫

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, আবুল হাসনা এবং আলহাসান ইবনুল হাকাম একই ব্যক্তি। হাকেম নাইসাপুরী রহ. এ কথাটি স্পষ্ট করেই বলেছেন। ইমাম মিযযী রহ. বলেছেন, আবুল হাসনা এর নাম আলহাসান। উভয়ের উস্তাদ শাগরেদও সমকালীন। যদি দু'জন একই ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে আবুল হাসনাকে মাজহুল বা অজ্ঞাত বলার কোনো সুযোগ নেই। আর যদি দু'জন রাবী আলাদা হয়ে থাকেন তাহলে আমরা দেখতে চেষ্টা করবো, মাজহুল কাকে বলে? পারিভাষিক এ শব্দটি আবুল হাসনা এর ক্ষেত্রে কতটুকু প্রযোজ্য হয়? মাজহুল তিন প্রকার:

১। মাজহুলুল আইন। মাজহুলুল আইন বলা হয়, এমন বর্ণনাকারীকে শিক্ষা দীক্ষায় যার কোনো প্রশিদ্ধি নেই এবং হাদীসবেত্তারাও তার শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে কোনো পরিচয় তুলে ধরেন নি এবং একজন মাত্র বর্ণনাকারী থেকেই তার হাদীস জ্ঞাত হয়েছে। মাজহুলুল আইন পর্যায়ের বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যদি মাজহুলুল আইন পর্যায়ের বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা রিজাল শাস্ত্রবিদ কর্তৃক সত্যায়িত হয় তবে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের দু'টি পন্থা রয়েছে:

(১) তার থেকে বর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণনাকারী তার নির্ভরযোগ্যতার সত্যায়ন করবে।

(২) তার থেকে বর্ণনাকারী ব্যক্তিই তার নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সত্যায়ন করবে। তবে শর্ত হলো এ সত্যায়নকারী 'জারহ তা'দীল' শাস্ত্রের ইমাম পর্যায়ের কেউ হবেন।

২। মাজহুলুল হাল। মাজহুলুল হাল এমন বর্ণনাকারীকে বলা হয় যার বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ ন্যায়পরায়ণতা গোচরীভূত নয়। এবং তার থেকে দু'জন বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেছে; কিন্তু তাকে নির্ভরযোগ্য বলে কেউ ঘোষণা দেয়নি। মাজহুলুল হাল পর্যায়ের বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ মতানুসারে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩। আলমাসতুর। আলমাসতুর এমন বর্ণনাকারীকে বলা হয় যার বাহ্যিক ন্যায়পরায়নতা পরিচিত কিন্তু অভ্যন্তরীণ ন্যায়পরায়নতা গোচরীভূত নয়। এবং তার থেকে দু'জন বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেছে; কিন্তু তাকে নির্ভরযোগ্য বলে কেউ ঘোষণা দেয়নি। আলমাসতুর পর্যায়ের বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ মতানুসারে গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনে হাজর আসকালানী রহ. অবশ্য মাজহুলকে দু ভাগে বিভক্ত করেছেন। কারো কারো নিকট মাজহুলুল হাল এবং আলমাসতুর একই শ্রেণীভুক্ত। –তাউযীহুল আফকার মা'আ তানকীহিল আনযার ২/১৯২, ফাতহুল মুগীস (মাজহুল বিষয়ক আলোচনা), নূরুদ্দীন ইত্র, মানহাজুন নাকদ ফী উলূমিল হাদীস ১/৮৯, মাহমুদ তাহ্হান, তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস ১/৬৫

এবার মাসতুর সম্বন্ধে হাদীস বিশেষজ্ঞজনদের মন্তব্য শোনা যাক।

১। আহমদ শিহাতা সিকান্দারী রহ. বলেন,

> ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর মতে মাসতুর পর্যায়ের বর্ণনাকারী 'হাসানুল হাদীস' (এদের বর্ণিত হাদীস হাসান পর্যায়ের)। আয়িম্মায়ে কেরামের বৃহৎ একটি অংশও এ মত পোষণ করেন। বরং যাঁরা সহীহ থেকে হাসান হাদীসকে

স্বতন্ত্র বিবেচনা করেন না তারা মাসতুর পর্যায়ের বর্ণনাকারীদের হাদীসকে সহীহ বলে অভিহিত করেন। এবং হাসান এবং সহীহ উভয় শ্রেণীকে সহীহ শিরোনামের হাদীস গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। এঁদের মাঝে ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান এবং যিয়া মাকদিসী রহ. অন্যতম। আর আবূ ঈসা তিরমিযী এ জাতীয় হাদীসকে সাধারণত সহীহ হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। কখনো তিনি সহীহ হিসেবে গণ্যকারী মূল হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট নিদর্শন বিবেচনায় সেগুলোকে সহীহ বলেও অভিহিত করেন। –আত্তা'আক্কুবুল মুতাওয়ানী আলাস সিলসিলাতিয যাঈফা লিল আলবানী ১/৬৯

ইবনে হাজর আসকালানী রহ. বলেন,

...এ জাতীয় হাদীস সমর্থনের কারণে হাসান হাদীসে উন্নীত হয়। যেমন মাসতুর বর্ণনাকারীর হাদীস যখন তার সূত্র একাধিক হয়। –নুযহাতুন নজর ফী তাউযীহি নুখবাতিল ফিকার ১/১২

২। ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. বলেন,

আমার নিকট পরিস্কর যে, হাসান দু শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী হলো, এমন হাদীস যার সূত্রপীঠিকায় মাসতুর পর্যায়ের বর্ণনাকারী রয়েছে, যার যোগ্যতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ধারণা নেই। তবে সে এমন উদাসীন নয় যে, বর্ণনার ক্ষেত্রে ত্রুটিবাহুল্যে আক্রান্ত হবে। এবং সে হাদীসের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণকারীও নয়। অর্থাৎ তার থেকে হাদীসের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা মিথ্যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে না এবং ফিসকের অন্য কোনো উপসর্গও পাওয়া যায় না। উপরন্তু হাদীসের মূলপাঠ বা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হাদীসের পাঠ অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। ফলে অন্য সূত্রের সমর্থনে হাদীসটি সমর্থিত হয়েছে। এতে করে হাদীসটি শায এবং মুনকার এর পর্যায় থেকে বেরিয়ে আসে। ইমাম তিরমিযী রহ. এর মন্তব্য এ জাতীয় হাদীসকেই নির্দেশ করে। মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ ১/১৯। ইমাম নববী (আততাকরীব), ইবনে জামা'আহ (আলমানহালুর রাবী), সাখাবী (ফাতহুল মুগীস) প্রমুখ হাদীসবিদগণও এ মত সমর্থন করেছেন।

–আত্তা'আক্কুবুল মুতাওয়ানী আলাস সিলসিলাতিয যাঈফা লিল আলবানী ১/৭০

৩। আলী ইবনে হুসাইন ফকীহী বলেন,

মাসতুর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি অমীমাংশিত থেকে যাবে। তবে যদি তার সপক্ষে কোনো সাক্ষ্য হাদীস পাওয়া যায় তবে তা হাসান লিগাইরিহী হাদীসের শ্রেণীভুক্ত হবে। আর যদি সাক্ষ্য হাদীস না পাওয়া যায় তবে যয়ীফ হাদীসের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবে। তবে যদি নির্ভরযোগ্য কোনো রিজাল বিশেষজ্ঞ মাসতুর বর্ণনাকারীকে সিকাহ বলে ঘোষণা দেয় তবে সংশ্লিষ্ট রাবী সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা অস্পষ্টতা দূরীভূত হয়ে যাবে। এ জাতীয় রাবী রিজাল গ্রন্থগুলোতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। আততা'লীকাতুল বাযিয়া আলা নুযহাতিন নযর ১/৬১

৪। আব্দুল কারীম বিন আব্দুল্লাহ খাযীর বলেন,

...মাসতুর সম্বন্ধে দ্বিতীয় অভিমত হলো, উলামায়ে কেরামের একটি শ্রেণী মাসতুরের বর্ণনাকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন। হানাফী মাসলাকের উলামায়ে কেরাম এবং ইবনে হিব্বান রহ. এ মত পোষণ করেন। তারা এর গ্রহণযোগ্যতার কারণ হিসেবে বলেন, মানুষকে স্বাভাবিক অবস্থায় ন্যায় এবং সৎ হিসেবেই গণ্য করতে হয়; যাবৎ তাদের ব্যাপারে আপত্তিকর কোনো বিষয় প্রকাশিত না হবে। সম্ভাবনাতীত অজ্ঞাত এবং অদৃশ্য বিষয় জানার ব্যাপারে মানুষকে বাধ্য করা হয়নি। তাদেরকে সম্ভাব্য এবং প্রকাশ্য বিষয়াদি জানার ব্যাপারে বাধ্য করা হয়েছে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহ্যিক বিষয়ের ব্যাপারে কর্মপন্থা গ্রহণ করতেন এবং অদৃশ্য ও অন্তঃস্থ বিষয়াদি জানার ব্যাপারে নিরাসক্ত থাকতেন। কুরআনের বাণী: 'তাদের সম্বন্ধে তোমরা জান না; আমি জানি।' (সূরা তাওবা- ১০১) এবং হাদীসের বাণী 'তার হৃদয় চিরে দেখ নি কেন?' (সহীহ মুসলিম হাদীস ২৮৭) এ বিষয়টিরই ইঙ্গিত বহন করে। এজন্য ইমাম নববী রহ. বলেন, মাসতুরের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। অগ্রগণ্য মত হলো, (আল্লাহই সর্বজ্ঞাত) মাসতুরের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এর সপক্ষের

প্রমাণগুলো শক্তিশালী। প্রথম মতের প্রবক্তাদের প্রমাণের উত্তরে বলা যায়, কোনো দুরাচারীর সংবাদকে নির্ণয় করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং সংবাদ নির্ণয়ের মূল কারণ হলো দুরাচার। যদি দুরাচার না পাওয়া যায়– যেমনটি এখানে ঘটেছে– তাহলে নির্ণয় করার আবশ্যকীয়তাও রহিত হয়ে যাবে। –তাহকীকুর রুগবাহ ফী তাউযীহিন নুখবাহ ১/৮৭

সারকথা, ইবনে হাজার আসকালানী রহ. মাসতুর অথবা মাজহুলুল হাল এর হাদীসকে সূত্রাধিক্যের মাধ্যমে শক্তিশালী করেন; মাতরূক পর্যায়ের হাদীসকে নয়। তবে শায়খ আহমদ শাকের রহ. আলবায়িসুল হাসীসের টিকায় এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি ১০৬ নাম্বার পৃষ্ঠায় ইবনে হাজার কৃত আত্তাকরীবের রাবীদের বিভিন্ন স্তরের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, চতুর্থ স্তরের পরবর্তী স্তরের সকল রাবী পরিত্যাজ্য। তবে যদি তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় তবে তাদের হাদীস শক্তিশালী বলে পরিগণিত হবে। এবং সে হাদীস হাসান লিগাইরিহী পর্যায়ের হাদীসভুক্ত হয়ে যাবে। শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. এ ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন করেছেন। শায়খ আবুল হাসান মা'রিবী তাঁর সাথে দ্বিমত করে ইতহাফুন নাবীলে–১/৬৬–বলেন, তিনি ভুল বলেছেন অথবা শায়খ আহমদ শাকেরের লিখনীতে ভুল হয়ে গেছে যখন তিনি বলেছেন মাজহুল, মাসতুর এবং যয়ীফদের হাদীসকে সাক্ষ্য হাদীস হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। যেমনটি আলবায়িসুল হাসীস এর ১০১ নাম্বার পৃষ্ঠায় রয়েছে। এটা ভুল। কারণ শায়খ আহমদ শাকের রহ. এর কর্মপন্থায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এ জাতীয় বর্ণনাকারীদের হাদীসকে তিনি সাক্ষ্য হাদীস হিসেবে গ্রহণ করেন; বরং এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের রাবীদের বর্ণিত হাদীসকেও তিনি সাক্ষ্য হাদীস হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে শায়খ আউয়ামা বলেন, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. মাসতুরের হাদীসকে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে হাসান বলতেন। যেমনটি হানাফী মাসলাকের অনুসারীদের কর্মপন্থা। শাফী মাসলাকের অনুসারীগণ এ কর্মপন্থাকেই গ্রহণ করেন। –লিসানুল মুহাদ্দিসীন ৪/১০৩

৫। ইমাম যাহাবী রহ. একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন,

আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল হক্ব বলেছেন, 'এ হাদীসটি সহীহ নয়।' এ ব্যাপারে তার উপর অভিযোগ রয়েছে। কারণ মাসতুরের বর্ণনাকে গ্রহণ করা হয়। আর হারাম ইবনে

হাকীমকে নির্ভরযোগ্য বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ হাদীসটি গরীব বা বিরল হলেও হাসান হওয়ার দাবি রাখে। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত। –মীযানুল ই'তিদাল ১/৩৮৪

৬। শায়খ মাহমূদ সাঈদ মামদূহ বলেন,

পূর্ব যুগের মাসতুর বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণযোগ্য। আর যদি সে মাসতুর তাবিয়ীদের কেউ হয় তাহলে তোমার কি ধারণা? অনেক হাদীস গ্রন্থে এ কর্মপন্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. আলমুকাদ্দামার ভিতরে স্বীকার করেছেন। –উসূলুত তাহানী বি ইসবাতি সুন্নিয়াতিস সাবহাহ ওয়ার রদ্দু আলাল আলবানী ১/৫৪

৭। শায়খ আলবানী রহ. বলেন,

যারা বলে 'আবূ ঈসা আসওয়ারী মাজহুল' অথবা 'তার থেকে কাতাদা ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেনি।' তারা তাদের জ্ঞানের পরিধি অনুসারে বলেছেন। আর প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানবান রয়েছে। আততাহযীবের মধ্যে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, তার থেকে সাবেত বুনানী, ক্বাতাদাহ এবং আসেম আহওয়াল বর্ণনা করেছেন। আমি বলি, এরা সবাই নির্ভরযোগ্য। সুতরাং তাদের মাধ্যমে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অস্পষ্টতা দূরীভূত হয়ে যাবে। আর যারা তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন তাদের এ সত্যায়নে অভ্যন্তরীণ যে অস্পষ্টতা আছে আল্লাহ চাহে তো তাও দূরীভূত হয়ে যাবে। বিশেষত তিনি হলেন একজন তাবিয়ী। আর ইবনে রজব হাম্বলী, ইবনে কাসীর রহ. প্রমুখের মত কতক হাদীসবেত্তাদের অভিমত হলো, মাসতুর তাবিয়ীর হাদীস হাসান বলে পরিগণিত হবে। –আসসিলসিলাতুস সহীহা ১/৩০৭

৮। শায়খ আলবানী রহ. আরো বলেন,

...হ্যাঁ, মাসতুরের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়া সম্ভব যদি তার থেকে বেশ কজন নির্ভরযোগ্য রাবী হাদীস বর্ণনা করেন এবং তার হাদীসে আপত্তিকর কোনো বিষয় না থাকে। পরবর্তী হাফেযে হাদীসদের কর্মপন্থা এটিই। যেমন ইবনে কাসীর,

ইরাকী এবং আসকালানী রহ. প্রমুখ। –তামামুল মিন্নাহ ফিত তা'লীকি আলা ফিকহিস সুন্নাহ ১/২০

লেখকের আপত্তি ১৪

লেখক মহোদয় তার পুস্তিকার ৩৬ নাম্বার পৃষ্ঠায় বিশ রাক'আত তারাবীহ সংক্রান্ত নয় নাম্বার হাদীসটি উল্লেখ করেন। হাদীসটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

> أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدَكٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: عَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا الْقُرَّاءَ فِى رَمَضَانَ ، فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً. قَالَ: وَكَانَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُوتِرُ بِهِمْ .وَرُوِىَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِىٍّ.
>
> অর্থ: আবূ আব্দুর রাহমান সুলামী রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী রাযি. কারী তথা কুরআনের হাফেযদের ডাকলেন এবং তাদের একজনকে লোকদের নিয়ে বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়াতে নির্দেশ দিলেন। আর আলী রাযি. তাদের নিয়ে বিতর পড়তেন। –সুনানে বাইহাকী কুবরা; হাদীস ৪৮০৪

এরপর লেখক মহোদয় 'তাহক্বীক্ব' শিরোনামে বলেন,

> বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার। এতে আতা ইবনে সায়িব ও হাম্মাদ ইবনে শু'আইব নামে দু'জন ত্রুটিপূর্ণ রাবী রয়েছে। 'ক' আত্বা (এখানে লেখক ত-ব সংযুক্তি দিয়েছেন; পূর্বেরটাতে সংযুক্ত দেন নি) ইবনে সায়িব সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, 'শেষ বয়সে তার বর্ণনাগুলো এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল এবং স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিল।' ইবনে মাঈন বলেন, 'আতা ইবনে সায়িব বর্ণনাগুলো মিশ্রিত করেছে'। ذروه ليس من صحيحٍ حديثُهُ... والاختلاطُ جميعا ولا يحتج بحديثه
>
> সুতরাং তাকে পরিত্যাগ কর। কারণ তার কোন ছহীহ হাদীছ নেই; বরং সম্পূর্ণই মিশ্রিত। তাই তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না'। ইমাম ইয়াহইয়া বলেন, 'তার বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না'। আহমদ ইবনে আবী খাইছামা বলেন, 'তার সমস্ত হাদীছই যঈফ'।

পর্যালোচনা

১। অনুবাদগত অসঙ্গতি: লেখক মহোদয় وَكَانَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُوتِرُ بِهِمْ. বাক্যাংশের অনুবাদ করেছেন, 'তিনি তাদের সাথে শুধু বিতর পড়তেন।' লেখক মহোদয় এটা কোন ধরনের অনুবাদ করলেন? بِهِم অর্থ কি তাদের সাথে? যদি অর্থ এটিই হয় তাহলে يُصَلِّى بِالنَّاسِ এর অর্থ 'লোকদেরকে ২০ রাক'আত ছালাত পড়ান।' অর্থ করলেন কেন? অর্থ করা প্রয়োজন ছিল 'লোকদের সাথে ২০ রাক'আত ছালাত পড়েন।' ওখানে যেমন অকর্মক ক্রিয়ার অর্থ করেছেন এখানেও তো অকর্মক ক্রিয়ার অর্থ করা প্রয়োজন ছিল। يُصَلِّى এবং يُوتِرِ ক্রিয়া দু'টি যদি بِ সিলা বা প্রিপজিশন যোগে ব্যবহৃত হয় তখন আরবী ভাষায় ক্রিয়া দু'টি কি অকর্মক হিসেবে ব্যবহৃত হয়? এমন অদ্ভুত ব্যবহার আরবী ভাষায় আছে বলে তো আমাদের জানা নেই। অথচ আলোচিত বাক্যটির অর্থ হবে, আর আলী রাযি. তাদের নিয়ে বিতর পড়তেন। অর্থাৎ আলী রাযি. তাদের বিতর নামাযের ইমাম হতেন আর কারীদের একজন তাদের তারাবীহ নামাযের ইমাম হতেন। উপরন্তু এক ধাপ এগিয়ে লেখক মহোদয় অনুবাদে 'শুধু' শব্দটির সংযোজন ঘটিয়েছেন। এ অনুবাদের আরবী শব্দ কি মূলপাঠে আছে? তাহলে কেন এমন বিকৃত অনুবাদ করা হলো। আহলে হাদীস উলামায়ে কেরাম নাকি বাহ্য হাদীসে যেটা আছে সেটাকেই দীন মনে করেন। তাতে নিজের বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে নতুন কিছুর সংযোজন ঘটান না। তাহলে লেখক মহোদয় গবেষক পর্যায়ের একজন আহলে হাদীস আলেম হয়ে কেন এমন বাহ্য হাদীসের অনুবাদ ছেড়ে বিকৃত সংজোযনার আশ্রয় নিলেন? আপনার কৃত অনুবাদে তো প্রতীয়মান হয়, আলী রাযি. নিজে তারাবীহ পড়তেন না; মানুষকে পড়তে এবং পড়াতে নির্দেশ দিয়ে নিজে শুধু বিতর পড়তেন। ব্যাপারটি কি মূলত এরকমই? বাক্যাংশ থেকে কি এমন ব্যাখ্যা উপলব্ধ হয়? লেখক মহোদয়ের দায়িত্ব তো ছিল আট রাক'আত তারাবীহ প্রমাণ করবেন। কিন্তু বিকৃত অনুবাদের মাধ্যমে তো তিনি পূর্ণ তারাবীহকেই নেই করে দিচ্ছেন। তাছাড়া হাদীসটিকে তো আপনি অপাঙক্তেয় ঘোষণা করে দিয়েছেন। তাহলে এ অপাঙক্তেয় জিনিস দ্বারা 'কিছু একটা' প্রমাণ করার কি প্রয়োজন ছিল? এতে কি প্রতীয়মান হয় না যে, আপনি নিজেও হাদীসটিকে অপাঙক্তেয় ঘোষণার ক্ষেত্রে কনফার্ম নন? যারা আসলাফের ব্যাখ্যাকে এককভাবে গ্রহণ করতে চায় আপনাদের ভাষায় তারা জালিয়াতের আশ্রয় নেয়, হাদীসের অপব্যাখ্যায় মেতে উঠে। এক্ষেত্রে তো আপনাদের ক্লিন থাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আপনারাও দেখি সে পথে বেশ কর্মতৎপর; বলতে গেলে এক ধাপ এগিয়ে। তবে আর অন্যের পিছনে পড়ে থাকার স্বার্থকতাটা কি?

২। **আপত্তিকর অসঙ্গতি:** লেখক মহোদয়ের মন্তব্যের ভিতরে বেশ কিছু আপত্তিকর অসঙ্গতি রয়েছে। ক্রমানুসারে আমরা সেগুলো উল্লেক করছি।

(ক) লেখক মহোদয় ইমাম যাহাবী রহ. এর মন্তব্যাংশ 'এবং স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিল।' এর আরবীপাঠ পাদটিকায় উল্লেখ করেছেন এভাবে وساء حِفظَهُ । ساء ক্রিয়াটি তো অকর্মক ক্রিয়া ছিল। আর আরবী ব্যাকরণের স্বতঃসিদ্ধ একটি নীতি হলো, অকর্মক ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কর্মপদ হয় না। অথচ লেখক মহোদয় তাতে স্বরচিহ্নের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ কর্মপদ নিয়ে এসেছেন। অন্যদিকে তিনি এর অনুবাদ করেছেন অকর্মক ক্রিয়ার। এমন স্ববিরোধী আচরণ সত্যিই দুঃখজনক। حِفظه শব্দটি হবে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াটির কর্তাপদ। কিন্তু লেখক মহোদয় বানিয়ে দিয়েছেন কর্মপদ।

(খ) লেখক বলেছেন, ইবনে মাঈন বলেন, 'আতা ইবনে সায়িব বর্ণনাগুলো মিশ্রিত করেছে'। আমাদের জিজ্ঞাসা হলো, اختلط। অর্থ কি মিশ্রিত করা? ইমাম ইয়াইয়া ইবনে মাঈন اختلط। বলেছেন; اخلط। বলেননি। আর اختلط। তো একটি অকর্মক ক্রিয়া। এর অর্থ হলো, মিশ্রিত হয়ে গেছে। অন্যদিকে মিশ্রিত হয়ে যাওয়া কোনো দোষের বিষয় নয়। বার্ধক্য কিংবা অন্য যেকোনো অসাবধানতার কারণে এমনটি হয়ে যেতে পারে। এটা স্বেচ্ছা প্রবণতার কোনো বিষয় নয়। এর কারণে কারো ব্যক্তিত্বের উপর আঘাত আসে না। পক্ষান্তরে যদি হাদীসের ক্ষেত্রে কেউ মিশ্রিত করে তবে সেটা অত্যন্ত ঘৃণিত একটি ব্যাপার। এমন যদি কেউ করে থাকে তবে তার হাদীস গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। এ শ্রেণীর রাবীদের যাবতীয় হাদীস জাল বলে বিবেচিত হয়ে যাবে। কারণ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় হাদীসের ক্ষেত্রে এ জাতীয় কু কীর্তির আশ্রয় নেয় তাদের কাছে আর যাই হোক হাদীসের নিরাপত্তা আশা করা যায় না। অথচ সহীহ বুখারীতে আতা ইবনে সাইব এর নাম এসেছে। আর অন্যান্য আইম্মায়ে হাদীস তো তাদের স্ব স্ব হাদীস গ্রন্থে তৎকর্তৃক বর্ণিত অসংখ্য হাদীস এনেছেন। আর শায়খ আলবানী রহ. তো তার অসংখ্য হাদীসকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(গ) লেখক মহোদয় তার তাহক্বীক্ব মন্তব্যে যে আরবী অংশ উদ্ধৃত করেছেন এবং অনুবাদ করেছেন তাতে যে কি পরিমাণ বিকৃতি ঘটিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। লেখক লিখেছেন ذروه । শব্দটি হবে ذووه। অর্থ, এর সাথে অন্যান্যরা। হাফেয মিযযী রহ. কৃত তাহযীবুল কামালে وما سمع منه جرير وذووه এর স্থলে وما سمع منه جرير وذويه লেখা হয়েছিল । ফলে উক্ত গ্রন্থের নিরীক্ষক এবং টিকা লেখক ড. বাশশার আওয়াদ মা'রুফ পাদটিকায় মন্তব্য করেন ضبب عليها المؤلف لان الصواب: ذووه। অর্থ, লেখক শব্দটি মিশ্রিত করে

ফেলেছেন। কারণ সঠিক শব্দ হলো ذووه। তাহযীবুল কামাল পার্শটিকা সংযুক্ত ২০/৯১

এরপর লেখক লিখেছেন ليس من صحيحِ حديثُهُ। মূলত হবে ليس من صحيحِ حديثِهِলেখক মহোদয় লিখেছেন, والاختلاطُ। মূলত হবে والاختلاطِ। লেখক মহোদয়ের আরবী উদ্ধৃতি এবং তার অনুবাদটুকু আবার দেখুন,

ذروه ليس من صحيحِ حديثُهُ... والاختلاطُ جميعا ولا يحتج بحديثه

সুতরাং তাকে পরিত্যাগ কর। কারণ তার কোন ছহীহ হাদীছ নেই; বরং সম্পূর্ণই মিশ্রিত। তাই তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না'।

আরবী মন্তব্যটুকু কিন্তু ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. এর। লেখক এটা কার মন্তব্য সে ব্যাপারে কিছু বলেননি। তবে পাদটিকায় তাহযীবুত তাহযীবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এবার ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. এর মূল মন্তব্য এবং হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. কৃত তাহযীবুত তাহযীবের মূল উদ্ধৃতি দেখুন,

> وقال بن معين عطاء بن السائب اختلط وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديثه وقد سمع منه أبو عوانة في الصحيح والاختلاط جميعا ولا يحتج بحديثه تهذيب التهذيب – ١٨٤/٧
>
> অর্থ: ইবনে মাঈন বলেন, আতা ইবনে সায়িব হাদীসের ক্ষেত্রে এলোমেলো হয়ে গেছেন। জারীর এবং তার সহবর্ণনাকারীগণ তার থেকে যেসব হাদীস শ্রবণ করেছে সেগুলো তার সহীহ হাদীস নয়। অর্থাৎ তারা তার সহীহ হাদীস শ্রবণ করেনি। আবূ আওয়ানা তার মিশ্রিত কালীন এবং সুস্থকালীন উভয় সময়কার হাদীস শ্রবণ করেছেন। ফলে তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়। –তাহযীবুত তাহযীব ৭/১৮৪

কোনো কোনো রিজাল গ্রন্থে ولا يحتج بحديثه এর স্থলে فلا يحتج بحديثه রয়েছে। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, বাক্যটির অর্থ আবূ আওয়ানার হাদীস দলীলযোগ্য নয়। যেমন আলকাওয়াকিবুন নাইয়িরাতে বলা হয়েছে,

وما سمع منه جرير ليس من صحيحِ حديثِهِ وسمع منه أبو عوانة في الصحة والاختلاطِ فلا يحتج بحديثه الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات – ٣٢٣/١

সুতরাং ولا يحتج بحديثه এর অর্থ হবে আবূ আওয়ানা এর হাদীস দলীলযোগ্য হবে না। 'আতা ইবনে সায়িব এর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না কিংবা তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়' এমন অর্থ গ্রহণ করার সুযোগ নেই। প্রশ্ন হলো, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের উদ্ধৃতি এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে এ যে বিকৃতি

সাধন হলো তা কি সাবধানতায় হয়েছে না অসাবধানতায় হয়েছে। এ বিকৃতিকে কি ভুল বা অসাবধানতা বলে সাহজিক করে দেখার কোনো সুযোগ আছে? ভুলেরও তো একটা সীমানা আছে। এমন বিকৃত ভুলকে তো কোনো সংজ্ঞাতেই ফালানো যায় না।

(ঘ) লেখক মহোদয় বলেছেন, 'আহমদ ইবনে আবী খায়ছামা বলেন, 'তার সমস্ত হাদীছই যঈফ'। পাদটিকায় লেখক মহোদয় মন্তব্যটুকুর মূল আরবী উল্লেখ করে দিয়েছেন। আর তা হলো, حديثه ضعيف। আরবী অংশটুকুর সরল অনুবাদ হলো, তার হাদীস যঈফ। প্রশ্ন হলো, লেখক মহোদয় তার অনুবাদে 'সমস্ত' এবং 'ই' উপসর্গ কোত্থেকে এনে জুড়ে দিলেন? আহলে হাদীস শিরোনামে যারা দীনকে অনুসরণ করে চলেন, তারা হাদীসের গভীরে যেতে পছন্দ করেন না। বাহ্যিক অর্থটাই গ্রহণ করে তারা দীন অনুসরণের কাজ চালাতে চান। তো আপনি একজন আহলে হাদীস আলেম হয়ে এ কেমন গভীরের অর্থ করলেন? যে অর্থের সাথে বাহ্যিক অর্থের কোনো সাযুজ্য নেই। আপনার অনুবাদ যদি যথার্থ হয়ে থাকে তবে তো আপনাদের নিকট আতা ইবনে সায়িব রহ. কর্তৃক বর্ণিত কোনো হাদীসই গ্রহণ করা যাবে না। ফলে আলবানী রহ. এর সিলসিলা সহীহাসহ অন্যান্য সহীহ হাদীস গ্রন্থের হাদীসের তালিকাকে নবায়ন করতে হবে। কারণ আলবানী রহ. আতা ইবনে সায়িব রহ. এর বহু হাদীসকে সহীহ হাদীসের তালিকাভুক্ত করেছেন। সুতরাং সেগুলোকে অপাঙ্‌ক্তেয় ঘোষণা করে সহীহ হাদীসের নতুন তালিকা প্রকাশ করুন।

দ্বিতীয় কথা হলো, সংশ্লিষ্ট মন্তব্যটুকু কি আহমদ ইবনে আবী খায়সামার? যেমনটি লেখক মহোদয় বলেছেন? এখানে কিন্তু চরম পর্যায়ের একটি বিপত্তি ঘটে গেছে। বস্তুত মন্তব্যটি হলো, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. এর। এবার তাহলে লেখক মহোদয়ের সূত্র সে মীযানুল ই'তিদাল এর আরবী উদ্ধৃতিটি দেখুন:

> وقال أحمد ابن أبي خيثمة ، عن يحيى: حديثه ضعيف ، إلا ما كان عن شعبة ، وسفيان
>
> অর্থ, আহমদ ইবনে আবূ খায়সামা ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. থেকে বর্ণনা করে বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেছেন, তার হাদীস যঈফ। তবে শু'বা এবং সুফইয়ান রাযি. সূত্রে বর্ণিত হাদীস যঈফ নয়। –মীযানুল ই'তিদাল ২/৪২

অন্যদিকে লেখক মহোদয় ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. এর মন্তব্যের প্রথমাংশ উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় অংশ তথা 'তবে শু'বা এবং সুফইয়ান রাযি. সূত্রে বর্ণিত হাদীস যঈফ নয়' উল্লেখ করেননি। যদি এ অংশটুকু উল্লেখ করতেন তবে 'তার সমস্ত হাদীছই যঈফ' অনুবাদ করার মত অসৌজন্যমূলক আচরণ করতে পারতেন না। এ যে বিপত্তিগুলো লেখকের ক্ষেত্রে ঘটে গেছে তা কি লঘু বা ক্ষুদ্র বিচ্যুতির পর্যায়ে পড়ে? এ প্রশ্নটি আহলে হাদীস বৃত্তের উচু পর্যায়ের উলামায়ে কেরামের নিকট আমরা বিনীতভাবে উত্থাপন করলাম।

আতা ইবনে সায়িব রহ. সম্বন্ধে আমাদের আলাদা কোনো দুর্বলতা নেই। রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ হাদীসের মান নির্ণয়ের দীনী স্বার্থে যে ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেন আমরাও তদ্রূপ একই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করি। তবে যার যতটুকু মর্যাদা বা অধিকার প্রাপ্য তাকে ততটুকু মর্যাদা বা অধিকার তো প্রদান করতেই হবে। নতুবা সে নিগ্রহের শিকার হয়ে মাজলুম বলে বিবেচিত হবে। আর জুলুমের পরকালীন দণ্ড তো অতীব মর্মন্তুদ। আলোচিত রাবীর শুরু যুগ সম্বন্ধে কেউ কোনো বিরূপ মন্তব্য করেননি। শেষ বয়সে এসে তিনি স্মৃতিশক্তির দৌর্বল্যে আক্রান্ত হয়ে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে খেই হারিয়ে ফেলেন। যেটা সাধারণত বয়সী মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। এজন্য তো পূর্ণ জীবনটিকে সমালোচিত করা যায় না। এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে তার সব হাদীসকেই অপাংক্তেয় ঘোষণা করে দেয়া যায় না। যেমনটি এ যাবত কেউ করেনি। কিন্তু লেখক মহোদয় হাদীস শাস্ত্রবিদদের ভাষ্যকে কাট ছাট করে আতা ইবনে সায়িব রহ. এর যে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে তো তিনি চরম পর্যায়ের জুলুমের শিকার হয়েছেন। তাই আলোচিত রাবী সম্বন্ধে একটু স্বচ্ছ ধারণা লাভের জন্য হাদীস শাস্ত্রজ্ঞদের কিছু মন্তব্য-ভাষ্য তুলে ধরছি।

অভিযুক্ত রাবী বিষয়ক আলোচনা

১। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

> রিজাল শাস্ত্রজ্ঞদের সামগ্রিক বক্তব্যে প্রমাণিত হয়, সুফইয়ান সাউরী, শু'বা, যুহাইর, যায়েদা, হাম্মাদ বিন যায়েদ এবং আউয়ূব কর্তৃক তার সূত্রে বর্ণিত হাদীস সহীহ। আর অন্যান্যদের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারটি স্থগিত থাকবে। তবে হাম্মাদ ইবনে সালামা এর ব্যাপারে রিজালবিদদের উক্তিভিন্নতা রয়েছে। –তাহযীবুত তাহযীব ৭/১৮৫

২। ইবনে হিব্বান রহ. বলেন,

> শেষ জীবনে তার স্মৃতি বিভ্রাট ঘটে ছিল। তবে সে স্মৃতি বিভ্রাট এতটা চরম পর্যায়ের ছিল না যে অতীত জীবনে

বিশুদ্ধ বর্ণনায় কৃতিত্বের সাক্ষর রাখার পর তার ন্যায়পরায়নতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে কিংবা লীন হয়ে যাবে। –কিতাবুস সিকাত ৭/২৫১, তাহযীবুত তাহযীব ৭/১৮৫

৩। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন,

আতা ইবনে সায়িব শেষ জীবনে স্মৃতিবিভ্রাটে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং যারা তার থেকে অতীতে হাদীস শ্রবণ করেছে তার সূত্রে তাদের বর্ণিত হাদীস সহীহ। –তাহযীবুল কামাল ২০/৯১

৪। ইমাম বুখারী রহ. বলেন,

ইয়াহইয়া ইবনুল কাত্তান বলেছেন, আতা ইবনে সায়িব এর পূর্ব যুগের হাদীস সম্বন্ধে কেউ কোনো বিরূপ মন্তব্য করেছে বলে আমি শুনিনি। –আততারীখুল কাবীর ৬/১৩৮

৫। ইবরাহীম বিন মাহদী বলেন,

আমি হাম্মাদ বিন যায়েদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা আইউব এর নিকট আসলাম। তিনি বললেন, কুফা থেকে আতা ইবনে সায়িব এসেছে। সে একজন সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তোমরা তার নিকট গিয়ে তাসবীহ সংক্রান্ত তার পিতার হাদীস সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করো। –আবুল ওয়ালীদ বাজী, আততা'দীল ওয়াত তাজরীহ লিমান খাররাজা লাহুল বুখারী ফিল জামিইস সহীহ ৪/৯৬

৬। ইবনে সা'দ রহ. বলেন,

আতা ইবনে সায়িব রহ. ১৩৬ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। তিনি সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তার থেকে বড় বড় ইমামগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম শু'বা রাযি. কে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যদি সে তোমার নিকট এক ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করে তাহলে সে সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য। আর যদি যাজান, মাইসারা এবং আবুল বুখতারীর মত একাধিক ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করে তবে তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকো। –আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ ৫/১৬৯

৭। ইমাম আহমদ রহ. বলেন,

আতা ইবনে সায়িব একজন সিকাহ এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি প্রতি রাতে কুরআন খতম করতেন। –ইমাম

যাহাবী, আলকাশেফ ফী মা'রিফাতি মান লাহু রিওয়াইয়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তাহ ১/৭

৮। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

আতা ইবনে সায়িব একজন প্রসিদ্ধ তাবিয়ী এবং তিনি হাসানুল হাদীস পর্যায়ের একজন বর্ণনাকারী। –আলমুগনী ফিযযু'আফা ১/৪২৫

৯। হাফেয মিযযী রহ. বলেন,

যারা বলে কাইস ইবনে সা'দ এবং ইবনে জুরাইজ আতা ইবনে সায়িবকে শেষ জীবনে পরিত্যাগ করেছে, তাদের প্রতি উত্তরে ইমাম যাহাবী রহ. মীযানুল ই'তিদালে বলেন, আমি বলি, এখানে পারিভাষিক পরিত্যাগ করা উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, তারা তার থেকে হাদীস লেখাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। –তাহযীবুল কামাল ২০/৮৬

১০। আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইজলী রহ. বলেন,

আতা ইবনে সায়িব শুরু জীবনে সিকাহ পর্যায়ের শায়খ ছিলেন। –প্রাগুক্ত ২০/৯১

১১। আবূ হাতেম রাযী রহ. বলেন,

আতা ইবনে সায়িব স্মৃতিবিভ্রাটে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সততার পর্যায়ভুক্ত রাবী ছিলেন। এবং গ্রহণযোগ্য হাদীসের রাবী ছিলেন। –প্রাগুক্ত ২০/৯২

১২। ইমাম নাসায়ী রহ. বলেন,

তিনি তার শুরু জীবনের হাদীসের ব্যাপারে সিকাহ ছিলেন। –প্রাগুক্ত

১৩। হাফেয মিযযী রহ. বলেন,

ইমাম বুখারী রহ. আতা ইবনে সায়িব রহ. এর হাদীস সমর্থন লাভের উদ্দেশে এনেছেন। এবং মুসলিম রহ. ব্যতিরেকে কুতুবে সিত্তার সকল লেখকগণ তার হাদীস তাদের গ্রন্থে এনেছেন। –প্রাগুক্ত ২০/৯৪

১৪। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এবং আবূ দাউদ রহ. আতা ইবনে সায়িবকে সিকাহ বলে অভিহিত করেছেন। –মীযানুল ই'তিদাল ২/৪৯

১৫। আলকাওয়াকিবুন নাইয়িরাত গ্রন্থের রচয়িতা মুহাম্মাদ যাহাবী রহ. বলেন,

হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ আতা ইবনে সায়িবকে সিকাহ এবং সৎকর্মপরায়ণ বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন সূত্রে তার যু'ফ বা দুর্বলতার বর্ণনাও বর্ণিত হয়েছে। তবে তার থেকে উক্ত রাবীর ব্যাপারে যেসব মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে তা সবই স্মৃতিবিভ্রাট কালীন। হাফেয ইবনুস সালাহ রহ. বলেন, আতা ইবনে সায়িব শেষ বয়সে স্মৃতি বিভ্রাটে আক্রান্ত হয়েছিলেন। উলামায়ে কেরাম তার থেকে বড় বড় ব্যক্তিত্বদের কৃত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। আর যারা শেষ বয়সে তার সূত্রে হাদীস শ্রবণ করেছেন তাদের বর্ণনা দ্বারা উলামায়ে কেরাম প্রমাণ পেশ করেননি। –মুহাম্মাদ যাহাবী, আলকাওয়াকিবুন নাইয়িরাত ১/৬১

১৬। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন,

সুফইয়ান, শু'বা এবং হাম্মাদ ইবনে সালামা সূত্রে আতা ইবনে সায়িব রহ. এর হাদীস গ্রহণযোগ্য। তবে জারীর ইবনে আব্দুল হুমাইদ এবং তার পর্যায়ের রাবীদের সূত্রে আতা ইবনে সায়িব রাযি. এর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শেষ বয়সে আতা ইবনে সায়িব রাযি. স্মৃতি বিভ্রমে আক্রান্ত হয়ে ছিলেন। –তারীখে ইবনে মাঈন ৩/৩০৯

১৭। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

আতা ইবনে সায়িব রহ. ইমাম, হাফেয এবং কুফার মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি বড় বড় উলামায়ে কেরামের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তবে শেষ বয়সে তিনি কিছুটা স্মৃতি দৌর্বল্যে আক্রান্ত হয়ে পড়ে ছিলেন। –সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/১১০

১৮। ইমাম আহমদ রহ. বলেন,

আতা ইবনে সায়িব সিকাহ সিকাহ ছিলেন। অর্থাৎ তিনি অনেক বেশি সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য ছিলেন। –প্রাগুক্ত

১৯। আবূ বকর ইবনে আইয়াশ রহ. বলেন,

যখন আমি আতা ইবনে সায়িব এবং জিরার ইবনে মুররা রাযি. কে দেখতাম তখন তাদের চেহারায় ক্রন্দনের নিদর্শন দেখতে পেতাম। –প্রাগুক্ত

২০। ইমাম যাহাবী রহ. তার 'মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়াহুয়া মুওয়াস্‌সাকুন আউ সালিহুল হাদীস' গ্রন্থে আতা ইবনে সায়িব রহ. এর নাম এনেছেন। –মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়াহুয়া মুওয়াস্‌সাকুন আউ সালিহুল হাদীস ১/২৫৫

২১। ইমাম বুখারী রহ. তার সহীহ গ্রন্থে আতা ইবনুস সায়িব রাযি. এর হাদীস এনেছেন। –সহীহুল বুখারী, রিকাক অধ্যায়, আলহাউজ...অনুচ্ছেদ; হাদীস ৬৫৭৮

এ ছিল আতা ইবনে সায়িব রাযি. সম্বন্ধে রিজালবিদদের কিছু মন্তব্য।

সংশ্লিষ্ট বর্ণনার সূত্রপীঠিকার মাঝে হাম্মাদ ইবনে শু'আইব নামে আরো একজন রাবী রয়েছে। তো এ বর্ণনাকারী সম্পর্কে লেখক মহোদয় যে দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতে চান তার সাথে আমরা ঐকমত্য পোষণ করছি। সত্য এবং শুদ্ধতার ব্যাপারে আমরা সদা আপসহীন থাকতে চাই। আল্লাহ আমাদের এ সদিচ্ছার উপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন। তবে লেখক মহোদয় উপরোক্ত রাবী সম্বন্ধে রিজালবিদদের মন্তব্য উদ্ধৃত করতে গিয়ে কোনো অসঙ্গতি কিংবা বিপত্তিতে আক্রান্ত হয়েছেন কি না সে ব্যাপারে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিতে আমরা আপাতত অগ্রসর হচ্ছি না। তবে বিশ রাক'আত বিষয়ক আলী রাযি. এর এ বর্ণনাটি সূত্রগত দিক থেকে দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য হলেও এর সপক্ষে অসংখ্য বিশুদ্ধ বর্ণনা থাকার কারণে আমলগত দিক থেকে একে দুর্বল বলার কোনো সুযোগ নেই। সে কারণেই ইমাম যাহাবী এবং শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. আলী রাযি. এর এ বর্ণনাটিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তেমনিভাবে মদীনা ভার্সিটির সাময়িকীতেও এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে। দেখুন ইমাম যাহাবী, আলমুনতাকা মিন মিনহাজিল ই'তিদাল ১/১৩৬, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ ফী নাকজি কালামিশ শী'আহ ৮/১৬১, ড. আব্দুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম, মাওকিফু শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ মিনার রাফিযাহ ১/২২২, মাজাল্লাতুল জামি'আতিল ইসলামিয়া বিল মাদীনাতিল মুনাওয়ারাহ ৩/১৭৪।

ইমাম বাইহাকী রহ. আলোচিত এ হাদীসকে এনেছেন একটি হাদীসের বিষয়বস্তুকে শক্তিমান করার উদ্দেশে। হাদীসটি হলো, বাইহাকী রহ. বলেন, শুতাইর বিন শাকাল রহ. সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা এসেছে, তিনি রমাযান মাসে লোকদের নিয়ে বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন। এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। সুনানে বাইহাকী ২/৪৯৬। শাব্দিক সামান্য ব্যাবধানে হাদীসটি সম্পূর্ণ সনদসহ মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতে বর্ণিত হয়েছে। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ১৫/৪২৯/৭৬৮০। ইমাম বাইহাকী রহ.

উপরোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করার পর 'এ বিষয়ে যথেষ্ট শক্তিমত্তা রয়েছে কারণ...' বলে আলোচিত আলী রাযি. এর হাদীসটি উল্লেখ করেন।

তাছাড়া সংশ্লিষ্ট হাদীসটি দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে লেখক মহোদয়ও মনে হয় নিশ্চিত নয়। তাই তিনি হাদীসটি সম্বন্ধে আলোচনা শেষে বলেন, 'অতএব একে ভিত্তিহীন বলাই শ্রেয়।' অর্থাৎ হাদীসটিকে ভিত্তিহীন না বলারও সুযোগ আছে। যদিও তখন শ্রেয় হবে না কিন্তু বৈধ হবে। কারণ বৈধ হয়েও উত্তম বা শ্রেয় না হতে পারে। আর শ্রেয় না হলে অবৈধ হওয়া আবশ্যক নয়।

লেখকের আপত্তি ১৫

লেখক মহোদয় তার পুস্তিকার ৩৭ নাম্বার পৃষ্ঠায় দশ নাম্বারে বিশ রাক'আত তারাবীহ সংক্রান্ত তাবিয়ী বক্তব্য এনেছেন। বক্তব্যটির সূত্রসহ আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

> حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال أدركت الناس وهم يصلون ثلاثة وعشرين ركعة بالوتر
>
> অর্থ: আতা রাযি. বলেন, আমি লোকদেরকে বিতরসহ ২৩ রাক'আত নামায আদায় করা অবস্থায় পেয়েছি। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদীস, ৭৬৮৮

লেখক মহোদয় হাদীস সম্বন্ধে 'তাহক্বীক্ব' শিরোনামে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

> উক্ত বর্ণনাটিও পূর্বোক্ত বর্ণনার ন্যায় যঈফ, মুনকার ও অভিযুক্ত। কারণ এ বর্ণনাতেও পূর্বে আলোচিত মুনকার রাবী আত্বা ইবনে সায়িব রয়েছে।

পর্যালোচনা

এ হলো লেখক মহোদয়ের 'তাহক্বীক্ব'। যদি ধরেও নেয়া হয় উক্ত আতা দ্বার আতা ইবনে সায়িব উদ্দেশ্য। তবুও তো হাদীসটিকে ঢালাওভাবে যঈফ, মুনকার ও অভিযুক্ত বলার অবকাশ নেই। কারণ আমরা পূর্বের আলোচনায় রিজালবিদদের বক্তব্যের আলোকে হাদীসের ক্ষেত্রে তার প্রকৃত অবস্থান পরিষ্কার করেছি। তাতে এভাবে ঢালাও মন্তব্যের কোনো সুযোগ নেই। তাছাড়া যদি তিনি আতা ইবনে সায়িব হয়ে থাকেন তবে তার থেকে যে আব্দুল মালিক বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন আব্দুল মালিক ইবনে আব্দুল আযীয ইবনে জুরাইজ। যিনি ইবনে জুরাইজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে আছেন। আর পেছনে আমরা প্রমাণ করে এসেছি, আতা ইবনে সায়িব থেকে ইবনে জুরাইজের মত বড় বড় ব্যক্তিবর্গ যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তা সবই শুদ্ধ। কারণ তাঁরা তার স্মৃতি দৌর্বল্যে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তার থেকে হাদীস শ্রবণ

করেছেন। তো এটা ছিল সম্ভাবনার কথা। কিন্তু বাস্তবতা এবং রিজাল শাস্ত্রের বক্তব্য হলো, এখানে যে আতা এর নাম এসেছে তিনি আতা ইবনে সায়িব নন; তিনি হলেন তাবিয়ী যুগের উজ্জ্বল নক্ষত্র আতা ইবনে আবী রাবাহ। সূত্রপীঠিকায় 'ইবনে নুমাইর–আব্দুল মালিক–আতা' হিসেবে যাদের নাম এসেছে তাদের মূল পরিচিতিমূলক বিবরণ হলো, 'আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবী শাইবা–আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর–আব্দুল মালিক ইবনে আবী সুলাইমান মাইসারাহ ইবনে জুরাইজ–আতা ইবনে আবি রাবাহ। বিশ্লেষণের জন্য দেখুন তাহযীবুল কামাল ২০/৭৪, ১৬/২২৬-২৭' ১৮/৩২৩' তাহযীবুত তাহযীব ৬/৩৮২।

তো লেখক মহোদয় কি এসব তারকা রাবীদেরকে আক্রান্ত করার সুযোগ পাবেন? রিজাল শাস্ত্রবিদদের নিকট কিন্তু এরা উঁচু মর্গের পদমর্যাদা পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তো লেখক মহোদয়ের এ জাতীয় ভুলকে কি নামে আখ্যায়িত করা যায়? পুস্তিকার শিরোনামে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কথা বলে এ কেমন বিশ্লেষণ করা হলো? মানুষকে বিভ্রান্ত করার এ দায় কি লেখক এড়াতে পারবেন? আমরা দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা লেখককে ক্ষমা করে দিন।

লেখকের আপত্তি ১৬

লেখক মহোদয় তার পুস্তিকার ৩৭ নাম্বার পৃষ্ঠায় এগার নাম্বারে বিশ রাক'আত তারাবীহ সংক্রান্ত আবুল আলিয়া সূত্রে উমর রাযি. এর নির্দেশনা উদ্ধৃত করেছেন। সূত্রসহ নির্দেশনাটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

> أخبرنا أبو عبدالله محمود بن أحمد بن عبدالرحمن الثقفي بأصبهان أن سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي أخبرهم قراءة عليه أنا عبدالواحد بن أحمد البقال أنا عبيدالله بن يعقوب بن إسحاق أنا جدي إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن جميل أنا أحمد بن منيع أنا الحسن بن موسى نا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن عمر أمر أبيا أن يصلي بالناس في رمضان فقال إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن (يقرؤا) فلو قرأت القرآن عليهم بالليل فقال يا أمير المؤمنين هذا (شيء) لم يكن فقال قد علمت ولكنه أحسن فصلى بهم عشرين ركعة (إسناده حسن)
>
> অর্থ: আবুল আলিয়া সূত্রে বর্ণিত, উমর রাযি. উবাই ইবনে কা'ব রাযি. কে রমাযান মাসে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, লোকজন দিনের বেলা রোযা রাখে। সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে না। যদি তুমি রাতে (নামাযে) তাদের কুরআন পাঠ করে শোনাতে! উবাই

ইবনে কা'ব রাযি. বললেন, আমীরুল মু'মিনীন এ পদ্ধতি তো আগে ছিল না। উমর রাযি. বললেন, আমি জানি। তবে এ পদ্ধতিটি অতি সুন্দর। এরপর উবাই ইবনে কা'ব রাযি. লোকদের নিয়ে ২০ রাক'আত নামায আদায় করেন। –যিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ মাকদিসী, আলআহাদীসুল মুখতারাহ ১/২২১/১১৬১

মুহাক্কিক (খুব সম্ভব) আব্দুল মালিক বিন আব্দুল্লাহ হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন। প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ আলওয়াফী বিল ওয়াফাইয়াত এর রচয়িতা ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ সাফাদী রহ. বলেন, আলআহাদীসুল মুখতারাহ এর হাদীসগুলো দলীলযোগ্য। আলওয়াফী বিল ওয়াফাইয়াত ১/৪৭৩

লেখক তাঁর তাহক্বীক্ব শিরোনামের আলোচনায় বলেন,

> এ বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার। এর সনদে আবূ জা'ফর নামে একজন ত্রুটিযুক্ত রাবী আছে। যার আসল নাম ঈসা ইবনে আবী ঈসা মাহান। ইমাম আহমদ ও নাসায়ী (রহঃ) বলেন, 'সে নির্ভরযোগ্য নয়'। ইমাম যাহাবী তাঁর 'যু'আফা' গ্রন্থে বলেন, আবূ যুর'আহ তার সম্পর্কে বলেছেন, 'সে প্রচুর ভুল করে'। তিনি তাঁর 'আলকুনা' গ্রন্থে বলেন, 'প্রত্যেক মুহাদ্দিছই তাকে অভিযুক্ত করেছেন'। ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেন, 'স্মৃতিশক্তিতে ত্রুটি রয়েছে'। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) বলেন, صَاحِبُ مَنَاكِيرَ لَا يَحْتَجُّ بِمَا تَفَرَّدَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْبَتَّةَ
>
> 'সে প্রচুর মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী। যে হাদীছগুলো সে এককভাবে বর্ণনা করেছে সেগুলো থেকে মুহাদ্দিছগণ কখনোই দলীল গ্রহণ করেননি'। ইবনে হিব্বান বলেন, 'প্রসিদ্ধ রাবী থেকে এককভাবে অনেক মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী'। শায়খ আলবানী বলেন, 'এর সনদ যঈফ'। এছাড়াও ছহীহ হাদীছ সমূহের সম্পূর্ণ বিরোধী।

পর্যালোচনা

আমরা উপরোক্ত রাবী আবূ জা'ফর রহ. সম্বন্ধে নিম্নে অন্যান্য জগতখ্যাত রিজালবিদদের মন্তব্য তুলে ধরছি। এতে করে সংশ্লিষ্ট রাবী সম্বন্ধে প্রকৃত বাস্তবতা বেরিয়ে আসবে।

অভিযুক্ত রাবী বিষয়ক আলোচনা

১। প্রসিদ্ধ রিজাল গ্রন্থ মীযানুল ই'তিদালের উপনাম অধ্যায়ে ইমাম যাহাবী রহ. আবূ জা'ফর রহ. এর সূত্রে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ সূত্রের রাবী কাতাদা রহ. আহনাফ রাযি. এর সাক্ষাৎ লাভ না করার কারণে ইমাম যাহাবী রহ. হাদীসটিকে মুনকার বলে অভিহিত করেছেন। আবূ জা'ফর রাযী সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করেননি। আর এ গ্রন্থে অসংখ্য সিকা এবং নির্ভরযোগ্য রাবীদের আলোচনা রয়েছে। এ বিষয়টি ইমাম যাহাবী রহ. নিজেই গ্রন্থটির ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। –মীযানুল ই'তিদাল ৪/৫১০/১০০৬৫। আর মূল নাম অধ্যায়ে ইমাম যাহাবী রহ. আবূ জা'ফর রাযী সম্বন্ধে বলেন,

> সালিহুল হাদীস-হাদীস উপযোগী। অর্থাৎ সে হাদীস গ্রহণ করার উপযুক্ত। –মীযানুল ই'তিদাল ৩/৩১৯/৬৫৯৫

২। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন,

> আবূ জা'ফর রাযী সিকা তথা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের রাবী। ইমাম আবূ হাতেম রাযী রহ. বলেন, আবূ জা'ফর রাযী সিকা এবং সাদুক পর্যায়ের রাবী। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং নাসায়ী রহ. বলেন, সে শক্তিশালী রাবী নয়। (তাদের মন্তব্য ভাষ্যটি হল ليس بالقوي । কিন্তু লেখক মহোদয় ভাষ্যটির অর্থ করেছেন 'সে নির্ভরযোগ্য নয়'। অথচ এর অর্থ হল সে মজবুত বা শক্তিশালী নয়।) তবে অন্যত্র ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. তাকে সালিহুল হাদীস বলে অভিহিত করেছেন। ইবনুল মাদিনী রহ. বলেন, তিনি সিকাহ। তবে তিনি মিশ্রিত করে ফেলতেন। অন্যত্র তিনি বলেন, তার হাদীস লেখা যাবে। তবে তিনি ভুল করতেন। ইবনুল মাদিনী রহ. অন্যত্র বলেন, সে আমাদের নিকট সিকাহ। আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমি আবূ জা'ফর রাযীকে বলতে শুনেছি, আমি যুহরী থেকে হাদীস লিখিনি। কারণ সে কাল খিজাব ব্যবহার করত। –সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/৩৪৭

৩। ইবনে সাদ রহ. বলেন,

> আবূ জা'ফর রহ. সিকাহ ছিলেন। –তাবাকাতে ইবনে সাদ ৬/২০০

৪। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আম্মার বলেন,

> সে সিকাহ ছিল। ইবনে আদী রহ. বলেন, তার অনেক গ্রহণযোগ্য হাদীস রয়েছে। তার অধিকাংশ হাদীসই সঠিক। আমি আশা করি তার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। ইমাম মুসলিম রহ. ব্যতীত ইমাম বুখারী রহ. (আলআদাবুল মুফরাদ) সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম তার হাদীস বর্ণনা করেছেন। –তাহযীবুল কামাল ৩৩/১৯৫-১৯৬

উপরন্তু ইমাম জিয়াউদ্দীন মাকদেসী কৃত আলআহাদীসুল মুখতারাহ এর মাকতাবা শামেলা সংস্করণে হাদীসটির সনদকে হাসান বলা হয়েছে। যার আরবী পাঠ ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। হাদীস শাস্ত্রের জীবন্ত নক্ষত্র শায়খ মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবও হাদীসটিকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন। –আলকাউসার অক্টোবর-নভেম্বর '০৫, পৃষ্ঠা ১৮

অভিসন্দর্ভ গ্রন্থ 'দলীলসহ নামাযের মাসায়েল' এর বিদগ্ধ লেখক শায়খ আব্দুল মতিন সাহেব দা.বা. হাদীসটির উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন,

> এ হাদীসটির একজন রাবী হলেন, আবূ জাফর রাযী ঈসা ইবনে আবূ ঈসা মাহান। তার কারণে আলবানী সাহেব এবং তারই অনুসরণে মুযাফফর বিন মুহসিন হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। এই রাবী সম্পর্কে বড় বড় হাদীসবিশারদগণের ভাল মন্তব্যগুলো চেপে রেখে তারা শুধু সমালোচনামূলক মন্তব্যগুলো উল্লেখ করে গেছেন। তাতেও আবার কাটছাট ও অর্থ বিকৃত করার ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা বইয়ের ৩৮ নং পৃষ্ঠায় মুযাফফর বিন মুহসিন লিখেছেন, 'ইমাম আহমদ ও নাসায়ী (রহঃ) বলেন, 'সে নির্ভরযোগ্য নয়'। অথচ তারা বলেছেন তিনি ليس بالقوى মজবুত নন। এছাড়া ইমাম আহমদ এও বলেছেন, صالح الحديث তিনি সঠিক হাদীস বর্ণনাকারী। কিন্তু তার এ মন্তব্যটিও লেখক চেপে গেছেন। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর মন্তব্যটি তিনি এভাবে পেশ করেছেন– স্মৃতিশক্তিতে ত্রুটি রয়েছে। অথচ তার পুরো মন্তব্য হলো, صدوق سيئ الحفظ তিনি সাদূক বা সত্যনিষ্ঠ তবে দুর্বল স্মৃতির অধিকারী। এমনিভাবে ইমাম যাহাবীর মন্তব্য এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– 'তিনি তার আল কুনা গ্রন্থে বলেন, প্রত্যেক মুহাদ্দিসই তাকে অভিযুক্ত করেছেন। অথচ যাহাবী আল কুনায় তার সম্পর্কে কোন মন্তব্যই করেননি। করবেন কি করে, তিনি নিজেই তো মুগনী গ্রন্থে বলেছেন, صدوق তিনি সত্যনিষ্ঠ। আর মীযান গ্রন্থে বলেছেন, صالح الحديث তিনি সঠিক হাদীস বর্ণনাকারী। এছাড়া আলী ইবনুল মাদীনী, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইবনে সা'দ, ইবনে আম্মার, আবূ হাতেম রাযী, হাকেম ও ইবনে আব্দুল বার্‌র সকলেই তাকে ছিকাহ বা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবনে আদী আলকামিল গ্রন্থে বলেছেন, তার অধিকাংশ হাদীসই সঠিক, আমি মনে করি তার মধ্যে সমস্যার কিছু নেই। ইমাম বুখারী তার আলোচনা করেছেন আত তারীখুল কাবীর (নং ২৭৯০) ও আল আওসাত (নং ১৯৫৬) গ্রন্থদ্বয়ে। কিন্তু তিনি কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি। –দলীলসহ নামাযের মাসায়েল (বর্ধিত সংস্করণ) ৪০৯-৪১০

উল্লেখ্য, ইমাম যাহাবী রহ. এর 'যু'আফা' বলতে আলমুগনী ফিযযুআফা উদ্দেশ্য। সুতরাং মূল গ্রন্থের নাম হল আলমুগনী ফিযযুআফা। আর ইমাম যাহাবী রহ. এর আল কুনা নামে কোনো গ্রন্থ নেই। তাঁর কুনা বা উপনাম বিষয়ক গ্রন্থের নাম হল আলমুকতানা ফী সারদিল কুনা। তবে এ আলকুনা দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে:

(১) সদ্যোল্লিখিত ইমাম যাহাবী রহ. এর আলমুকতানা ফী সারদিল কুনা।

(২) আলমুগনী ফিযযুআফা গ্রন্থের আলকুনা অধ্যায়।

লেখক মহোদয় তাঁর আদর্শ শায়খ আলবানী রহ. রচিত সালাতুত তারাবীহ গ্রন্থ থেকে এতদ সংক্রান্ত তথ্য গ্রহণ করেছেন। শায়খ আলবানী রহ. এর উপস্থাপনা শৈলিতে অনুমিত হয়, আলকুনা দ্বারা আলমুগনী ফিযযুআফা গ্রন্থের আলকুনা অধ্যায় উদ্দেশ্য। শায়খ আলবানী রহ. এর মন্তব্য হল,

> قلت: وهذا إسناد ضعيف أبو جعفر هذا واسمه عيسى بن أبي عيسى بن ماهان أورده الذهبي في "الضعفاء" وقال "قال أبو زرعة: يهم كثيرا وقال أحمد: ليس بقوي وقال مرة: صالح الحديث وقال الفلاس: سيء الحفظ وقال آخر ثقة" ثم أعاده الذهبي في "الكنى" وقال جرحوه كلهم. صلاة التراويح لمحمد الألباني – ١/٨٠

শায়খ আলবানী রহ. বলছেন, যাহাবী রহ. তাকে যুআফায় এনেছেন। এবং বলেছেন, ...অতঃপর আবার তাকে কুনায় এনেছেন।...। উল্লেখ্য, এখানে আলবানী রহ. আবূ জাফর সম্বন্ধে হাদীস বেত্তাদের দু'টি মন্তব্যই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লেখক মহোদয় নিছক বিরূপ মন্তব্য উল্লেখেই পরিতৃপ্ত হয়ে

গেছেন। তবে উদ্দেশ্য যেটাই হোক, আলমুকতানা ফী সারদিল কুনা এবং আলমুগনী ফিযযুআফা গ্রন্থের আলকুনা অধ্যায় উভয় জায়গায় ইমাম যাহাবী রহ. আবূ জাফর রাযী এর আলোচনা এনেছেন। আমরা উভয় জায়গাতে এবং ইমাম যাহাবী রহ. এর অন্যান্য গ্রন্থেও যথাসাধ্য অনুসন্ধান করেছি, কোথাও 'প্রত্যেক মুহাদ্দিছই তাকে অভিযুক্ত করেছেন' জাতীয় কোনো মন্তব্যের সন্ধান পাইনি। লেখক মহোদয় কি ইমাম যাহাবী রহ. এর এ মন্তব্যটির অনুসন্ধান করেছেন, নাকি এক্ষেত্রে শায়খ আলবানী রহ. এর 'তাকলীদ' করেছেন? তাকলীদ না করে কি একটু অনুসন্ধান করার প্রয়োজন ছিল না? আমরা পূর্বে আবুজাফর রাযী সম্বন্ধে ইমাম যাহাবী রহ. এর নিজস্ব মন্তব্য উল্লেখ করেছি। এবং ইমাম যাহাবী রহ. নিজে এমন অনেক ইমামের কথা উল্লেখ করেছেন যারা আবুজাফর রাযীকে সিকা বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন। এসব বিষয় কি তার উপরোক্ত মন্তব্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করে না? রিজালবিদদের جرحوه كلهم জাতীয় কোনো পরিভাষা আছে বলে তো আমরা জানি না। তাহলে আলবানী রহ. এ পরিভাষা কোথায় পেলেন? বিষয়টি হাদীস অন্বেষী গবেষকদের আশু পর্যালোচনা ও গবেষণার বিষয়।

লেখকের আপত্তি ১৭

লেখক মহোদয় তার চটি পুস্তিকার ৩৮ নাম্বার পৃষ্ঠায় ১২ নাম্বারে বিশ রাক'আত তারাবীহ বিষয়ক একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

> حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد العزيز بن رفيع قال كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث.
>
> অর্থ: আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই হতে বর্ণিত, উবাই ইবনে কা'ব রাযি. রমাযান মাসে লোকদের নিয়ে বিশ রাক'আত নামায পড়তেন এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ৭৬৮৪

লেখক তাঁর তাহক্বীক্ব শির্ষক মন্তব্যে বলেন,

> এটিও যঈফ ও মুনকার। আল্লামা নীমাভী হানাফী বলেন, 'আব্দুল আযীয ইবনে রাফী উবাই ইবনে কা'ব-এর যুগ পায়নি'। ...সুতরাং উবাই ইবনে কা'ব সম্পর্কে এরূপ উদ্ভট কথা প্রচার করলে একজন ছাহাবীর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হবে।

পর্যালোচনা

(ক) লেখক মহোদয় বলেছেন, 'হাসান আব্দুল আযীয ইবনে রাফী হ'তে বর্ণিত,..'। এর আরবী পাঠও ঠিক একই রকম উল্লেখ করেছেন। যথা حسن عن عبد العزيز بن رفيع। অথচ এখানে হাসান এবং আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই স্বতন্ত্র দু'জন রাবী। কিন্তু লেখক মহোদয় দু'জন বর্ণনাকারীকে একাকার করে দিয়েছেন। ভুলটার উৎস বা কার্যকারণ আমাদের জানা নেই। লেখক বলেছেন, 'এটিও যঈফ ও মুনকার। আল্লামা নীমাভী হানাফী বলেন, 'আব্দুল আযীয ইবনে রাফী উবাই ইবনে কা'ব-এর যুগ পায়নি'। এটি একটি মুরসাল হাদীস। মুরসাল হাদীস সম্বন্ধে আমরা পেছনে একটু বিস্তৃত আঙ্গিকে আলোচনা করেছি। পাঠককে একটু কষ্ট করে ১১৫-১১৭ পৃষ্ঠায় ঢু দিতে বলব। তো একটি মুরসাল বর্ণনাকে লেখক কি করে নির্বিষ্ট চিত্তে ঢালাওভাবে যঈফ এবং মুনকার বলে দিলেন? এভাবে যে কোনো বিষয়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া তো সৃজনশীল এবং চিন্তাশীল মানুষের লক্ষণ নয়। আর আব্দুল আযীয বিন রুফাই যে উবাই ইবনে কা'ব রাযি. এর যুগ পান নি তার জন্য সূত্রোদ্ধৃতি আর দলীল দস্তাবেজের প্রয়োজন নেই। এটা আমরা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করি। এ যুগ অপ্রাপ্তির কারণেই তো হাদীসটি মুরসাল হাদীসের আসনে সমাসীন হয়েছে। নতুবা তো হাদীসটির ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করা লেখকের জন্য বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে যেত। লেখক মহোদয় সংশ্লিষ্ট হাদীসের সূত্রবিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে আল্লামা নীমাভী রহ. এর উক্তি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নীমাভী রহ. এর আসারুস সুনান গ্রন্থটির পাতাগুলো উল্টে দেখেননি। তিনি নীমাভী রহ. এর উক্তি উল্লেখ করতে গিয়ে ৮৩ নম্বর ফুটনোটে মিরআতুল মাফাতীহ এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অথচ নীমাভী রহ. তাঁর উক্ত হাদীস গ্রন্থে হাদীস সম্বন্ধে আরো একটি মন্তব্য করেছেন। সেটা মিরআতুল মাফাতীহ এর গ্রন্থকারও উল্লেখ করেন নি এবং লেখকও উল্লেখ করেননি। কেন করলেন না? এমন প্রশ্ন উঠতে পারে। আর নীমাভী রহ. এর সে মন্তব্যটি হলো, তিনি হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন, واسناده مرسل قوى –এর ইসনাদটি একটি শক্তিশালী মুরসাল। –আসারুস সুনান; হাদীস ৭৮০, পৃষ্ঠা ২৪৭

(খ) লেখক বলেছেন, 'সুতরাং উবাই ইবনে কা'ব সম্পর্কে এরূপ উদ্ভট কথা প্রচার করলে একজন ছাহাবীর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হবে।' লেখক মহোদয়কে বিনীতভাবে প্রশ্ন করতে চাই, উবাই ইবনে কা'ব রাযি. সম্বন্ধে এ 'উদ্ভট কথা'টা কে প্রচার করেছে? 'একজন ছাহাবীর উপর মিথ্যা অপবাদ'টা কে দিয়েছে?? উত্তরটা কি হবে তা কি লেখক মহোদয় ভেবে দেখেছেন? আপনার ভাষ্যমতে এ 'ঘৃণিত কাজটি' (?) বিশিষ্ট তাবিয়ী আব্দুল আযীয বিন রুফাঈ রহ.ই করেছেন। বলুন, এমন জঘন্য (?) কাজ যে ব্যক্তি করতে পারে তার হাদীস কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে? অথচ ইমাম ষষ্ঠকসহ অসংখ্য

মুহাদ্দিসীনে কেরাম তার হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারীতেও তার বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। তবে কি এ হাদীসগুলো মউযু এবং বানোয়াট হাদীস হবে না? কারণ সে তো সাহাবীর ব্যাপারে মিথ্যারোপ করে?! জানি না, লেখক মহোদয় এ জায়গাটাতে কি বাণী শোনাবেন?

(গ) লেখক বলেছেন, 'আব্দুল আযীয বিন রুফাঈ'। আসলে কি তিনি রাফী না রুফাই? আমাদের জানা মতে তো তিনি আব্দুল আযীয বিন রুফাই। কোনটা শুদ্ধ লেখক মহোদয় কি একটু বিশ্লেষণ করে বলবেন?

লেখকের আপত্তি ১৮

লেখক মহোদয় তাঁর পুস্তিকার ৩৯ নম্বর পৃষ্ঠায় ১৩ নাম্বারে তারাবীহ বিষয়ক একটি হাদীস এনেছেন। হাদীসটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

> حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن زيد بن وهب قال كان عبد الله يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف بليل قال الاعمش كان يصلى عشرين ركعة ويوتر بثلاث
>
> অর্থ: যাইদ ইবনে ওয়াহব রাযি. বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. রমাযান মাসে আমাদের নিয়ে নামায পড়েছেন। এবং তিনি রাত্রিতেই প্রত্যাবর্তন করতেন। আ'মাশ রহ. বলেন, তিনি বিশ রাক'আত নামায পড়তেন এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। –কিয়ামু রমাযান লিমুহাম্মাদ ইবনে নাসর আলমাররুযী ১/২১, আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী; হাদীস নম্বর ৯৫৮৮

লেখক মহোদয় তাঁর তাহক্বীক্ব শিরোনামের অধীনে বলেন,

> বর্ণনাটি জাল। শেষের অংশটুকু জাল করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। আ'মাশ কর্তৃক বর্ণিত শেষাংশ ভিত্তিহীন। পূর্বের অংশটুকু তাবারাণীতে এসেছে। কিন্তু তা যঈফ ও মুনকার। তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থকার বলেন, 'এটিও সনদগত বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। কেননা আ'মাশ ইবনে মাস'উদ রাযি.-এর যুগ পাননি'। শায়খ আলবানী উক্ত বক্তব্যে একমত পোষণ করে বলেন, 'বরং তা বিভ্রান্তিকর। কারণ আ'মাশ দু'জন রাবীর মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণনা করেছেন'। অতএব জালকৃত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

পর্যালোচনা

লেখক মহোদয় প্রথমে নিরংকুশভাবে বললেন, বর্ণনাটি জাল। পরে অবশ্য তিনি নিরংকুশতা ফেলে দিয়ে বললেন, শেষের অংশটুকু জাল করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা প্রথমে মূল বর্ণনাটি নিয়ে আলোচনা করি। মূল বর্ণনাটি হলো, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. রমাযান মাসে নামায পড়িয়েছেন। মূল বর্ণনাটিতে নামাযের সংখ্যায়ন নেই। লেখকের প্রথম কথাটিতে (বর্ণনাটি জাল) অনুমিত হয়েছে, মূল বর্ণনাটিও জাল। তবে এ অনুমান নিশ্চয়তায় রূপান্তরিত হয় তার পরবর্তী বক্তব্যে। তিনি বলেন, পূর্বের অংশটুকু তাবারানীতে এসেছে। কিন্তু তা যঈফ ও মুনকার। অর্থাৎ মূল বর্ণনাটিও পরিত্যাজ্য। লেখক মহোদয় এ বক্তব্যের সাথেই মুবারকপুরী রহ. এবং আলবানী রহ. এর উদ্ধৃতি টেনেছেন। তাঁর উপস্থাপনার ধরণ দেখে প্রবল ধারণা হয়, তিনি মূল বর্ণনা তথা তাঁর বক্তব্যে পূর্বের অংশের মুনকার প্রমাণে এ উদ্ধৃতি টেনেছেন। যদি বাস্তবতা এই হয় এবং প্রবল ধারণা সত্যে পরিণত হয় তাহলে লেখকের বিচ্যুতির বড় ধরণের একটা শোডাউন কিংবা মহড়া হয়ে যাবে। এ উদ্ধৃতি তো আ'মাশ রহ. এর বক্তব্যের সাথে সম্পৃক্ত; মূল বর্ণনার সাথে সম্পৃক্ত নয়। যা উদ্ধৃতি দু'টি পাঠে খুব সহজেই উপলব্ধ হবে। এবার তুহফাতুল আহওয়াযীর গ্রন্থকার মুবারকপুরী রহ. এর পূর্ণ বক্তব্যটি লক্ষ্য করুন। তিনি বলেন,

> وفي قيام الليل قال الأعمش كان أي بن مسعود يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث وهذا أيضا منقطع إن الأعمش لم يدرك بن مسعود
>
> অর্থ: কিয়ামুল লাইল গ্রন্থে আছে, আ'মাশ বলেন, ইবনে মাসউদ রাযি. বিশ রাক'আত নামায পড়তেন এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। এ বর্ণনাটিও সূত্রবিচ্ছিন্ন। কারণ আ'মাশ রহ. ইবনে মাসউদ রাযি. এর সাক্ষাৎ পাননি। –তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৫।

আলবানী রহ. এর আরবী মন্তব্যটিও অনুবাদ বিহীন তুলে দেয়া হলো।

> عن عبد الله بن مسعود: روى ابن نصر في قيام الليل عن زيد بن وهب: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف وعليه ليل . قال الاعمش: كان يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث
>
> قال المباركفوري في " التحفة وهذا أيضا منقطع فإن الأعمش لم يدرك بن مسعود قلت: وهو كما قال بل لعله معضل فإن الأعمش إنما يروي عن ابن مسعود بواسطة رجلين غالبا -صلاة التراويح لمحمد الألباني - ٨١/١

যদি আমাদের প্রবল ধারণা সত্য না হয় তাহলে তিনি কোন সূত্রে মূল বর্ণনাটিকে যঈফ এবং মুনকার বললেন তা বোধগম্য নয়। হাইসামী রহ. বেশ স্পষ্ট করে বলেছেন, (رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح) হাদীসটি তাবারানী রহ. আলমু'জামুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন। এবং এর রিজাল তথা বর্ণনাকারীগণ হলো সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী। –মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৭/৩৩০

এবার দেখুন, লেখক মহোদয় আলবানী রহ. এর বক্তব্যের কি রকম বিকৃত অনুবাদ করেছেন। মু'যাল হাদীসের একটি প্রকারের নাম। সাধারণভাবে সনদের মধ্য থেকে পর-পর দুই বা ততধিক বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে এমন হাদীসকে হাদীসে মু'যাল বলা হয়। কিন্তু লেখক তার অর্থ করলেন, বিভ্রান্তিকর। মু'যালের অর্থ বিভ্রান্তিকর না তার এ অর্থ করাটা বিভ্রান্তিকর? উপরন্তু লেখক আরবী একটি শব্দের অনুবাদ থেকে সযত্নে এড়িয়ে গেলেন। অর্থাৎ যেখানে আলবানী রহ. বললেন, বরং সম্ভবত হাদীসটি মু'যাল সেখানে লেখক মহোদয় কাট ছাট করে অনুবাদ করলেন, বরং তা বিভ্রান্তিকার। এ কেমন বিশ্বস্ততা! লেখক আলবানী রহ. এর (فإن الأعمش إنما يروي عن ابن مسعود بواسطة رجلين غالبا) আরবী বক্তব্যের অনুবাদ করেছেন, 'কারণ আ'মাশ দু'জন রাবীর মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি ইবনে মাস'ঊদ থেকে বর্ণনা করেছেন।' অথচ বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ হলো, কারণ সাধারণত আ'মাশ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে দু'জন রাবীর মধ্যস্থতায় হাদীস বর্ণনা করেন। সম্ভবত এমন অনুবাদ সম্বন্ধে যদি আলবানী রহ.ও অবগতি লাভ করতে পারতেন তাহলে তিনি লেখকের উপর যারপর নাই বিরাগভাজন হতেন।

এবার আসি আ'মাশ রহ. এর বক্তব্য প্রসঙ্গে। লেখক মহোদয় আ'মাশ রহ. এর বক্তব্যকে নির্দ্বিধায় জাল এবং ভিত্তিহীন বলে দিয়েছেন। অথচ আলবানী রহ. বর্ণনাটির ব্যাপারে সম্ভাবনা সহযোগে দ্বিধার সাথে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, সম্ভবত বর্ণনাটি মু'যাল তথা দুই বা ততধিক সূত্রবিচ্ছিন্ন। ... যদি আ'মাশ পর্যন্ত সূত্রটি সহীহ হয়ে থাকে তবে সেটা আমরা জানি না। গ্রন্থ সংক্ষেপণকারী শায়খ মুকরিযী সনদকে উহ্য করে দিয়েছেন। হায়! যদি তিনি এমনটি না করতেন! তিনি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের অনেক হাদীসের মান নির্ণয় ব্যবস্থাকে ভণ্ডুল করে দিয়েছেন। আমার মনে হয় আ'মাশ পর্যন্ত সনদটি সহীহ নয়। –সালাতুত তারাবীহ ১/৮২

মূল কথা হলো, আ'মাশ রহ. উড়ে এসে জুড়ে বসা রাবী নন; বরং উপরোক্ত এ মূল বর্ণনারই একজন রাবী। তিনি যায়দ ইবনে ওয়াহব সূত্রে ইবনে মাসউদ রাযি. এর আমল বর্ণনা করেছেন। তিনি এ বর্ণনার শক্তিশালী একজন রাবী হিসেবে এ বর্ণনার ব্যাখ্যা বর্ণনা করার অধিকার লালন করেন। তিনি সেই

ব্যাখ্যাটিই করেছেন। মূল বর্ণনায় রয়েছে, ইবনে মাসউদ রাযি. রমাযান মাসে আমাদের নিয়ে নামায পড়তেন। কয় রাক'আত পড়তেন এ প্রশ্নেরই ব্যাখ্যামূলক উত্তর দিয়েছেন আ'মাশ রহ.। আর যিয়াদাতুস সিকাত তথা এ ধরনের গ্রহণযোগ্য রাবীর সংযোজনও গ্রহণযোগ্য হয়। –তাওযীহুল আফকার ২/১৬, আলহিত্তাহ ফী জিকরিস সিহাহিস সিত্তাহ ১/১১৯

লেখকের আপত্তি ১৯

মুহতারাম লেখক মহোদয় তাঁর পুস্তিকার ৪০ নম্বর পৃষ্ঠায় তারাবীহ বিষয়ক ১৪ নম্বর বর্ণনাটি এনেছেন। সনদসহ বর্ণনাটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

> حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن قيس عن شتير بن شكل أنه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر.
>
> অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শুতাইর ইবনে শাকল রমাযান মাসে বিশ রকআত নামায পড়তেন এবং বিতর পড়তেন। –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ৭৬৮০

লেখক মহোদয় তাঁর তাহক্বীক্ব শিরোনামের অধীনে বলেন,

> এ বর্ণনাটিও যঈফ এবং মুনকার। এর সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বায়েস নামক রাবী অত্যন্ত দুর্বল। ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেন, সে অপরিচিত। ইমাম যাহাবী ও আযদী বলেন, 'সে অত্যন্ত দুর্বল এবং অপরিচিত'। এ ছাড়া এর পূর্ণাঙ্গ সনদ নেই।

পর্যালোচনা

লেখক বলেছেন, এ বর্ণনাটি যঈফ এবং মুনকার। কেন? কারণ এর সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস নামক অত্যন্ত দুর্বল রাবী রয়েছেন। তিনি অত্যন্ত দুর্বল কেন? কারণ ইবনে হাজার আসকালানী তাকে মাজহুল বলেছেন। রাবী মাজহুল তথা অপরিচিত হলেই কি সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়? তার সম্পর্কে যেহেতু তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না তাই তার সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। এ জাতীয় অপরিচিত রাবীর বর্ণিত হাদীস সাধারণভাবে গৃহীত পর্যায়ের না হওয়ার কারণ হলো রাবীর সবলতা বা গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত নয়। যেহেতু হাদীসটিকে গ্রহণ করা যাচ্ছে না তাই এ অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়টিকে যঈফ শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়। সুতরাং মাজহুল রাবীকে অত্যন্ত দুর্বল বলে ব্যক্ত করার কোনো সুযোগ নেই। তার মানে এই নয়, তাকে সবলও বলা যাবে। সারকথা মাজহুল রাবী মাজহুলই। আব্দুল্লাহ

ইবনে কাইস নামে চার-পাঁচ জন রাবী রয়েছেন। আলোচিত বর্ণনার আব্দুল্লাহ ইবনে কাইসকে একমাত্র ইবনে হাজার আসকালানী রহ. মাজহুল বলে অভিহিত করেছেন। তার বক্তব্য নিম্নরূপ:

عبد الله بن قيس عن بن عباس قوله مجهول من الثالثة خد

তাকরীবুত তাহযীব ২/২১। এছাড়া যে সকল রিজাল গ্রন্থকারগণ এ আব্দুল্লাহ ইবনে কায়সের আলোচনা এনেছেন তারা তাকে মাজহুল বলে অভিহিত করেননি। তাহযীবুল কামাল ১৫/৪৫৮, আততারীখুল কাবীর লিলবুখারী ৫/৬৫, আলজারহু ওয়াত তা'দীল ১১/২৭২। ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. এর মতে আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস নাখায়ী এবং আলোচিত বর্ণনার আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস একই রাবী। আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস নাখায়ীকে ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. তাঁর কিতাবুস সিকাত গ্রন্থে এনেছেন। অর্থাৎ ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. এর নিকট এ আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস সিকাহ এবং নির্ভরযোগ্য। –কিতাবুস সিকাত ৪/১৬/৩৭৫৬

লেখক বলেছেন, ইমাম যাহাবী এবং আযদী রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে কাইসকে অত্যন্ত দুর্বল এবং অপরিচিত বলেছেন। প্রথমত ইমাম যাহাবী নিজস্ব কোনো অভিমত ব্যক্ত করেননি। তিনি লিখেছেন, আলআযদী বলেন, যঈফ মাজহুল। –মীযানুল ই'তিদাল ২/৪৭৩/৪৫১৩। সুতরাং 'ইমাম যাহাবী ও আযদী বলেন' বলে ব্যক্ত করা মারাত্মক পর্যায়ের একটি ত্রুটিপূর্ণ উপস্থাপনা। দ্বিতীয়ত ইমাম যাহাবী রহ. যে আব্দুল্লাহ ইবনে কায়সের ব্যাপারে ইমাম আযদীর মন্তব্য উল্লেখ করেছেন সে আমাদের আলোচিত আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস নয়। সে হলো আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস আলগিফারী। আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস আলগিফারী সম্বন্ধেই ইমাম যাহাবী রহ. ইমাম আযদী রহ. এর মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। আর আলোচিত সনদের আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস সম্বন্ধে ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, সে কে আমি জানি না। –মীযানুল ই'তিদাল ২/৪৭৩/৪৫১৬। তিনি ঢালাওভাবে তাকে মাজহুল বলে মন্তব্য করেননি। কারণ মাজহুল আর আর আমি তাকে চিনি না এক বিষয় নয়। তবে ইমাম যাহাবী রহ. বলেছেন, সম্ভবত এ আব্দুল্লাহ ইবনে কাইসই হলো আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস নাখায়ী। –প্রাগুক্ত ২/৪৭৩/৪৫১৭। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, ইমাম মিযযী রহ.ও এ সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং সম্ভাবনা প্রবল আকার ধারণ করেছে। অতএব খুব সহযেই বলা যায়, উপরোক্ত সনদের রাবী মাজহুল নয়; যঈফ তো নয়ই। কারণ শায়খ আলবানী রহ.ও সুনানে ইবনে মাজাহ এর আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস নাখায়ী বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলে অভিহিত করেছেন। এমন কি সেখানে তিনি রিজালবিদদের উপরোক্ত সম্ভাবনাকেও

উল্লেখ করেছেন। –সুনানে ইবনে মাজাহ আলবানী রহ. সম্পাদিত; হাদীস নং ৪৩২৩, (অন্য কপিতে) ৪৩১৪।

লেখকের আপত্তি ২০

মুহতারাম লেখক মহোদয় তাঁর পুস্তিকার ৪১ নম্বর পৃষ্ঠায় তারাবীহ বিষয়ক ১৫ নম্বর বর্ণনাটি এনেছেন। সনদসহ বর্ণনাটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْخَصِيبِ قَالَ: كَانَ يَؤُمُّنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ فِي رَمَضَانَ فَيُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً

অর্থ: আবুল খুসাইব রহ. বলেন, সুওয়াইদ ইবনে গাফালাহ রহ. রমাযান মাসে আমাদের ইমামত করতেন। তখন পাঁচ বৈঠকে বিশ রাক'আত নামায পড়তেন। –সুনানে কুবরা বাইহাকী; হাদীস ৪৮০৩

লেখক মহোদয় তাঁর তাহক্বীক্ব শিরোনামের অধীনে বলেন,

আছারটি যঈফ ও মুনকার। এর সনদে আবুল খুছাইব রয়েছে। তাকে মুহাদ্দিছগণ চিনেন না। ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, সে অপরিচিত। তিনি অন্যত্র বলেন, 'তার পরিচয় জানা যায় না'। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী পাঁচ বৈঠকের বর্ণনাকে দুর্বল বলেছেন।

পর্যালোচনা

আবুল খুসাইব সম্বন্ধে ইমাম যাহাবী রহ. যা বলেছেন তা যথাস্থানে সত্য এবং যথার্থ। তবে সাথে সাথে এ বিষয়টিও জানা থাকতে হবে, আবুল খুসাইব উপনামে তিনজন বর্ণনাকারী রয়েছেন।

১। আবুল খুসাইব যিয়াদ ইবনে আব্দুর রহমান।

২। আবুল খুসাইব বাশীর আলমাদায়িনী।

৩। আবুল খুসাইব নুফাআহ ইবনে মুসলিম জু'ফী কুফী। –ফাতহুল বাব ফিলকুনা ওয়াল আলকাব লিইবনে মান্দাহ ১/২৭৮

ইমাম যাহাবী রহ. যে আবুল খুসাইব সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন তিনি হলেন, আবুল খুসাইব যিয়াদ ইবনে আব্দুর রহমান। আর উপরোক্ত বর্ণনার আবুল খুসাইব হলেন, নুফাআহ ইবনে মুসলিম জু'ফী কুফী। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আবূ হাতেম রাযী, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হাদীস শাস্ত্রবিদদের বক্তব্য মতে

নুফাআহ ইবনে মুসলিম একজন সিকাহ এবং নির্ভরযোগ্য পর্যায়ের রাবী। –আলজারহু ওয়াত তা'দীল ১৭/৪৭৮, আলমুকতানা ফী সারদিল কুনা লিল ইমাম যাহাবী ১/১৭৬, আততারীখুল কাবীর লিলবুখারী ৮/৪১, কিতাবুস সিকাত লিইবনে হিব্বান ৬/১৭৫

সুতরাং বর্ণনাটি সম্বন্ধে কি করে যঈফ এবং মুনকার বলে মন্তব্য করার সুযোগ থাকতে পারে?

লেখক বলেছেন, 'মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী পাঁচ বৈঠকের বর্ণনাকে দুর্বল বলেছেন।' আমাদের জানা মতে তিনি ঢালাওভাবে পাঁচ বৈঠকের বর্ণনাকে দুর্বল বলেননি। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে বর্ণিত বিশ রাক'আত তারাবীহ এর বর্ণনাকে দুর্বল বলেছেন। লেখক ফুটনোটে মিরকাতুল মাফাতীহ এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমরা মিরকাত খুলে দেখেছি। সেখানে মোল্লা আলী কারী রহ. পাঁচ বৈঠকের মাধ্যমে বিশ রাক'আত তারাবীহকে প্রমাণ করেছেন। দেখুন, মিরকাতুল মাফাতীহ ৩/৩৪৩ (আলমাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া)।

লেখকের আপত্তি ২১

মুহতারাম লেখক মহোদয় তাঁর পুস্তিকার ৪১ নম্বর পৃষ্ঠায় তারাবীহ বিষয়ক ১৬ নম্বর বর্ণনাটি এনেছেন। সনদসহ বর্ণনাটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

> حدثنا وكيع عن نافع بن عمر قال كان بن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان عشرين ركعة ويقرأ بسورة الملائكة في ركعة
>
> অর্থ: নাফে ইবনে উমর রহ. বলেন, ইবনে আবি মুলাইকাহ রমাযান মাসে আমাদের নিয়ে বিশ রাক'আত নামায আদায় করতেন। –মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা; হাদীস ৭৬৮৩

লেখক মহোদয় তাঁর তাহক্বীক্ব শিরোনামের অধীনে বলেন,

> বর্ণনাটি জাল। এর সনদে ইবনে আবী মুলাইকাহ নামক একজন পরিত্যক্ত রাবী রয়েছে। মূল নাম আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'সে হাদীছ জালকারী। ইবনে হাজার আসক্বালানী ও ইবনে মাঈন তাকে যঈফ বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, 'ছহীহ হাদীছের বিরোধী বর্ণনাকারী হিসাবে সে অগ্রহণযোগ্য। আবূ হাতেম বলেন, 'হাদীস বর্ণনায় সে নির্ভরযোগ্য নয়'। ইমাম নাসায়ী বলেন, 'হাদীছের পরিত্যক্ত রাবী'। কখনো তিনি বলেছেন, 'সে নির্ভরযোগ্য নয়'। ইবনে আদী ও ইবনে সা'দ বলেন, তার সকল হাদীস যঈফ অথবা জালের পর্যায়ভুক্ত।

পর্যালোচনা

বর্ণনাটিতে লেখকের লক্ষ্যবস্তু হলো, ইবনে আবী মুলাইকাহ। অন্য কোনো রাবী সম্পর্কে তিনি কথা উঠাননি। হয়তো সুযোগও পাননি। ইবনে আবী মুলাইকা সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বললেন। প্রথম কথা হলো, তার সম্পর্কে এত কথা বলার প্রয়োজন কেন হলো? তিনি তো বর্ণনার রাবী নন। আমাদের মূল আলোচনার কেন্দ্র তো হলো, বর্ণনার রাবীগণ বা সূত্রপরম্পরা। বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যত-অনির্ভরযোগ্যতা বিচার করে বর্ণনার বিচার করবো। সেখানে এমন ব্যক্তিকে কেন টেনে আনবো যিনি বর্ণনার বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন। এখানে আমাদের মূল প্রামাণ্য বিষয় হলো, ইবনে আবী মুলাইকাহ বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন কি না? এর উত্তরে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তিনি বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন। কারণ এ বর্ণনার সনদ সহীহ। সুতরাং ইবনে আবূ মুলাইকাহ বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন এটাও সহীহ এবং শুদ্ধ। তিনি যে আমলটা করেছেন তার শুদ্ধাশুদ্ধি তাকে দিয়ে বিচার করা যাবে না। এর শুদ্ধাশুদ্ধির জন্য অন্য উপায় গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত ইবনে আবী মুলাইকা উপনামে অসংখ্য রাবী রয়েছেন। ইবনে আবী মুলাইকা সম্বন্ধে মন্তব্য করার পূর্বে নিশ্চিত হয়ে নেয়া প্রয়োজন ছিল, এ ইবনে আবী মুলাইকাহ কে? ইমাম বুখারী, ইবনে হাজার আসকালানী, ইমাম ইবনে মাঈন, ইমাম আবূ হাতেম, ইমাম নাসায়ী রহ. এর মত বিদগ্ধ হাদীস বিশেষজ্ঞগণ যে ইবনে আবী মুলাইকা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন তিনিই কি আলোচিত সনদের ইবনে আবী মুলাইকাহ? আলোচিত বর্ণনার ইবনে আবী মুলাইকাহই কি আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর ইবনে আবী মুলাইকাহ? মন্তব্য করার পূর্বে এসব প্রশ্নের সদুত্তর অনুসন্ধান করা প্রয়োজন ছিল। কেন লেখক এ প্রয়োজন অনুভব করেন নি জানি না। বস্তুত আলোচিত সনদের ইবনে আবী মুলাইকাহ হলেন, আবূ বকর আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবী মুলাইকাহ। এ ইবনে আবী মুলাইকাহ সম্পর্কে নতুন করে কিছুই বলার নেই। তিনি বিশিষ্ট একজন তাবিয়ী এবং হাদীসের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতি ক্রমে সিকাহ এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ইমাম যাহাবী রহ. বেশ স্পষ্ট ভাষায় তাঁর তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে এ কথাটি ব্যক্ত করেছেন। সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আবী মুলাইকাহ নামে যে রাবীর অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে তিনিই হলেন আলোচিত সনদের ইবনে আবী মুলাইকাহ। তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর ইবনে আবী মুলাইকাহ নন। এ ইবনে আবী মুলাইকাহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে দেখুন তাযকিরাতুল হুফফায ১/৭৮, তাহযীবুল কামাল

৩৪/৪৭৬, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/৮৮। সুতরাং এখন এ বর্ণনা সম্বন্ধে লেখকের কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়।

লেখকের আপত্তি ২২

মুহতারাম লেখক মহোদয় তাঁর পুস্তিকার ৪২ নম্বর পৃষ্ঠায় তারাবীহ বিষয়ক ক্রুটিপূর্ণ (?) ১৭ নম্বর বর্ণনাটি এনেছেন। বর্ণনাটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

> حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث أنه كان يؤم الناس في رمضان بالليل بعشرين ركعة ويوتر بثلاث ويقنت قبل الركوع
>
> অর্থ: আবূ ইসহাক রহ. থেকে বর্ণিত, হারিস আ'ওয়ার রমাযান মাসে রাত্রিতে লোকদের ইমামতি করতেন। সেখানে বিশ রাক'আত নামায পড়তেন। এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। এবং বিতর নামাযে রুকুর পূর্বে দুআয়ে কুনুত পড়তেন। −মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা; হাদীস ৭৬৮৫

লেখক মহোদয় তাঁর তাহক্বীক্ব শিরোনামের অধীনে বলেন,

> এ বর্ণনাটিও জাল। এর সনদে হারিস ও আবূ ইসহাক্ব নামে ক্রুটিপূর্ণ ও অভিযুক্ত দু'জন রাবী রয়েছে। হারিসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আর আবূ ইসহাক্ব সম্পর্কে আল্লামা যাহাবী বলেন, 'সে মুনকার বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত'। ইবনে হিব্বান বলেন, 'সে যা বর্ণনা করেছে তার দলীল গ্রহণ করা বৈধ নয়'।

পর্যালোচনা

লেখক মহোদয় বর্ণনাটির দু'জন রাবীকে ক্রুটিপূর্ণ ও অভিযুক্ত বলে অভিহিত করেছেন। তারা হলো যথাক্রমে হারিস ও আবূ ইসহাক। এখানেও সে একই কথা প্রযোজ্য, একই নামে একাধিক রাবী থাকে। রিজাল শাস্ত্রের কিতাব-পত্তর ঘেটে নির্ণয় করে নিতে হয় বর্ণনার রাবী কোনজন। লেখক মহোদয় হয়তো এ জাতীয় ঘাটাঘাটি করার সময় পান নি কিংবা প্রয়োজন বোধ করেননি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে।

হারিস:

লেখক বলেছেন, হারিসের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। হারিস নামে যেহেতু অসংখ্য রাবীর সন্ধান পাওয়া যায় তাই হতে পারে কোনো কোনো

'হারিসের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না'। কিন্তু আলোচিত বর্ণনায় যে হারিস রয়েছে তার পরিচয় কি আসলেই পাওয়া যায় না? বস্তুত এ হারিসের পূর্ণ নাম হলো, হারিস ইবনে আব্দুল্লাহ আলআ'ওয়ার হামাদানী। হাদীস শাস্ত্রজ্ঞদের নিকট তিনি হারেসে আ'ওয়ার নামে সবিশেষ পরিচিত। হারিসে আ'ওয়ার সম্পর্কে তার পরিচয় পাওয়া যায় না বলা হলে বিষয়টি হাস্যকর মনে হবে। এ যাবত কোনো হাদীস বিশেষজ্ঞই তাকে মাজহুল কিংবা অপরিচিত বলে অভিহিত করেনি। হারিসে আওয়ারই আলোচিত বর্ণনার হারিস কি না তার জন্য দেখুন, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/১৫৩, তাহযীবুত তাহযীব ১/৯৭/২৪৮, তাহযীবুল কামাল ৫/২৪৫/১০২৫। এসব সূত্রগুলোতে হারিসে আওয়ারের গুরু-শিষ্যদের সুদীর্ঘ তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। তা দেখে সহজেই নির্ণয় করা যাবে আলোচিত হারিস কে। হারিসে আ'ওয়ার একজন প্রসিদ্ধ তাবিয়ী। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং আলী রাযি. এর শিষ্য ছিলেন। আবূ বকর ইবনে দাউদ রহ. এর বক্তব্য মতে তিনি বেশ উঁচু মর্গের একজন ফকীহ ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে সীরিন রহ. বলেন, আমি কুফাবাসীকে দেখেছি, তারা পাঁচ জন ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠত্বের সুউচ্চ আসনে সমাসীন করেন। তারা হলেন, হারিস ইবনে আব্দুল্লাহ আ'ওয়ার, উবাইদাহ সালমানী, আলকামা, মুসরুক এবং শুরাইক রহ.। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, হারিসে আ'ওয়ার হলেন, আল্লামা ইমাম আবূ যুহাইর হারিস ইবনে আব্দুল্লাহ হামাদানী কুফী। তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে শিথিল পর্যায়ের হওয়া সত্ত্বেও ফকীহ ছিলেন এবং জ্ঞান-গরিমায় বেশ প্রাচুর্য্যের অধিকারী ছিলেন। তবে এ কথা সত্য, হারিসে আ'ওয়ার এর ব্যাপারে হাদীস শাস্ত্রজ্ঞদের সুকঠিন মন্তব্যও রয়েছে। শা'বী, আবূ খাইসামা এবং আলী ইবনুল মাদীনী রহ. তাকে মিথ্যা দোষেও অভিযুক্ত করেছেন। শিয়া দোষেও তিনি অভিযুক্ত। তবে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইমাম নাসায়ী রহ. তাকে সিকা বা নির্ভরযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম ইবনে মাজাহ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসায়ী স্ব স্ব সুনান গ্রন্থে হারিসে আ'ওয়ারের হাদীস এনেছেন। ইমাম যাহাবী রহ. তার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, ইমাম শা'বী রহ. যে হারিসে আওয়ারকে মিথ্যাবাদী বলেছেন এ মিথ্যা দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন ক্রুটি; ঐচ্ছিক মিথ্যা উদ্দেশ্য নেননি। নতুবা তিনি কেন দীনের ব্যাপারে তার মিথ্যা বলার ব্যাপারটি বিশ্বাস করে তার থেকে হাদীস বর্ণনা করবেন? ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, তার থেকে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে আমার দ্বিধা রয়েছে। −আলকামিল ফী যুআফাইর রিজাল ১/১৩১, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/১৫২, ১৫৩, ১৫৫

একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হাদীস শাস্ত্রবিদদের এত কথা! সে ব্যক্তি কি করে অপরিচিত হতে পারেন? উপরন্তু বর্ণনাটি জাল হওয়ার ক্ষেত্রে হারিস আওয়ার এর কি ভূমিকা? কিংবা তার কি অপরাধ? তিনি তো উপরোক্ত বর্ণনার বর্ণনাকারী নন। তিনি স্বয়ং বর্ণনার মূল উদ্দীষ্ট পুরুষ। তার আমলটিকে তার নিম্নস্তরের রাবীগণ সূত্রপরম্পরায় বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তার আমলের অসারতা প্রমাণিত হবে তার থেকে সূত্র পরম্পরায় বর্ণনাকারীদের ত্রুটি প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে। অতএব এক্ষেত্রে তাকে টেনে আনাই তো সমীচীন নয়। তিনি যে আমল করেছেন তার শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার তাকে দিয়ে করা যাবে না। একজন চোর কিংবা ডাকাত নামায পড়লে সে নামায অপ্রমাণিত বা মিথ্যা হয়ে যাবে না। তার পঠিত নামায প্রমাণিত কি না তা নির্ণয় করতে হবে অন্য সূত্রের মাধ্যমে। হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাবীদের শ্রেণীভুক্ত করে তাঁকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করা হলে হুলস্থুল পড়ে যাবে।

আবূ ইসহাক:

বর্ণনার আরেকজন রাবী আবূ ইসহাক। লেখক মহোদয়ের মতে আবূ ইসহাকও ত্রুটিযুক্ত। কারণ আবূ ইসহাক্ব সম্পর্কে আল্লামা যাহাবী বলেন, 'সে মুনকার বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত'। ইবনে হিব্বান বলেন, 'সে যা বর্ণনা করেছে তার দলীল গ্রহণ করা বৈধ নয়'। আবূ ইসহাকের ব্যাপারে মন্তব্য করার পূর্বে নির্দিষ্ট করে নেয়া প্রয়োজন ছিল, আলোচিত সনদের আবূ ইসহাক কে? আবূ ইসহাক উপনামে অসংখ্য রাবী রয়েছেন। ইমাম যাহাবী এবং ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. যে আবূ ইসহাক সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন তিনি সনদের আবূ ইসহাক নন। ইমাম যাহাবী এবং ইবনে হিব্বান রহ. এর অভিযুক্ত আবূ ইসহাক হলেন আবূ ইসহাক হিজাযী। তিনি হিজাযের অধিবাসী ছিলেন। দেখুন মীযানুল ই'তিদাল ৪/৪৮৮/৯৯৪১। আর আলোচিত সনদের আবূ ইসহাক এর নাম হলো, আমর ইবনে আব্দুল্লাহ আস সাবিয়ী কুফী। তিনি কূফার অধিবাসী ছিলেন। তার উস্তাদ-শাগরেদদের বিস্তারিত বিবরণ রিজালগ্রন্থগুলোতে উল্লেখ রয়েছে। দেখুন, তাহযীবুল কামাল ২২/১০৩-১০৮। আমর ইবনে আব্দুল্লাহ আবূ ইসহাক সাবিয়ী একজন বিশিষ্ট তাবিয়ী ছিলেন। আ'মাশ, যুহরী এবং সুফইয়ান সাওরী রহ. এর মত যুগ শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান হাদীসবেত্তাগণ তার শিষ্য ছিলেন। হাদীসের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য একজন রাবী। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও তাঁর বর্ণনা রয়েছে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। সুতরাং তার বর্ণনা গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। দেখুন আততারীখুল কাবীর ৬/১০৩, আলকাশিফ ফী মা'রিফাতি মান লাহু

রিওয়াইয়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তাহ ১/৩০, তাযকিরাতুল হুফফাজ ১/৮৬, তাহযীবুল কামাল ২২/১০৩-১০৮।

লেখকের আপত্তি ২৩

লেখক মহোদয় তাঁর পুস্তিকার ৪২ নাম্বার পৃষ্ঠায় তারাবীহ বিষয়ক ১৮ নম্বর বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

> حدثنا غندر عن شعبة عن خلف عن ربيع وأثنى عليه خيرا عن أبي البختري أنه كان يصلي خمس ترويحات في رمضان ويوتر بثلاث.
>
> অর্থ: রবী' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুল বাখতারী রমাযান মাসে পাঁচ তারবীহায় (বিশ রাক'আত) নামায আদায় করতেন। এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ৭৬৮৬

মুহতারাম লেখক তাঁর তাহকীক বক্তব্যে এ বর্ণনা সম্পর্কে বলেন,

> এই আছারটিও জাল। প্রথমত: এর সনদে বর্ণিত রাবীগুলোর কোন পরিচয় নেই। দ্বিতীয়ত: আবুল বাখতারী একজন মিথ্যুক রাবী। আল্লামা যাহাবী বলেন, 'কোন যুগেই তার পরিচয় পাওয়া যায়নি'। মুহাদ্দিস দুহাইস তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইবনে হাজার আসক্বালানীও তার ত্রুটি বর্ণনা করেছেন।

পর্যালোচনা

লেখক মহোদয় বলেছেন, 'এই আছারটিও জাল।' কারণ 'প্রথমত: এর সনদে বর্ণিত রাবীগুলোর কোন পরিচয় নেই।' সনদের মাঝে রাবীদের বিস্তারিত পরিচয় দেয়া থাকে না। রিজাল গ্রন্থগুলোতে প্রবেশ করলেই তাদের বিস্তারিত পরিচয় লাভ করা যায়। লেখক মহোদয় রিজাল গ্রন্থগুলো একটু নেড়ে চেড়ে দেখলে সনদের রাবীদের সম্পর্কে এতটা আনাড়ি হতেন না। সনদের মাঝে গুন্দার, শু'বাহ, খালাফ ইবনে হাওসাব এবং রবী' ইবনে আবূ রাশেদ নামের রাবীগণ রয়েছেন। এদের প্রত্যেকেই আলোকিত রাবী। এদের কেউ অপরিচিত নন। কারো নিকট কেউ অপরিচিত হলে সে বাস্তবেই অপরিচিত হয়ে যায় না।

লেখক মহোদয় বলেছেন, দ্বিতীয়ত: আবুল বাখতারী একজন মিথ্যুক রাবী। আল্লামা যাহাবী বলেন, 'কোন যুগেই তার পরিচয় পাওয়া যায়নি'। মুহতারাম! আবুল বাখতারী উপনামের চারজন রাবী আছেন:

১। আবুল বাখতারী সাঈদ ইবনে ফাইরুয

২। আবুল বাখতারী মাগরা
৩। আবুল বাখতারী যায়দ ইবনে জুবাইর
৪। আবুল বাখতারী ওয়াহব ইবনে ওয়াহব।

এদের সবাই কি মিথ্যাবাদী? এদের কেউ কেউ তো মিথ্যাবাদী এবং চরম সমালোচিত। তবে এদের কেউ কেউ তো সত্যবাদী এবং পরম আলোচিতও বটে। এখন প্রশ্ন হলো, সনদের আবুল বাখতারী কি সত্যবাদী আবুল বাখতারী না মিথ্যাবাদী আবুল বাখতারী? এ প্রশ্নের অনুসন্ধান না করে ঢালাওভাবে আবুল বাখতারীকে মিথ্যুক বলা তো চরম পর্যায়ের অনুচিত কর্ম। বস্তুত আলোচিত সনদের আবুল বাখতারী হলেন সাঈদ ইবনে ফাইরুয আবুল বাখতারী। আর সাঈদ ইবনে ফাইরুয আবুল বাখতারী হলেন একজন মান্যবর এবং গ্রহণযোগ্য খ্যাতিমান তাবিয়ী। তিনি সহীহ বুখারীরও রাবী। রিজাল শাস্ত্রবিদগণ তাঁকে হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। দেখুন, আলকামেল ফী যুআফাইর রিজাল ১/৩১৭, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ ৪/২৫৯, তাহযীবুল কামাল ১১/৩৪, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/২৭৯।

ইমাম যাহাবী রহ. যে আবুল বাখতারী সম্পর্কে বলেছেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় না সে আবুল বাখতারী সনদের আবুল বাখতারী নয়।

লেখক মহোদয় বলেছেন, মুহাদ্দিস দুহাইস তাকে মিথ্যুক বলেছেন। মুহাদ্দিস দুহাইস কে? এ নামে তো কোনো মুহাদ্দিসের নাম আমোদের জানা নেই। ইমাম যাহাবী রহ. যে মুহাদ্দিসের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি হলেন, দুহাইম। দেখুন, মীযানুল ই'তিদাল ৪/৪৯৪/৯৯৮৪।

সনদের মধ্যকার রবী হলেন রবী' ইবনে আবূ রাশেদ। রবী ইবনে আবূ রাশেদ হলেন, গ্রহণযোগ্য, দুনিয়া বিমুখ আল্লাহভীরু একজন রাবী। মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাকে নির্ভরযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। –মা'রিফাতুস সিকাত লিল ইজলী ১/২৮

সনদের মধ্যকার খালাফ হলেন খালাফ ইবনে হাওসাব। খালাফ ইবনে হাওসাব একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাঁকে সিকাহ এবং নির্ভরযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। –তাহযীবুল কামাল ৮/২৭৯, তাহযীবুত তাহযীব ১০/২৩৫

আর শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ এবং মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর গুন্দার রহ. কে যদি কেউ অপরিচিত বলে তবে তার জ্ঞানের দৌরাত্ম্য পরিমাপ হয়ে যাবে। মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর গুন্দার পরিচিত না অপরিচিত তা জানতে দেখুন

তাহযীবুল কামাল ২৫/৫। আর শু'বা ইবনে হাজ্জাজ এর পরিচিতি জানতে দেখুন তাহযীবুল কামাল ১২/৪৭৯।

এত পরিমাণ তথ্য উপস্থাপনের পরও কি উপরোক্ত বর্ণনাটিকে জাল বর্ণনার অপবাদ দেয়া হবে?

লেখকের আপত্তি ২৪

মুহতারাম গ্রন্থকার মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব তাঁর পুস্তিকার ৪৩ নম্বর পৃষ্ঠায় তারাবীহ বিষয়ক আপত্তিকর (!) ১৯ নম্বর হাদীসটি এনেছেন। সনদসহ হাদীসটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

> حدثنا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في رمضان خمس ترويحات ويوتر بثلاث
>
> অর্থ: সাঈদ ইবনে উবাইদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী ইবনে রবীআ রমাযান মাসে লোকদের নিয়ে পাঁচ বৈঠকে তারাবীহ নামায পড়তেন। এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ৭৬৯০

মুহতারাম পুস্তিকাকার তাঁর 'তাহক্বীক্ব' শিরোনামের অধীনে বলেন,

> বর্ণনাটি যঈফ বা জাল ও মুনকার। এর সনদে দু'জন বাজে রাবী আছে। আলী ইবনে রাবী'আহ আলক্বারশী ও সাঈদ ইবনে উবাইদ। ইমাম যাহাবী আলী ইবনে রাবী'আহ সম্পর্কে আবূ হাতেম-এর মত পোষণ করে বলেন যে, তিনি তাকে যঈফ বলেছেন। সাঈদ ইবনে উবাইদ সম্পর্কে ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেন, সে অপরিচিত।

পর্যালোচনা

লেখক মহোদয় আলী ইবনে রাবীআহ এবং সাঈদ ইবনে উবাইদকে বাজে রাবী বলে অভিহিত করেছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসের সংখ্যা মোট কত তার হিসাব বের করা বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। হাদীসের সংখ্যা অসংখ্য, লাখের ঘর ছাড়িয়ে যাবে। আর আমলযোগ্য হাদীসের সংখ্যাও কত লাখ হবে তাও বলা মুশকিল। হাদীসের সংখ্যাই যদি এত হয় তাহলে এর বর্ণনাকারীদের সংখ্যা কত হবে। একটি হাদীসেই দেখা যায় ৮-১০ জন করে রাবী থাকেন। তবে অসংখ্য হাদীসের রাবীদের সংখ্যা কত অসংখ্য হবে তার পরিসংখ্যান বের করা তো আরো জটিল ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। একারণেই দেখা যায় একই নামের রাবীদের

সংখ্যা অগণন। এমনকি ছেলে পিতা এবং দাদার নাম এক এমন রাবীদের সংখ্যাও অসংখ্য। এজন্য রিজাল শাস্ত্রের একটি স্বীকৃত নীতি হলো, কোনো হাদীসের রাবী সম্বন্ধে রিজাল শাস্ত্রজ্ঞদের সমালোচনা পেলে প্রথমত নিরীক্ষণ করে দেখতে হবে, হাদীসের রাবী এবং শাস্ত্রজ্ঞদের সমালোচিত রাবী একই ব্যক্তি কি না? এ নামে আরো রাবী আছেন কি না? এ বিষয়গুলো নির্ণয় করা খুবই জরুরী বিষয়। এক্ষেত্রে পদস্খলন হলে সহীহ হাদীস যঈফ হবে আর যঈফ হাদীস হবে সহীহ। এমনকি সহীহ হাদীস মওযু এবং মওযু হাদীস সহীহ হাদীসে পরিণত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। মুহতারাম লেখক মহোদয়ের বোধ হয় বাজে রাবী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ জাতীয় একটি বিচ্যুতি ঘটে গেছে। কারণ আলী ইবনে রাবীআহ নামে একাধিক রাবী রয়েছেন। তাদের কেউ কেউ তো বিতর্কিত। তবে তাদের কেউ কেউ তো বিতর্কের অনেক উর্ধ্বে রয়েছেন। এখানে নির্ণেয় বিষয় হলো, উপরোক্ত হাদীসটিতে উল্লিখিত আলী ইবনে রাবীআহ কি বিতর্কিত আলী ইবনে রাবীআহ? নাকি বিতর্কের উর্ধ্বের এবং মনীষী পর্যায়ের আলী ইবনে রবীআহ?

আমাদের ক্ষুদ্র বিশ্লেষণ মতে আলী ইবনে রবীআহ নামে চার জন রাবী রয়েছেন:

১। আলী ইবনে রবীআহ আবুল মুগীরা ওয়ালিবী কুফী।

২। আলী ইবনে রবীআহ বসরী।

৩। আলী ইবনে রবীআহ করশী।

৪। আলী ইবনে রবীআহ বাইরুতী।

–আলমুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক লিল খতীব বাগদাদী ৩/১২৪

উপরোক্ত রাবী চতুষ্টয়ের মধ্য হতে আলী ইবনে রবীআহ করশী হাদীস শাস্ত্রজ্ঞদের নিকট সমালোচিত। তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরামের নানা রকম বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। যেমনটি লেখক মহোদয় বলেছেন। তবে এ আলী ইবনে রবীআহ আমাদের উপরোক্ত হাদীসের সনদের মধ্যকার আলী ইবনে রবীআহ নন। উপরোক্ত হাদীসের সনদের মধ্যকার আলী ইবনে রবীআহ হলো, আলী ইবনে রবীআহ আবুল মুগীরা ওয়ালিবী কুফী। এ বিষয়টি কি করে নির্ণিত হলো? একজন বর্ণনাকারীর অসংখ্য শিষ্য এবং শিক্ষাগুরু থাকেন। রিজাল শাস্ত্রজ্ঞগণ রিজাল গ্রন্থগুলোতে আরবী বর্ণমালার ধারাক্রমানুসারে রাবীদের সেসব শিষ্য এবং শিক্ষাগুরুদের নামের তালিকা উল্লেখ করে দিয়েছেন। আলোচিত সূত্রপরম্পরাটিতে আলী ইবনে রবীআহ আবুল মুগীরা ওয়ালিবী কুফী হলেন শিক্ষক। আর সাঈদ ইবনে উবাইদ হলেন শিষ্য। সাঈদ ইবনে উবাইদ নামে একাধিক রাবী রয়েছেন। আর এখানে আলী ইবনে রবীআহ আবুল মুগীরা ওয়ালিবী কুফীর শিষ্য সাঈদ ইবনে উবাইদ হলেন সাঈদ ইবনে উবাইদ তায়ী। আলী ইবনে রবীআহ আবুল মুগীরা ওয়ালিবী কুফী এর শিষ্যদের তালিকার মাঝে সাঈদ ইবনে উবাইদ তায়ীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। দেখুন, (১) আলমুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক লিল খতীব বাগদাদী ৩/১২৪, (২) তাহযীবুল কামাল ২০/৪৩১।

তেমনিভাবে সাঈদ ইবনে উবাইদ তায়ী এর শিক্ষাগুরুদের মাঝে আলী ইবনে রবীআহ আবুল মুগীরা ওয়ালিবী কুফী এর নাম রয়েছে। দেখুন তাহযীবুল কামাল ১০/৫৪৯।

আর আলী ইবনে রবীআহ আবুল মুগীরা ওয়ালিবী কুফীকে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইমাম নাসায়ী এবং আবূ হাতেম রাযী প্রমুখ রিজাল শাস্ত্রজ্ঞগণ সিকাহ এবং হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। এবং আলী ইবনে রবীআহ আবুল মুগীরা ওয়ালিবী কুফী সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্যতম রাবীও বটে।

সাঈদ ইবনে উবাইদ তায়ী এর শিক্ষকদের তালিকায় আলী ইবনে রাবীআহ আলকারশীর নাম নেই। আছে আলী ইবনে রবীআহ আবুল মুগীরা ওয়ালিবী কুফী এর নাম। তেমনিভাবে আলী ইবনে রবীআহ আবুল মুগীরা ওয়ালিবী কুফী এর শিষ্যদের তালিকায় সাঈদ ইবনে উবাইদ তায়ী ব্যতীত অন্য কোনো সাঈদ ইবনে উবাইদের নাম নেই। আছে শুধু সাঈদ ইবনে উবাইদ তায়ী এর নাম। প্রয়োজনে উপরোক্ত রিজাল গ্রন্থগুলো দেখে নেয়া যেতে পারে।

মুহতারাম লেখক মহোদয় আলী ইবনে রবীআহ আবুল মুগীরা ওয়ালিবী কুফী এর শিষ্য সাঈদ ইবনে উবাইদকেও বাজে রাবী বলে অভিহিত করেছেন। কারণ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. নাকি তাকে অপরিচিত বলেছেন। এখানে সে একই বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন। সাঈদ ইবনে উবাইদ নামের একাধিক রাবী রয়েছেন। তন্মধ্য হতে একজনকে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. অপরিচিত বলেছেন। এখানে লেখকের অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন ছিল, আলোচিত সনদের সাঈদই কি অপরিচিত সাঈদ কি না। এ অনুসন্ধানে না গিয়ে তিনি সনদের সাঈদকে নিঃসংকোচে অপরিচিত রাবী বলে মন্তব্য করে দিলেন। এটা আর যাই হোক বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় নয়। অথচ যে সাঈদ ইবনে উবাইদকে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. মাজহুল তথা অপরিচিত বলে অভিহিত করেছেন তিনি হলেন, মুহাম্মাদ এর ভাই সাঈদ ইবনে উবাইদ। আলোচিত সূত্রটিতে যে সাঈদ ইবনে উবাইদ এর উল্লেখ রয়েছে তিনি সাঈদ ইবনে উবাইদ তায়ী; মুহাম্মাদ এর ভাই সাঈদ ইবনে উবাইদ নয়। আর ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. সাঈদ ইবনে উবাইদ তায়ীকে সিকাহ এবং নির্ভরযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। –তাকরীবুত

তাহযীব ১/৩৫৮। উপরন্তু আলী ইবনুল মাদিনী, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, নাসায়ী রহ. প্রমুখ ইমাম তাঁর ব্যাপারে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন এবং সিকাহ বলে অভিহিত করেছেন। এবং তিনি ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ফজল ইবনে দুকাইন রহ. এর অন্যতম শিক্ষাগুরু। সাথে সাথে সাঈদ ইবনে উবাইদ তায়ী সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্যতম রাবী। –তাহযীবুল কামাল ১০/৫৪৯। সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনাটিকে কি যঈফ, জাল এবং মুনকার বলার কোনো সুযোগ আছে?

গ্রন্থসহায়িকা

কুরআন ও তাফসীরগ্রন্থ

১. আলকুরআনুল কারীম
২. তাফসীরে ইবনে কাসীর
৩. আবূ জা'ফর তাবারী, জামিউল বায়ান
৪. আবূ বাকার জাসসাস, আহকামুল কুরআন
৫. ইমাম কুরতুবী, আলজামি' লিআহকামিল কুরআন
৬. ইমাম সুয়ূতী রহ., আদদুররুল মানসূর
৭. সাইয়িদ কুতুব শহীদ, ফী জিলালি কুরআন
৮. ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন
৯. আবূ ইসহাক নিশাপুরী, আলকাশফু ওয়াল বায়ান
১০. আবুল লাইস সামারকান্দী, বাহরুল উলূম
১১. তাফসীরুল আ'কাম
১২. আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ সা'আলাবী, জাওয়াহিরুল হিসান
১৩. আলাউদ্দীন আলবাগদাদী, তাফসীরুল খাযিন
১৪. তাফসীরে রাযী
১৫. নিযামুদ্দীন নিশাপুরী, তাফসীরু গারাইবিল কুরআন
১৬. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মুকাদ্দামতুন ফী উসূলিত তাফসীর
১৭. মুহাম্মদ আলী সাবুনী, সফওয়াতুত তাফাসীর
১৮. মুফতী শফী, মা'আরিফুল কুরআন

হাদীসগ্রন্থ

১. সহীহ বুখারী
২. সহীহ মুসলিম
৩. সুনানে নাসায়ী
৪. সুনানে আবূ দাউদ
৫. সুনানে তিরমিযী
৬. সুনানে ইবনে মাজাহ

৭. মুয়াত্তা মালিক
৮. মুসনাদে আহমদ
৯. সহীহ ইবনে হিব্বান
১০. ইমাম বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা
১১. ইমাম বাইহাকী, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার
১২. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা
১৩. আলআহাদীসুল মুখতারা, ইমাম জিয়াউদ্দীন মাকদেসী
১৪. তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর
১৫. মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমাইদ
১৬. যফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান
১৭. মুস্তাদরাকে হাকেম
১৮. আল্লামা নিমাভী, আসারুস সুনান
১৯. ইমাম হাইসামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ
২০. সুনানে নাসায়ী কুবরা
২১. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক
২২. মুসনাদে আবূ ইয়া'লা
২৩. ইমাম বাইহাকী, সুনানে সুগরা
২৪. হাফেয ইমাম ইবনে কাসীর, জামিউল মাসানীদ
২৫. ইবনে হাজার আসকালানী, ইতহাফুল মাহারাহ বি আতরাফিল আশারাহ,
২৬. শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ
২৭. সুনানে দারাকুতনী
২৮. আল-মুস্তাদরাক লিল হাকেম মা'আ তা'লীকাতিয যাহাবী ফিত-তালখীস
২৯. বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান

হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ

১. ইবনে আব্দুল বার, আত তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মায়ানী ওয়াল আসানীদ
২. মোল্লা আলী আলকারী আলহারাবী, মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ
৩. মোল্লা আলী কারী, উমদাতুল কারী শরহু সহীহিল বুখারী

৪. ইমাম কাসতাল্লানী, ইরশাদুস সারী শারহু সহীহিল বুখারী
৫. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী
৬. ইমাম ইবনে আব্দুল বার, আল-ইসতিযকার
৭. আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী, ফাইযুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী
৮. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী, আলআরফুস সাযী শরহু সুনানিত তিরমিযী
৯. মুবারাকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী
১০. উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ

ফিকহগ্রন্থ

১. ইমাম নববী, আল-মাজমু শরহুল মুহাযযাব
২. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া
৩. সাইয়িদ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ
৪. শাওকানী, নাইলুল আওতার
৫. মুহাম্মদ বিন আবুল ফাতহ আলহাম্বলী, আলমাতলা' আলা আবওয়াবিল ফিকহ
৬. ইমাম ইবনে হাজার হাইতামী, আলফাতাওয়া আলকুবরা আলফিকহিয়্যাহ আলা মাযহাবিল ইমাম আশশাফিয়ী
৭. আব্দুর রাহমান শাইখযাদাহ, মাজমাউল আনহুর ফী শারহি মুলতাকাল আবহুর
৮. খাসরু বিন কারামুয রুমী, দুরারুল হুক্কাম শারহু গুরারিল আহকাম
৯. মুহাম্মদ বিন আবূ বাকার রাযী, তুহফাতুল মুলূক
১০. আব্দুল কারীম রাফিয়ী, ফাতহুল আযীয ফী শারহিল ওয়াজীয
১১. বুরহানুদ্দীন মাহমুদ বিন আহমদ, আলমুহীতুল বুরহানী
১২. আবূ বাকার ইবনে আলী যাবিদী, আলজাউহারাতুন নাইয়িরাহ
১৩. মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শানকিতী, শারহু যাদিল মুস্তানকি'
১৪. যাকারিয়া আলআনসারী, আসনাল মাতালিব

১৫. ফাতাওয়া শায়খ ইবনে বায
১৬. আল-মুহাল্লা বিল আসার
১৭. ওয়াহবাহ যুহাইলী, আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু
১৮. মুফতী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, ফাতাওয়া রশীদিয়া
১৯. সানাউল্লাহ অমৃতসরী, ফাতাওয়া সানাইয়্যাহ
২০. মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ অনূদিত ড. শাইখ মুহাম্মদ ইলয়াস ফয়সাল রচিত নবীজীর নামায
২১. সানাউল্লাহ অমৃতসরী, আহলে হাদীস কা মাযহাব
২২. মাওলানা আব্দুল মতিন, দলীলসহ নামাযের মাসায়েল

তাখরীজগ্রন্থ

১. জামালুদ্দীন যাইলায়ী, নাসবুর রায়াহ
২. ইবনুত তুরকুমানী, আলজাওহারুন নাকী
৩. ইবনে হাজার আসকালানী, আত-তালখীসুল হাবীর
৪. শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ফিত্তা'লীকি আলা ফিকহিস সুন্নাহ
৫. নাসিরুদ্দীন আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবীল

তারাবীহগ্রন্থ

১. ইমাম সুয়ূতী, আল মাসাবীহ ফী সালাতিত তারাবীহ
২. ইসমাইল বিন আনসারী, তাসহীহু সালাতিত তারাবীহ ইশরীনা রাক'আতান ওয়ার রদ্দু আলাল আলবানী ফী তাযয়ীফিহী
৩. মাওলানা হাবীবুর রহমান আ'যমী, রাকাআতে তারাবীহ
৪. মাওলানা গোলাম রাসূল, রিসালায়ে তারাবীহ
৫. আতিয়্যা মুহাম্মদ সালেম, আত-তারাবীহু আকসারা মিন আলফি আম ফিল মাসজিদিন নাবাবী

৬. উমর আলী ইবনে ইউসুফ, তালাবুর রদ্দি ওয়াত তাওযীহ মিন মান ইয়াকুলু বিকওলিশ শাইখিল আলবানী ফী কিয়ামিল্লাইলি ওয়া সালাতিত তারাবীহ
৭. মুহাম্মদ আলী সাবুনী, আলহাদইউন নববী আসসহীহ লিসালাতিত তারাবীহ
৮. শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী, রিসালাতু কিয়ামি রমাযান
৯. মুহাম্মদ ইবনে নাসর আলমাররুযী, কিয়ামু রমাযান
১০. শায়খ মুহাম্মদ আলবানী, সালাতুত তারাবীহ

রিজালগ্রন্থ

১. ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী, আলমুনতাকা
২. ইমাম মিযযী, তাহযীবুল কামাল
৩. ইমাম আবুল ফযল মাজদুদ্দীন আলমাওসিলী, আলইখতিয়ার লিতা'লীলিল মুখতার
৪. ইবনে আদী, আল-কামিল ফী যুআফাইর রিজাল
৫. ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব
৬. আননুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনিস সালাহ
৭. ইবনে হাজর আসকালানী, হাদয়ুস সারী
৮. খতীবে বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ
৯. ইবনে আসাকির, তারিখু মাদীনাতি দিমাশক
১০. আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়াহ
১১. আবূ ইয়া'লা হাম্বালী, তাবাকাতুল হানাবিলাহ
১২. হাফেজ আবুল ওয়ালীদ আলবাজী, আত তা'দীল ওয়াত তাজরীহ
১৩. ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুল কারীম, রিওয়াইয়াতু ওয়া নুসাখুল জামিয়িস সাহীহ লিলবুখারী
১৪. আবুল ওয়ালীদ আলবাজী, আততা'দীল ওয়াত তাজরীহ
১৫. আব্দুর রাহমান বিন ইয়াহইয়া আলমুআল্লিমী, আলআনওয়ারুল কাশিফাহ
১৬. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা
১৭. উকাইলী, আয-যুআফাউল কাবীর

১৮. উবাইদুল্লাহ বিন আব্দুল কারীম, আযযুআফা ওয়া আজউইবাতু আবি যুরআ রাযী আলা সুওয়ালাতি বারযায়ী
১৯. ইমাম সাখাবী, আলগায়াহ ফী শারহিল হিদায়াহ ফী ইলমির রিওয়াইয়াহ
২০. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল
২১. তারীখে ইবনে মায়ীন
২২. ইমাম নাসায়ী, আযযুআফা ওয়াল মাতরুকীন
২৩. ইমাম সামআনী, আলআনসাব
২৪. ইয়াকুত আলহামাবী, মু'জামুল বুলদান
২৫. মুহাম্মদ আবূল মা'আলী ইবনুল গাযী, দিওয়ানুল ইসলাম
২৬. হাফেয আবূ বাকার ইবনুন নুকতাহ আলহাম্বালী, আততাকয়ীদ লিমা'রিফাতি রুওয়াতিস সুনানি ওয়াল আসানীদ
২৭. ইবনে হাজার আসকালানী, তাবসীরুল মুনতাবিহ বিতাহরীরিল মুশতাবিহ
২৮. ইমাম যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফাজ
২৯. আবূ আব্দুল্লাহ হামিদ বিন আহমদ, সুয়ূখুল বাইহাকী ফিস সুনানিল কুবরা
৩০. ইবনে মাকুলা, ইকমালুল কামাল
৩১. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল গনী বাগদাদী, তাকমিলাতুল ইকমাল
৩২. ইবনে নাসিরুদ্দীন আদদিমাশকী, তাউযীহুল মুশতাবিহ
৩৩. শাইখ আব্দুল মুহসিন আল আব্বাদ, আলইমাম আলবুখারী ওয়া কিতাবুহু আলজামিউস সাহীহ
৩৪. ইমাম যাহাবী, তারীখুল ইসলাম
৩৫. ইমাম নববী, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত
৩৬. ইমাম যাহাবী, আলকাশিফ ফী মা'রিফাতি মান লাহু রিওয়াইয়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তাহ
৩৭. ইবনে হাজার আসকালানী, তাকরীবুত তাহযীব
৩৮. খতীব বাগদাদী, আলমুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক
৩৯. সাইয়িদ সিদ্দীক হাসান খান, আলহিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহিস সিত্তাহ

৪০. ইজলী, মা'রিফাতুস সিকাত
৪১. ইমাম যাহাবী, আল-মুনতাকা মিন মিনহাজিল ই'তিদাল
৪২. ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা
৪৩. আবুল ওয়ালীদ বাজী, আত-তা'দীল ওয়াত তাজরীহ লিমান খাররাজা লাহুল বুখারী ফিল জামিইস সাহীহ
৪৪. ইবনে হিব্বান ইজলী, কিতাবুস সিকাত
৪৫. মুহাম্মাদ খালাফ সালামাহ, লিসানুল মুহাদ্দিসীন
৪৬. মাউসু'আতু আকওয়ালিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল
৪৭. ইমাম যাহাবী, আলমুগনী ফিয যু'আফা
৪৮. ইলালুত তিরমিযী আলকাবীর
৪৯. আবূ সাঈদ আলায়ী, জামিউত তাহসীল ফী আহকামিল মারাসীল
৫০. দুরুসুন লিশ শায়খ আলবানী
৫১. ইমাম হাযিমী, শুরুতুল আইম্মাতিল খামসাহ
৫২. রিসালাতু আবি দাউদ ইলা আহলি মাক্কাহ
৫৩. আব্দুর রহমান ইবনে আবূ হাতেম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল
৫৪. ইমাম ইবনে হিব্বান, আসসিকাত
৫৫. ইবনে রাজাব হাম্বলী, শারহু ইললিত তিরমিযী
৫৬. ইমাম যাহাবী, মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়া হুয়া মুয়াস্সাকুন আউ সালিহুল হাদীস
৫৭. ইমাম বুখারী, আত্তারীখুল কাবীর
৫৮. ইবনুল কাইয়াল, আল-কাওয়াকিবুন নাইয়িরাত ফী মা'রিফাতিম মিনার রুওয়াতিস সিকাত
৫৯. ইমাম সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল ওয়াফাইয়াত
৬০. ইমাম যাহাবী, আল-ইবার ফী আখবারি মান গাবার
৬১. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ যাহাবী, আল-মুঈন ফী তাবাকাতিল মুহাদ্দিসীন
৬২. ইবনে নাসিরুদ্দীন দিমাশকী, তাওযীহুল মুশতাবিহ ফী যাবতি আসমাইর রুওয়াতি ওয়া আনসাবিহীম ওয়া আলকাবিহিম ওয়া কুনাহুম
৬৩. ইমাম সুবকী, তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আলকুবরা
৬৪. খাইরুদ্দীন যিরিকলী, আল-আ'লাম

উলূমুল হাদীসগ্রন্থ

১. বুহুসুন ফিল আহাদীসিয যায়ীফা
২. আব্দুল্লাহ আলজুদাই, তাহরীরু উলূমিল হাদীস
৩. ইমাম সাখাবী, ফাতহুল মুগীস
৪. ড. আব্দুল গনী বিন আহমদ, উসূলুত তাসহীহ ওয়াত তাযয়ীফ
৫. আব্দুল্লাহ বিন জুদাই', তাহরীরু উলূমিল হাদীস
৬. আবূ সানাদ মুহাম্মদ, মাউসুআতু হাল ইয়াসতাউইললাযীনা
৭. ইবনে হাজার আসকালানী, নুযহাতুন নাযার ফী তাউযীহি নুখবাতিল ফিকার
৮. আহমদ বিন উমর বিন সালিম বাযমুল, আলমুকতারিব ফী বয়ানিল মুযতারিব
৯. ড. মাহির ইয়াসীন ফাহল, শারহুত তাবসিরাহ ওয়াত তাযকিরাহ
১০. ইবনে উসাইমিন, শারহুল মানজুমাতিল বাইকুনিয়্যাহ
১১. শাইখ আব্দুল্লাহ সা'দ, শারহুল মুকিযাহ
১২. মুহাম্মদ সানআনী, তাউযীহুল আফকার
১৩. যফর আহমদ উসমানী, কাওয়াইদ ফী উলূমিল হাদীস, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. কৃত টিকা
১৪. ড. মাহির ফাহল, বুহুসুন ফিল মুসতালাহ
১৫. মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম হালাবী, কাফউল আসার ফী মা'রিফাতি উলূমিল আসার
১৬. মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ
১৭. তাহের জাযায়েরী, তাউজীহুন নযর ইলা উসূলিল আসার
১৮. ইবনে হাজার আসকালানী, নুযহাতুন নযর ফী তাউযীহি নুখবাতিল ফিকার
১৯. আলী ইবনে হুসাইন ফকীহ, আততা'লীকাতুল বাযিয়া আলা নুযহাতিন নযর
২০. আব্দুল কারীম বিন আব্দুল্লাহ খাযীর, তাহকীকুর রুগবাহ ফী তাউযীহিন নুখবাহ
২১. মাহমুদ তাহ্হান, তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস

২২. আমীর সানআনী, তাউযীহুল আফকার মা'আ তানকীহিল আনযার
২৩. নূরুদ্দীন ইত্‌র, মানহাজুন নাকদ ফী উলূমিল হাদীস

অভিধানগ্রন্থ

১. আলমুনাবী, আত্তাউকীফ আলা মুহিম্মাতিত তাআরিফ
২. আলজাউহারী, আসসিহাহ ফিললুগাহ
৩. আল্লামা মুতাররিযী, আলমুগরিব
৪. ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব
৫. মুহাম্মদ কালআজী, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা
৬. ইমাম যাবিদী, তাজুল আরূস

ইতিহাসগ্রন্থ

১. ড. জাউয়াদ আলী, আলমুফাসসাল ফী তারিখিল আরব
২. ইমাম ইবনে কাসীর, আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া

বিবিধগ্রন্থ

১. ইবনে তাইমিয়া, ইকামাতুদ দলীল আলা ইবতালিত তাহলীল
২. ইবনে তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ
৩. আবূ ইউসুফ মুহাম্মদ যায়েদ, আলজাওয়াহিরুল হুরাইরিয়্যাহ মিন কালামি খাইরিল বারিয়্যাহ
৪. মুলতাকা আহলিল হাদীস
৫. উসূলুত তাহানী বি ইসবাতি সুন্নিয়াতিস সাবহাহ ওয়ার রদ্দু আলাল আলবানী
৬. ড. আব্দুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম, মাওকিফু শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ মিনার রাফিযাহ
৭. মাজাল্লাতুল জামি'আতিল ইসলামিয়া বিল মাদীনাতিল মুনাওয়ারাহ
৮. আহমাদ শিহাতা সিকান্দারী, আত্তা'আক্কুবুল মুতাওয়ানী আলাস সিলসিলাতিয যাঈফা লিল আলবানী

৯. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, তাম্বীহুল কারী আলা তাকবিয়াতি মা যা'আফাহুল আলবানী
১০. শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, আররদ্দুল মুফহিম আলা মান খালাফাল উলামাআ ওয়া তাশাদ্দাদা ওয়া তা'আস্‌সাবা
১১. ইবনু কাইয়িমিল জাউযিয়া, যাদুল মা'আদ
১২. মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে তাবাতাবা (ইবনে তাকতাকী), আলফাখরী ফিল আদাবিস সুলতানিয়্যাহ ওয়াদ দালাতিল ইসলামিয়া
১৩. হাজী খলীফা, কাশফুজ জুনূন
১৪. ইবনে হাজার আসকালানী, আলইসাবা ফী তামইযিস সাহাবাহ
১৫. গবেষণা সাময়িকী মাসিক আলকাউসার
১৬. আশশাবাকাতুল আলামিয়্যা

ব্যক্তিগত নোট